

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়



উৎস মানুষ
সংকলন



প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়

উৎস মানুষ সংকলন

PROYOJANIO APROYOJANIO
an utsa manush publication ; price Rs. 16·00

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

প্রকাশক ও মুদ্রক : পবন মুখোপাধ্যায় ; বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
মুদ্রণ : প্রিন্টিং সেন্টার ; ১৮বি ভুবনধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
বাঁধাই : নিবারণ সাহা
প্রচ্ছদ : তরুণ বসু
চিত্র ও কার্টুন : জ্যোতির্ময় সমাজদার, রিক্তা সামন্ত

ষোলো টাকা

সূচী

উৎস মানুষ প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান/১২·০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ/১০·০০
প্রমিথিউসের পথে/৬·০০
শেকলভাঙা সংস্কৃতি/১২·০০
এটা কি ওটা কেন/১০·০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/১০·০০

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

প্রথম প্রকাশের ঠিক দু-বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম-এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তিনটি রচনা—'ক্রেতা কি কেবলই ছবি', 'আকুপ্রেসার চটির চাঁটি' ও 'আকুপ্রেসার চটির মিথ্যা বিজ্ঞাপন'—যে তিনটি উৎস মানুষ-এর এপ্রিল '৮৫, সেপ্টেম্বর '৮৬ ও মার্চ '৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর কিছু পরিমার্জন হয়েছে; পণ্যগুলোর বাজারদর আর প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঠিকঠাক করে সমসাময়িক করা হয়েছে। স্বভাবতই, এভাবে কলেবর বেড়ে যাওয়া আর এই দু-বছরে কাগজ ইত্যাদি মৌলিক উপকরণের দর উঠে যাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে, বাধ্য হয়েছি আমরা বই-এর দাম বাড়াতে—ঠিক যতটুকু না-বাড়ালেই নয়।

'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়'-র পাঠকদের প্রতিক্রিয়া এলোমেলো-ভাবে যতটুকু আমাদের কাছে এসেছে তার সূত্র ধরে কিছু কথা বলার সুযোগ আমরা নিচ্ছি এই দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে। প্রথম সংস্করণের লেখাগুলোতে আমাদের নিজেকে-ঠকানো-বোধবুদ্ধি, বিজ্ঞাপন-সুবাসিত কালচার আর গ্ল্যামার-প্রধান আধুনিক জীবনের দিকগুলো ফোকাস্‌ড্‌ হয়েছিল। প্রশ্ন উঠে এসেছিল এই বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব যান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিণতি কী? এক বিপজ্জনক অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রবাহে কোথায় আমরা ভেসে যাচ্ছি?…এবং তারপর? অর্থাৎ আধুনিক পণ্যের বিধ্বংসী জোয়ার, আর অপ্রতিহত বিজ্ঞাপনের দূষণ—এসব জেনেবুঝেই বা কি হবে? বই পড়েই কি মানসিকতা পাল্টে যাবে? বিজ্ঞাপনের ফাঁকি জানলেই কি পণ্য-প্রতারণা এড়ানো যাবে? প্রশ্নগুলোর সত্যিকারের এককথার উত্তর হলো, "না"। কিন্তু উত্তরটা এক কথায় সারা হবার নয়। বই পড়ে আসল সত্যিটা জানা হলেই সব হলো না, বরং বৃহত্তর কর্তব্যের প্রাথমিক এবং মৌলিক পাঠটুকু হলো এতে। যে-ব্যাপক সাধারণ মানুষ, আমি-আপনি আমরা সবাই, বিভ্রান্ত হচ্ছি প্রতারিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনের চোখ ঝলসানো ফ্লাড লাইটে, তাদেরই সক্রিয় সংঘবদ্ধ দায়িত্বে রয়েছে এ-সংকটের সমাধান। প্রতিবাদী

আর প্রতিরোধী আন্দোলন চাই, ঘর ছেড়ে বাইরে আসার প্রত্যয় চাই—সেখানেই প্রতীক্ষিত শেষ প্রশ্নের উত্তর। এ-সংস্করণের সংযোজিত লেখাগুলি সেই পরিণতির ভাবনা নিয়েই লেখা।

শেষে আর একটা কথা, এক অকপট ক্ষমাপ্রার্থনা। প্রথম সংস্করণের অক্ষমতার মতো কিছু স্কেচ আর বাড়তি ছবি এবারেও দিতে পারি নি আমরা নেহাৎ-ই সাংগঠনিক দুর্বলতায়। মার্জনা চাওয়ার সুযোগ নেই জেনেই নীরব হচ্ছি, কেবল নিরাভরণ অন্তকরণ নিয়ে হাজির করছি ‘প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়’কে আবারো পাঠকদের কাছে প্রয়োজনীয় হবার প্রত্যাশায়।

পরিচালকমণ্ডলী
উৎস মানুষ

শুরুতে কিছু কথা

মানুষের জন্য পণ্য না পণ্যের জন্য মানুষ ? উত্তরটা যতো সহজ ভাবছেন ততোটাই কঠিন লাগবে, যদি আজকের ক্রেতাসাধারণের মোহগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে দু-দণ্ড ভাবতে চেষ্টা করেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে আমরা যে নতুন নতুন প্রসাধন দ্রব্য— চামড়ার ক্রিম, যন্ত্রণার মলম, সর্দির ভিকস্, কাশির এক্সপেকটোর‍্যান্ট অম্লতাঞ্জন, বজ্রদন্তী, চ্যবনপ্রাস, হজমীর ওষুধ, হরলিকস, কমপ্লান, বেবিফুড ইত্যাদি ইত্যাদি গাদা গাদা পয়সা দিয়ে কিনছি, তা কি সচেতনভাবে প্রয়োজন বুঝে কিনছি, নাকি বিজ্ঞাপনের নিপুণ ফাঁদে ধরা পড়ছে আমাদের বোধবুদ্ধি ; অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের মানসিক চাহিদাকে গ্রাস করছে, অন্ধভাবে তাড়িত হচ্ছি আমরা 'প্রচার' কৌশলের মোহে !! এটা কি সত্যি নয় যে আজ পত্র-পত্রিকায় রাস্তা-ঘাটে রেডিও টিভিতে অহরহ কৌটোভর্তি 'শক্তি', শিশিভর্তি 'বুদ্ধি' আর প্যাকেটভর্তি 'গ্ল্যামার' আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধিগুলিকেই ঘোঁট পাকিয়ে দিচ্ছে। জন্ম দিচ্ছে না কি এক বিজ্ঞাপনসর্বস্ব যান্ত্রিক সংস্কৃতির ? এই মারাত্মক অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও 'লাইফস্টাইল'-এর মূল কোথায়, কতোটাই বা ব্যাপক এর বিস্তার ? এইসব প্রশ্ন আলোচনা করেছি আমরা গত দু-তিন বছরে 'উৎস মানুষ' এর পাতায় 'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়' সিরিজের রচনাগুলিতে। সেগুলিই এখানে সংকলিত হলো। দু-একটি লেখায় সামান্য পরিমার্জন ছাড়া বড় কিছু রদবদল হয় নি। আরো কিছু স্কেচ আর ছবি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, প্রকাশনার কাজটা তাড়াহুড়ো করে সারতে হলো বলে ইচ্ছাপূরণ হলো না। এখন পাঠক বন্ধুরা কিভাবে নেবেন সেটা জানবার জন্য আগ্রহী থাকবো আমরা।

পরিচালকমণ্ডলী
উৎস মানুষ

ক্রেতা কি কেবলই ছবি

১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে খোদ পার্লামেণ্টে সরকার নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করলেন যে, এদেশের বাজারে বিক্রিত ওষুধের ২০ শতাংশ হয় ভেজাল নয় নিম্নমানের। ওষুধের মতো পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যখন এই ছবি তখন অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে কি কারবার চলছে তা অনুমান করা নিশ্চয়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য অতীতে কিংবা বর্তমানেও মাঝে-মধ্যে কাগজের খবর হয়ে ওঠে ভেজাল কোনো পণ্য—'ডালদায় গরুর চর্বি' কিংবা 'সর্ষের তেলে শেয়ালকাঁটা',—বেশ কিছু লোক মারা যায় কিংবা অসুস্থ হয়—কিছুদিন তা নিয়ে বাজার সরগরম থাকে, তারপর আবার যে-কে-সেই। পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল থাকাটাই যেন নিয়ম—না থাকাটাই আশ্চর্যের। এর থেকেও বড়ো সত্য, সনাতন দেশে এ-সব মেনে চলাটাই সব থেকে বড়ো নিয়ম। অথচ মজার ব্যাপার হলো, ক্রেতার জন্যই বিক্রেতা কিংবা প্রস্তুতকারকদের জন্ম। অথচ সেই ক্রেতাই তাদের কাছে প্রায় সারাক্ষণ 'জো হুজুর' হয়ে থাকবেন, মুখ বুজে সমস্ত কিছু সয়ে যাবেন। ভাবুন একবার এ-দেশের ক্রেতাদের ক্ষমতা! সারাবছর তারা ৮৫ হাজার কোটি টাকার মাল সওদা করে থাকেন। কি-না করতে পারেন তারা এই টাকা দিয়ে? কিন্তু আশ্চর্য, শুধু ওজনের কারচুপিতে বছরে ১৬০০ কোটি টাকা তাদের নাকের ওপর ঠকিয়ে নেওয়া হয়, অথচ 'ক্রেতা'-রা কাড়েন না! তার কারণ বোধহয়, ক্রেতার কোনো 'স্বরূপ' নেই। ক্রেতা বাস্তবে থেকেও বিমূর্ত। ক্রেতা ক্রোড়পতি হয়েও ভিখিরি, ক্রেতার কোনো ভাষা নেই, ক্রেতার বিশাল অস্তিত্ব, অথচ সে-অস্তিত্ব সমাজে অনুভূত হয় না। দিল্লীতে ভোজ্যতেলগুলির সমীক্ষাতে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভেজাল ধরা পড়লেও কিংবা ক'লকাতার মিষ্টিতে ডায়ারিয়ার জীবাণুর উপস্থিতি প্রমাণিত হলেও বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারকদের জবাবদিহি করতে হয় না—শাস্তি পাওয়া তো বহুদূরের কথা। এমনকি মেডিক্যাল কলেজ-এর হোস্টেলগুলিতে রান্নায় হলুদ রং-এর বিষাক্ত 'মেটানিল ইয়েলো'র (যার ক্যানসার তৈরির ক্ষমতা

রয়েছে) উপস্থিতি ধরা পড়লেও তা বড়ো একটা সাড়া জাগায় না। সবজিকে সবুজ রঙ-এ রাঙাতে এ দেশের বিক্রেতারা বিষাক্ত রাসায়নিক কপার সালফেট মেশাতেও দ্বিধা করে না। বিপজ্জনক নিষিদ্ধ ওষুধে বাজার ছেয়ে থাকলেও এসবের বিরুদ্ধে তেমন কোনো সংগঠিত ক্ষোভ বা প্রতিবাদ দানা বেঁধে ওঠে নি। ক্রেতারা 'বিচ্ছিন্ন' 'নির্বিবাদী' এবং 'নির্বাক' থেকে গেছেন! এ-দেশে 'ক্রেতা'—অবয়হীন একটি শব্দ মাত্র।

ওজনের কারচুপির ক্ষেত্রে এ-দেশের নামি-দামি কোম্পানিদের যথেষ্ট নামডাক। সাবান থেকে শুরু করে সাধারণ লবণ—প্রায় সবধরনের পণ্যেই ওজন কম দেবার বহু ঘটনা ধরা পড়েছে, কিন্তু প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই প্রস্তুতকারককে শাস্তি দেওয়া যায় নি, খুব স্বল্প ক্ষেত্রে নামমাত্র জরিমানা করা হলেও শেষপর্যন্ত তা আদায় করা যায় নি বা করা হয়ে ওঠে নি। তার একটা কারণ, এ-দেশের আইনগুলি প্রায় শরতের মেঘের মতো—যত গর্জায় তার এক শতাংশও বর্ষায় না। এমনকি পণ্যের নির্দিষ্ট গুণমান বা পণ্যের গায়ে লেখা গুণমান বজায় না থাকলেও প্রস্তুতকারককে কোর্টে অভিযুক্তই করা যেত না, যদি না পণ্যটির গায়ে আগমার্কা বা ISI ছাপ থাকতো। এমনিই ছিল এদেশের সব আইন-কানুন। (১৯৮৭-তে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।) তাছাড়া ক্রেতাদের অজ্ঞতা বা অসচেতন মনোভাব প্রস্তুতকারকদের রমরমা কারবার চালিয়ে যেতে সাহায্যই করেছে। এদেশের বড়ো বড়ো শহরে যে দু-একটি 'ক্রেতা সমিতি' রয়েছে—তাদের শীতঘুম বছরে বারোমাস। তবু দু-এক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেষ্টায় তারা যে দু-একটি কাজ করে ছিলেন—তার সুফল ভোগ করতে পারে নি ক্রেতা—মূলত ক্রেতাদের নির্বিকার মনোভাবের জন্য। যেমন ধরুন মেটানিল ইয়েলোর কথা; এদেশের Consumer Guidance Society-র চেষ্টায় মানুষের খাদ্যে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু চতুর ব্যবসায়ি সেই একই প্যাকেটের গায়ে অত্যন্ত ক্ষুদে হরফে (পড়তে আতস কাঁচ লাগে) 'Not for human consumption' (মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত) বাক্যটি ছাপিয়ে সমানভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বহু তথাকথিত 'শক্তিবর্দ্ধক পানীয়'-র কৌটোর গায়ে যে প্রোটিন, ভিটামিনের হিসাব দেওয়া থাকে বাস্তবে যে তার কম থাকে—সে-ও প্রমাণিত হয়েছে—অবশ্য তাতে ক্রেতার কোনো মোহভঙ্গ ঘটে নি। বলতে গেলে, এ-সব খুবই সাদামাটা এবং সরাসরি ক্রেতাকে ঠকানোর কিছু পুরোনো কায়দা। আজকের দিনে ধুরন্ধর প্রস্তুতকারকেরা

আরো বড়ো করে এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ক্রেতাকে প্রলোভিত এবং প্রতারিত করেন—এবং বর্তমান যুগে সেইসব প্রতারণার মূল জায়গাগুলি ক্রমশই বাড়ছে। স্রেফ প্রচারের কারসাজিতে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকারক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ক্রেতাকে কিভাবে প্রলুব্ধ করা হয় তার কিছু উদাহরণ উৎস মানুষ-এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে—সে-তালিকায় ওষুধ থেকে শুরু করে শিশুদের খাবার কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রসাধনের কথাও বলা হয়েছিল। আজকের দিনে 'বিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যের জন্য দরকারি' এই মোড়কে ক্রেতাকে আকর্ষণ করে দ্রব্য বিক্রয় করতে গিয়ে যখন গ্রাফ এঁকে দেখানো হয় অমুক ভোজ্যতেলের 'কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষমতা রয়েছে' কিংবা কিছু আঙ্কিক তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় অমুক তেলের 'চুল গজানোর' দক্ষতা অদ্ভুত রকমের—তখন কোনো একজন ক্রেতা কোনোভাবেই সে তথ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ কোলেস্টেরল কমানোর আদৌ কি গুরুত্ব রয়েছে তার জীবনে কিংবা চুল গজানোর ভূমিকায় কোনো তেল থাকতে পারে কি-না—সে-বিজ্ঞান তার কাছে অজ্ঞাত ; এরপরেই হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারতো আদৌ সেই ভোজ্যতেলটি কোলেস্টেরল কমাতে পারে কি-না? আবার তাহলে প্রশ্ন আসে, প্রত্যেক ক্রেতাকেই কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত প্রত্যেক দ্রব্যসামগ্রী বা প্রত্যেকটি কাজকে পুরোপুরি জানতে হবে এবং তা কি সম্ভব? আর শুধু পণ্যসামগ্রীই নয়—যে-সমস্ত পরিষেবা (service) (তা সে চিকিৎসা থেকে শুরু করে ঘড়ি সারানো পর্যন্ত) ক্রয় করে থাকেন, একজন ক্রেতার পক্ষে এর সমস্ত কিছু গভীরভাবে জানা-বোঝা কি সম্ভব? রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সরকারের ওপর ক্রেতার ভালোমন্দ দেখভাল করার দায়িত্ব রয়েছে ঠিকই—কিন্তু যেখানে সরকারি কারখানায় 'নিষিদ্ধ ওষুধ' তৈরি হয়—বৃহৎ ব্যবসায়ি গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন প্রণয়ন হয় —সেখানে ক্রেতার বিকল্প কোনো প্রয়াস অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, আর এক্ষেত্রে এক-দু-জন ক্রেতা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতেও অক্ষম। সুতরাং প্রয়োজন সম্মিলিত কোনো প্রচেষ্টা। বাজারে যখন ধুরন্ধর ব্যবসায়ি নতুন মডেলের গাড়ি, টি ভি সেট কিংবা স্টোভের প্রচারে নিজ-নিজ দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা প্রচার করেন, তখন ক্রেতার কাছে বিশেষত এ-দেশের ক্রেতাদের কাছে স্পষ্ট থাকে না—সত্যিই কি কি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। গাড়ি কিংবা স্টোভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন না এতে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা (safety) এতটুকু বেড়েছে কি-না, কিংবা রঙীন টিভির টিউব থেকে

বিকিরণের হেরফের ঘটেছে কি-না। অর্থাৎ কোনো পণ্যের গুণমান বলতে কি কি জিনিস বোঝানো হবে—সেটাও চতুরভাবে তৈরি করে দেওয়া হয় প্রচারের কৌশলে—এসবের মাধ্যমে ক্রেতা আর্থিকভাবে প্রতারিত হওয়া ছাড়াও শরীর-স্বাস্থ্যের অবহেলার শিকার হন—যার জন্য ক্রেতাকে এক সুদূরপ্রসারী ক্ষতির শিকার হতে হবে আগামী দিনে।

এতো গেল একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে কিভাবে প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু একজন 'ক্রেতা' সরাসরি কোনো পণ্য না কিনেও সমাজে ব্যবহৃত সেই পণ্যের জন্য শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে পারেন, সেখানে-ই বা সেই মানুষটি, সেই বিশেষ-পণ্যটির ক্রেতা না হয়েও সেই ক্ষতির শিকার হতে রাজি থাকবেন কেন? যেমন ধরুন পেস্টিসাইড কিংবা নিউক্লিয়ার চুল্লীর বিকিরণের দরুন ক্ষয়ক্ষতির কথা। য়ুরোপ-আমেরিকায় শক্তিশালী ক্রেতা-আন্দোলন এই প্রশ্নগুলিকে শুধু তুলেই ধরে নি এ-সবের বিরুদ্ধে জবরদস্ত আন্দোলন গড়ে অনেক কিছুই আদায় করে নিতে পেরেছে। নিউক্লিয়ার চুল্লীর নিরাপত্তা ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য যে-সব আইন ও ব্যবস্থা নিতে সে-দেশের চুল্লী ব্যবসায়িদের এমনভাবে বাধ্য করাতে পেরেছে যে তারা সে-দেশে এ ব্যবসা প্রায় গুটিয়ে ফেলছে।

বাতাসের দূষণসীমা নামিয়ে আনতে আমেরিকার ক্রেতা-আন্দোলন এক বড়োসড়ো ভূমিকা নিয়েছিল—ফলে মোটরগাড়ির 'প্রযুক্তি'-র বদল ঘটাতে হচ্ছে, তেলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং সীসামুক্ত তেল ব্যবহার বাধ্যতামূলক সেখানে। আমেরিকা সরকারের **FDA** যারা খাদ্য এবং ওষুধের গুণমান পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন—তাদের কঠোর পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি ও নিয়মনীতির পেছনে দীর্ঘস্থায়ী ক্রেতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বাইরের দেশের ক্রেতা সংগঠনগুলি, আজ সমাজে কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে, কোন পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে—তা নিয়ন্ত্রণের জায়গায় যেতে চাইছেন। শুধু পণ্য নয় পরিষেবা (service)-র ক্ষেত্রেও তারা বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতে সরকারকে বাধ্য করেছেন—তা সে মোটরগাড়ি সারানো থেকে চিকিৎসা—সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই। তার সাথে এদেশের চিত্র কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। সরকারি হাসপাতালে সরকার যা কিছু ওষুধ, অখাদ্য পথ্য, কিংবা কোনো ওষুধ না দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে গেলেও অজ্ঞ ও সহায়সম্বলহীন রোগী তাই-ই মেনে নেয়—সচরাচর প্রতিবাদ করে না—সরকারকে অভিযুক্ত

করে ক্ষতিপূরণ চাওয়া তো দূরের কথা। এদেশে ক্রেতা সমবায় আন্দোলন বলতে পাইকারি দরে ভোগ্যপণ্য কিনে তা একটুখানি সস্তাদরে ভাগ করে নেওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু সারা পৃথিবীতে ক্রেতা-আন্দোলনের আকার এবং আকৃতিতে একটা বড়োরকম পরিবর্তন ঘটে গেছে বিগত দুটো দশকে। এশিয়ার দেশগুলিতেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছেছে। য়ুরোপ-আমেরিকার ক্রেতা-সংগঠনগুলো যেমন সরকারি তরফে স্বীকৃতি এবং সরকারি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে—তেমন অবস্থা এই দেশগুলিতে না ঘটলেও অনেক পণ্য ও ওষুধের ব্যাপারে থাইল্যাণ্ড কিংবা মালয়েশিয়ার ক্রেতা সংগঠনগুলো জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তারই স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৪ সালে ব্যাঙ্ককে 'বিশ্ব ক্রেতা সমবায় সমিতি' (International Organisation of Consumer Union), সংক্ষেপে IOCU-র অধিবেশন হয়ে গেল, যাতে ৪২টি দেশের বিভিন্ন সংগঠন যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে একনম্বর দাবি হিসেবে মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলির (খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন) গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ একটা দেশে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের তালিকায় এগুলি প্রাথমিক গুরুত্ব পাবে—এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির চাহিদা মিটলেই অন্য ধরনের পণ্য উৎপাদনের প্রশ্ন উঠবে—এমন কথা তারা বলছেন। পরিবেশ সুরক্ষার দাবিও ক্রেতা-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সম্মেলনেই পৃথিবীতে নানাদেশে ব্যবহৃত ১২টি অত্যন্ত ক্ষতিকারক পেস্টিসাইড নিষিদ্ধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। যা এখন 'Dirty Dozen' নামে পরিচিত। ওষুধের ব্যাপারেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। IOCU-এর বিভিন্ন বিভাগ এগুলি দেখাশোনা করে।

এটা হয়তো ঠিকই, ক্রেতা আন্দোলন পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারবে, এমনটা নয়। কিন্তু এই আন্দোলনের মাঝে একজন সাধারণ ক্রেতা তার ভাষা খুঁজে পান। এই আন্দোলন আজ সমাজ-কাঠামোর বহু গভীরে বহু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পেরেছে, যা বর্তমান অবস্থাটাকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করেছে—সন্দেহ নেই। বাজারভিত্তিক অর্থনীতি (Market Economy) এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী ক্রেতা তার বিমূর্ত ধারণা থেকে

বাস্তবে পদার্পণ করতে পারেন সহজেই। সেটা এই আন্দোলনের আর একটা বড়ো লাভ। কিন্তু এসব বহুদূরের কথা। এদেশের ক্রেতারা 'জানার অধিকার'টুকুও (Right to be Informed) প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি—কিংবা এ-ব্যাপারে সচেতন নয়। যখন 'নিরাপত্তার অধিকার' (Right to Safety) নিয়ে বাইরের দেশে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে তখন এদেশে কলে-কারখানায়, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্রই প্রায় প্রতিদিন এটি লাঞ্ছিত হচ্ছে, ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার আশ্বাসটুকুও। তাই এর পরেই প্রশ্ন ওঠে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু নির্বাচন করার অধিকারের (Right to Choose)। এদেশের অজ্ঞ এবং অসচেতন ক্রেতা জানে-ই না কি তার অধিকার, কি তার ক্ষমতা—প্রয়োগ করার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সবথেকে মজার কথা, এদেশে যে সব বিচক্ষণ ও জ্ঞানী 'ক্রেতা'রা অহরহ রাষ্ট্রকাঠামো এবং সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ধিক্কার ধ্বনিত করে, সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর ডাক দেয়, তারাও তাদের ব্যবহারিক জীবনে—প্রস্তুতকারক কিংবা বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারিত, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপমানিত হলেও নীরবে তা সয়ে যায়। যে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এই রাষ্ট্রকাঠামোয় মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে—তাদের বিরুদ্ধে কোনো সক্রিয় ক্রেতা-আন্দোলন গড়ে তুলতে এরা কখনো সচেষ্ট হয় নি বা তাতে কোনো গুরুত্ব দেয় নি। উল্টে বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এদেশের সরকারি প্রচেষ্টা, তুলনায় বোধহয় বেশি সক্রিয়। প্রায় কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই ১৯৮৭-তে ক্রেতা-স্বার্থ বিল (Consumer Protection Bill) আইন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একমাত্র 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি' একটুখানি আপত্তি তুলেছিল protection (রক্ষা করা) শব্দটি নিয়ে। শব্দটা নাকি তাদের পক্ষে মানহানিকর। কারণ ক্রেতাকে রক্ষা করার অর্থ তারা 'আক্রান্ত', সে-ক্ষেত্রে বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারকরা আক্রমণকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেক্ষেত্রে তারা welfare শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেছিল—অবশ্য তা গৃহীত হয় নি শেষ পর্যন্ত। এর আগেই নেই নেই করেও ১৯-টা আইন ছিল ক্রেতাদের 'রক্ষা' করার জন্য—অবশ্য তাতে ক্রেতাদের স্বার্থ কতখানি রক্ষা করা গেছে তা বলাই বাহুল্য, তবে এসব আইনের যথেষ্ট ফাঁক-ফোঁকোর ছাড়াও সাধারণভাবে এদেশের ক্রেতাদের অজ্ঞতা অসচেতনতা এবং সংগঠিত কোনো প্রয়াসের

অভাব এর পেছনে অন্যতম কারণ। বর্তমানের আইনটি তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী এবং এটি কার্যকর-অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে—যদি ক্রেতারা সক্রিয়-ভাবে এর প্রয়োগে সচেষ্ট হন। এই আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো যে—আইনটি শুধুমাত্র বেসরকারি, কো-অপারেটিভ বা সরকারি (প্রথম পর্বে সরকারি কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীকে আইনের আওতার বাইরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল) সংস্থায় উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

সাত বা তার অধিক ব্যক্তি মিলে 'সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' মোতাবেক ক্রেতা-সমবায় সমিতি গঠন করতে পারেন। বর্তমান আইন অনুযায়ী ক্রেতা সমবায় সমিতি কোনো দোকান থেকে খাদ্য বা অন্য কোনো বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করে দোকানদার এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ক্রেতা-সমবায় সমিতিগুলোর রয়েছে। জেলা বা রাজ্যস্তরে যে সব 'Consumer Redressal Forum' তৈরি হয়েছে তাদের ভারতীয় বিচার বিধি (Indian Penal Code)-র ১৭৩ এবং ২২৮ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ফলে জিনিস-পত্রের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার ক্ষেত্রে, কিংবা 'স্থানীয় কর অতিরিক্ত' (Local taxes extra) এই সব নানান কারচুপির বিরুদ্ধেও ক্রেতা জেলাস্তরের Redressal Forum-এর শরণাপন্ন হতে পারেন। খাদ্য, ওষুধ কিংবা প্রসাধনে কোনো ধরনের ভেজাল সন্দেহে ক্রেতা একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও প্রিভেনশান অফ ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট (Prevention of Food Adulteration Act), ওয়েট্‌স অ্যান্ড মেজারস অ্যাক্ট (Weights & Measures Act), ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট (Drugs & Cosmetic Act), এম আর টি পি অ্যাক্ট (MRTP Act) এবং ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অ্যাক্ট (Drugs & Magic Remedies Act)-এ যে-সব পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে ক্রেতার হাত কিঞ্চিৎ শক্তিশালী হয়েছে।

থাকছে না—এই আইনের সাহায্যে, একজন ক্রেতা যখন পরিষেবা (service) কিনছে তখন সেই কাজ-এর গুণমান ইত্যাদির জন্য বিক্রেতাকে অভিযুক্ত করতে পারে এবং তারজন্য বিক্রেতার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রেন বা প্লেন দেরিতে যাওয়ার দরুন, বা হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার জন্য ক্রেতা হয়তো এই আইনের সাহায্য পেতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এই আইনবলে ক্রেতা কোনো সংগঠন ব্যতিরেকেই প্রস্তুতকারককে সরাসরি কোর্টে অভিযুক্ত করতে পারে; এর আগের আইনগুলোতে সে-সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, ধরা যাক কোনো ক্রেতা কোনো ভেজাল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো, সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ওপর ভেজালবস্তু সংগ্রহ; লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি সরকারি পদ্ধতি-প্রকরণের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এই আইনের আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয়স্তরে 'Consumer Protection Council' গঠনের সুপারিশ রয়েছে এবং জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে। যেখানে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ লাখ টাকা বা তার কম তা জেলাস্তরে, ১ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকার মীমাংসা রাজ্যস্তরে এবং তার বেশি হলে জাতীয়স্তরের বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া এই আইনের আরো একটা বিশেষত্ব হলো সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের কোনো নির্দিষ্ট সীমা এতে থাকছে না। আদালত তা যে-কোনো মাত্রায় এটি নির্ধারণ করতে পারে। Consumer Protection Council নানানভাবে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু অবশ্যই তার-ও আগে দরকার ক্রেতাদের নিজের অধিকারটুকু জানা ও বোঝা এবং সেই অনুযায়ী তা সক্রিয়-ভাবে রক্ষার দায়িত্বে এগিয়ে আসা। না হলে এই আইনটিও শেষ পর্যন্ত বইয়ের পাতায় আইন হিসেবেই থেকে যাবে।

সূত্র:

1. Consumer Power by T. W. Drury & W. L. Roper
2. The Sunday Statesman Miscellany ; 8th Feb '87
3. Insult or Injury by Charles Medwar
4. VHAI Bulletin ; Sept '85

☐ স্মরজিৎ জানা

রূপচর্চার নেপথ্যে

নিভিয়া না বিনাকা ডিপ ক্লিনসিং ক্রিম না ভিকো টারমারিক ভ্যানিশিং ক্রিম—একটু দ্বন্দ্বে পড়েছিল সুপর্ণা। সেটা সমাধানের পর দু-গালে আলতো ব্লুজ-এর ছোপ নিয়ে, ঠোঁটদুটো হালকা গোলাপি রং-এর লিপস্টিকে চুবিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে, পাউডারের পাফ্‌টা হাতে নিয়ে···যদিও সে 'ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী' মেখে মুখটা আর একটু ফর্সা করার চেষ্টা করছে বিগত ছ-মাস ধরে, প্লাস গালটাকে নরম রাখার জন্য মাখন, ডাল বাটা, লেবুর রস ইত্যাদির প্রলেপ প্রচণ্ড নিষ্ঠাসহকারে লাগিয়ে আসছে বহুদিন ধরেই, তবু আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, এই স্বর্ণাভ গোধূলিতে নিজেকে কিভাবে মেলে ধরা যায়—গালের সামান্য দাগটুকুও কি করে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তার ভাবনায় অস্থির হচ্ছিল সে। এদিকে মেয়ে দেখার লোকেদের আসার সময় হয়ে এলো, উত্তেজনায় তার প্রসাধনে সাজানো মুখের 'চিত্রটি' বার বার ভিজে গিয়ে তার সাজার হিসেবটা বড়ো গোলমেলে করে তুলছিল।—

এটুকু পড়েই গিন্নি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর—দ্যাখো, ওসব মধ্যযুগীয় প্রথায় মেয়ে দেখার রেওয়াজ তোমার কালেই ছিল—এসব আর হয় না এখন। আর সুন্দরের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ—এ-তো মানুষের সহজাত ধর্ম ; দেখার চোখ নেই, বোঝার মন নেই, তাই কায়দা করে মেয়েদের সাজার ব্যাপারটায় বাগড়া দিতে চাইছো। তাছাড়া ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা, চামড়ার শুভ্রতা—এসবের কি হবে শুনি ?

সত্যিই, সুন্দরের প্রতি আমার কোনো জাতক্রোধ নেই। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ থাকাটাও আমি কোনো অস্বাভাবিক বা অপরাধ বলে মনে করি না। আমার কিছু বিনীত প্রশ্ন রয়েছে সৌন্দর্য মাপবার মাপকাঠিগুলিকে ঘিরে। কারণ এই সমাজ-নির্ধারিত মাপকাঠিগুলিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য 'মিথ' (myth), বহু ভ্রান্ত-সংস্কার, আর তারই সুযোগে প্রসাধনের এক বিশাল কারবার গড়ে উঠেছে বিশ্বজোড়া।

হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেছি—তা হলো এই সমস্ত প্রসাধন যা দিয়ে সাজা, বা নিজেকে সাজানোর হরেকবিধ পদ্ধতি আজকের দিনে চলছে, তা কিন্তু মূলত মেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই। পুরুষদের ক্ষেত্রে কদাচিৎই তার প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু সেটাও বড়ো কথা নয়। গোড়ার কথা হলো, মেয়েদের সৌন্দর্য নিরূপিত-নির্ধারিত হয় পুরুষদের রুচির মাপকাঠিতে ; তাদের ভালো লাগার চোখে ; তাদের চাওয়ার প্রকাশে। তাই প্রথমেই সৌন্দর্যের মাপকাঠিটার নিরপেক্ষতায় বিরাট একটা প্রশ্ন থেকে যায়। হয়তো সত্যিই সুপর্ণাদের মধ্যযুগীয় কায়দায় নিজেদেরকে 'পরিবেশন' করতে হয় না আজকের দিনে। কিন্তু সেই 'মেয়ে দেখা'-র বিশেষ ব্যাপারটায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি? পদ্ধতিটার হয়তো সামান্য কিছু অদলবদল ঘটেছে, কিন্তু 'মেয়ে দেখা'-র মূল বিষয়বস্তুটি আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। অর্থাৎ মেয়েটি দেখতে কতখানি সুন্দরী সেটাই আজও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর মেয়েটিকে সুন্দরী হতে গেলে তার কি কি থাকা উচিত— এ-ব্যাপারেও বেশ কিছু সাধারণ নিয়ম রয়েছে।

প্রথমেই আসে গায়ের রং-এর কথা। ফর্সা হওয়াটা জরুরী—যত বেশি ফর্সা তত বেশি সমাদর তার। এর পরই আসে শরীরের কথা। পেলব-কোমল অর্থাৎ বেশ গোলগাল একটি মেয়ের কদর অনেক বেশি—তুলনায় যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান বা একটু পেশল শরীরের মেয়েদের থেকে ; সৌন্দর্য মাপবার পাল্লাটি ঝুলে রয়েছে নরম-নধরের প্রতি। আবার দেখুন, শরীরের সৌন্দর্য মাপার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মূলত লক্ষ্য রাখা হয় মুখের প্রতি—সমস্ত শরীরটা হিসেবের খাতায় অনেক পেছনের দিকে পড়ে যায়—আর স্বভাবতই প্রসাধন সামগ্রীগুলিও বেশি বেশি করে চলে আসে মুখের 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও কারুকার্য' সৃষ্টির দায়িত্বে। এরপর মুখের সৌন্দর্যের বিচার হয় তার গঠনের বৈচিত্র্যের ওপর, চোখ-কান-নাক ইত্যাদির আকার-আকৃতির ওপর। এ ব্যাপারে রয়েছে ভীষণ রকমের জটিলতা, তা আবার ব্যক্তিবিশেষের পছন্দের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এই জটিলতায় না গিয়ে একটা কথা বোধহয় খুব সহজেই বলা যায়, মানুষের সৌন্দর্য মাপবার মাপকাঠিটি বড়ো বেশি এক-পেশে এবং অসম্পূর্ণও বটে। একটি মানুষের সৌন্দর্য কী নির্ভর করে না তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণতায়? একটি মানুষের সামগ্রিকতায়-ই তো বিচার্য হওয়া উচিত—সুন্দর নামক বিশেষ মানবিক অনুভূতিটির। শরীরের বিশেষ কয়েকটি অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা বা যাচাই করার এই পদ্ধতিটিতে তাই

ফাঁক রয়েছে অনেক। সৌন্দর্য কখনও নিরূপিত হয় গায়ের রঙ-এর ওপর, কোথাও মুখের আদলে, কোথাও বা শরীরের বিশেষ কয়েকটি অংশের মাপের ওপর। ব্যাপারগুলি যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবেন—দেখবেন এই মাপকাঠিগুলি দিয়ে সৌন্দর্য মাপবার এই প্রক্রিয়াটি একটি অযৌক্তিক, হাস্যকর প্রয়াস বলে মনে হবে। কিন্তু আমাদের মননে-রুচিতে তা এমনভাবে শেকড় গেড়ে রয়েছে যে—অন্যরকম কিছু ভাবাটাই সেখানে অস্বাভাবিক, অন্য কিছু বলাটা অবান্তর বলে মনে হবে অনেকের কাছেই।

থাক সে কথা। মানুষের সৌন্দর্যের বিচার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাপকাঠিতে না মেপে শুধুমাত্র শারীরিক গঠনের স্কেলে যারা বাঁধতে ইচ্ছুক তাদের সেই স্কেলটিকে ধরে নিয়েই এবার আসছি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে—অর্থাৎ শরীর ও মুখের গঠনের কথায়। এখানেও একটা কথা বলে নিই—একটা মানুষের মুখের আদল দেখে তাকে প্রায়শই চিহ্নিত করা হয় 'সার্প', 'ব্লাণ্ট' বা 'স্মার্ট' বলে—প্রায়শই ব্যবহৃত হয় 'চোখ-মুখে বুদ্ধিমত্তা'র-ছাপ—এগুলি আরেক ধরনের ভ্রান্তিবিলাস। (এ যেন মানুষের বুদ্ধি-রুচি-মনন সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে আসে মায়ের পেট থেকেই।) স্বভাবতই এই মুখটির গুরুত্ব বুঝে 'প্রসাধন ব্যবসায়ি'রা এবং আধুনিক যুগে 'প্লাস্টিক সার্জন'রা যে বিশাল ব্যবসার ফাঁদ গড়ে তুলবেন তাতে আর অবাক হবার আছে কি ?

এবার বরং সরাসরি চলে আসি দেহের কথায়। দেহের লাবণ্য, চামড়ার মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার প্রতি সকলেরই আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু এই 'লাবণ্য' 'উজ্জ্বলতা' বিচার হয় কিসের নিরিখে ? কিছু বাঁধা ছক রয়েছে পুরুষদের চোখে—সেই অনুযায়ী লাবণ্য ইত্যাদির মূল্যায়ন হয়। যদি সত্যিই তা না হতো, তাহলে সর্বপ্রথম চলে আসতো 'স্বাস্থ্যের' কথায়। পরিমিত পুষ্টিই হলো স্বাস্থ্যের এবং দেহসৌষ্ঠবের মূল বুনিয়াদ। এই যে আমরা 'নরম' 'কমণীয়' শরীরের কথা বলি তাতো নির্ভর করে শরীরের পুষ্টি ও কর্মক্ষমতার ওপর। আমাদের ঠিক চামড়ার নিচে থাকে একটি স্তর, যাকে বলে সাব-কিউটেনিয়াস টিস্যু (Sub-cuteneous tissue)। এই স্তরে চর্বি জমার উপর নির্ভর করে শরীরটা কতখানি গোলগাল এবং কমনীয় হবে। শারীরিক পরি-শ্রমের জন্য শরীর পেশল হয়—যাকে অনেকে সুঠাম দেহ বলে—সে-সব নির্ভর করে কাজকর্ম করা ও শরীরচর্চার ওপর। মুখের কমনীয়তা যা পুষ্টির প্রকাশ, সমগ্র শরীরের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না, ঘটা সম্ভব নয়—কথাগুলি

বোধহয় সবারই জানা। চমড়ার সুস্থতা এবং উজ্জ্বলতা নির্ভর করে সেই একইভাবে শরীরের পুষ্টির ওপর, পরিবেশের ওপর—অর্থাৎ যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে তার শরীর লালিত-পালিত হচ্ছে—তার ওপরই। রোদ-জলে ভেজা শরীরের আদল, অট্টালিকার অন্তঃপুরে লালিত শরীরের থেকে আলাদা হতে বাধ্য—সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু দেহসৌষ্ঠবের মাপকাঠিটি যদি শুধুমাত্র সেই ওপরতলার মানুষদের গড়নে নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ী বাকিরা নিজেদের গড়তে চাইলে থেকে যায় বিরাট একটা ফাঁক—আর সেই ফাঁকটা ভরতে আমদানি হয় হরেক-রকমের প্রসাধনের। এগুলি বিভিন্ন যুক্তির ওপর ভর করে আসে, কখনো 'স্বাস্থ্যে'র দোহাই দিয়ে, কখনো 'রুচি', 'সৌন্দর্যে'র বাহন হয়ে। আজকের দিনে এগুলি শরীর-পরিচর্যার এক অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলিকে কেউ যদি সৌন্দর্য পরি-স্ফুটনের আকর হিসেবে দেখতে চান দেখতে পারেন, আমি কোনো দুরূহ বিতর্কে যাব না। আমার বক্তব্য এবার, মূলত 'শরীর-পরিচর্যা'য় প্রসাধনের ভূমিকাকে একটু যাচাই করে দেখবার প্রচেষ্টা মাত্র।

মুখে মাখার ক্রিমের কথাতেই আসা যাক। বাজারে বহুবিধ নামি-দামি ক্রিম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের 'শ্রেষ্ঠতা'-র বড়াই করে থাকে—চামড়ার সুস্থতা ও ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে বিরুদ্ধ-পরিবেশের আঘাত থেকে বাঁচাতে এগুলি যে 'অতুলনীয়' এমন দাবি প্রায় প্রত্যেক ক্রিম ব্যবসায়িই করে থাকে। এছাড়াও অনেকে দাবি করে, মুখের দাগ মুছে দিতে, এমনকি মুখের রং পরিবর্তনের (আর একটু ফর্সা করতে) কেরামতিতেও নাকি এই সমস্ত মুখে মাখার ক্রিমের অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। সে-সব কথায় পরে আসছি। প্রথমত আমাদের শরীরের চামড়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলি একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। এ-ব্যাপারে বহু ভুল ধারণা রয়েছে। প্রথমত আমাদের শরীরের চামড়া কিন্তু নির্জীব বা নিষ্ক্রিয় কোনো আবরণী নয়—যা শুধুমাত্র শরীরটাকে ঢেকে রাখে। চামড়ার রয়েছে নিজস্ব প্রতিরোধক্ষমতা, যা শুধুমাত্র রোদ বা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে শরীরকে রক্ষা করে না—রক্ষা করে জীবাণু-দের হাত থেকেও। চামড়ার নিচে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি যার থেকে এক ধরনের অম্ল নির্গত হয় এবং বাইরের জীবাণুদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। রয়েছে সিবেসিয়াস গ্রন্থি যা থেকে নির্গত হয় এক ধরনের তৈলাক্ত-পদার্থ—যার অতি-পাতলা প্রলেপ শরীরকে শুকিয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচায়। কড়া তাপ বা শুষ্ক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বর্ম হিসেবে তা কাজ

করে। অবশ্য আবহাওয়া খুব শুষ্ক (যেমন শীতকালে) বা খুব কড়া রোদ হলে তখন বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া আমাদের শরীরের চামড়ায় রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারী জীবাণু যা বাইরের ক্ষতিকারক জীবাণুদের শরীরে ঢুকতে বাধা দেয়। আমাদের চামড়ার আরো একটা বিশেষ ধর্ম হলো, অনেকটা সাপের মতো খোলস ছাড়া—অবশ্য এ-খোলস খালি চোখে দেখা যায় না, সবসময়ই চামড়ার নিচের স্তরে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তারা একটু একটু করে ওপরে উঠে আসে এবং সব থেকে বাইরের কোষগুলি তখন ঝরে পড়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে, চামড়ার ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্য নির্ভর করে শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টির ওপর এবং নিজেকে রক্ষা করবার, সুস্থ রাখবার, নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে চামড়ার নিজেরই।

অনেকেই প্রশ্ন করবেন তবে কি ক্রিমগুলির মুখে মাখার কোনোই প্রয়োজন নেই? সে-কথায় আসার আগে আমরা একটু দেখে নিই, এই মুখে মাখার ক্রিমগুলিতে কি থাকে? বাজারে বহুধরনের ক্রিম রয়েছে—যেমন সাধারণ ক্রিম, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, ভিটামিনযুক্ত বা ভেষজ-যুক্ত ক্রিম ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে ভ্যানিশিং ক্রিম ছাড়া অন্য ক্রিমগুলিতে থাকে মূলত—এক, কোনো ধরনের তেল তা ভেষজ তেল (যেমন অলিভ তেল) বা কোনো মিনারেল তেল হতে পারে, তবে মিনারেল তেলগুলি দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা বলে সবাই সাধারণত এগুলিই ব্যবহার করে থাকে; দুই, এ-ছাড়া থাকে কোনো এক ধরনের চর্বি তা প্যারাফিন বা ল্যানোলিন হতে পারে বা অন্য কোনো চর্বিও হতে পারে; তিন, আর থাকে মোম জাতীয় পদার্থ (wax) যেমন মৌচাকের মোম (bees wax)। এগুলি মেশানো থাকে জলের দ্রবণে। সাধারণভাবে জলে তো তেল বা চর্বি মেশে না, তাই এগুলিকে জলে মেশানোর জন্য ব্যবহার করা হয় কোনো একধরনের মিশ্রক (emulsifier)। আর ক্রিমগুলিতে থাকে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি পদার্থ। এগুলির সঙ্গে ভ্যানিশিং ক্রিমগুলির তফাৎ এখানেই যে, তেলের বদলে সেখানে থাকে গ্লিসারিন আর মোম জাতীয় পদার্থের বদলে সেখানে মেশানো হয় স্টিয়ারিক অ্যাসিড। আর এই যে ভ্যানিশিং ক্রিম মুখে মাখার পর মিলিয়ে যায় (যার জন্য এর নাম ভ্যানিশিং ক্রিম) তার কারণ হলো ভ্যানিশিং ক্রিম-এ ব্যবহৃত পদার্থগুলির যে মিশ্রণ তৈরি হয় তা মুখে মাখার পর খুব পাতলা একটা আবরণ ফেলে

চামড়ার ওপর ; আর এর গলনাঙ্ক চামড়ার উত্তাপের থেকে বেশি, ফলে অন্যান্য ক্রিমের মতো এটা চটচটে হয় না, কিন্তু মুখটাতে একটু হালকা আভা এনে দেয়—এর ওপর ফেস পাউডার ইত্যাদি লাগাতে সুবিধা হয়। আর ডিপ-ক্লিনসিং ক্রিমগুলিতে তেলটি অবশ্যই কোনো মিনারেল তেল (পেট্রো-লিয়াম থেকে তৈরি হয়) এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে মেশানো থাকে। কোনো একটা ক্রিম কতখানি নরম বা শক্ত হবে তা নির্ভর করে এই মিনারেল তেলের ওপরই।

এই ক্রিমগুলি, বিশেষত ক্লিনসিং ক্রিমগুলি, মুখের ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ; মূলত মিনারেল তেলটির উপস্থিতির জন্য। কিন্তু এর বেশি ব্যবহার মুখের চামড়ায় থাকা চর্বি গলিয়ে দেয়। তাই সাবধানতা অবশ্যই প্রয়োজন। অনেকেই ক্রিম দিয়ে মুখটি পরিষ্কার করার পর দ্বিতীয়বার এটি ব্যবহার করে যাতে মুখের তৈলাক্ত ভাবটি বজায় থাকে। কিন্তু শরীরের চর্বি, যা কিছুটা নষ্ট হয়ে যায় এই ধরনের ক্রিম ব্যবহারের ফলে, তা কিন্তু এভাবে ফেরানো যায় না—কারণ এই ক্রিমগুলিতে ব্যবহৃত তেল মানুষের শরীরের চর্বি থেকে গুণগতভাবে আলাদা। তাছাড়া এই ক্রিমগুলির আরও একটা অসুবিধা হলো যে, মুখের তেল-তেলে ভাবটা কখনোই পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না। অথচ খুব সহজেই মুখের ময়লা মুছে ফেলা যায় কোনো সাবান ব্যবহার করে। এতে খরচ অনেক কম হয়—অবশ্য অনেকের ক্ষেত্রে মুখের চামড়ায় খস-খসে ভাব আসে। সেক্ষেত্রে মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধোয়ার পর, যে কোন ভেষজ-তেল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটাই হবে শরীরের পক্ষে অনেক স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া।

অবশ্য ক্রিম ব্যবহারের অন্য যে কারণগুলি রয়েছে তা হলো—বাইরের ধুলো-ময়লা, রোদ বা শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচানো। এটা ঠিকই, এতে ব্যবহৃত তেল বা চর্বি মুখের ওপর একটি আবরণ গড়ে তোলে এবং চামড়ার থেকে জলীয় বাষ্প দূরীকরণে বাধা দেয়। ফলে চামড়া ফাটা (বিশেষত শীতকালে) বন্ধ হয়। রোদের খর প্রকোপকে কিছুটা আড়াল দিয়ে রাখে এই আবরণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্রিমের তৈলাক্ত ভাব কার্যত ধুলো-ময়লাকে আটকে রাখতেই সাহায্য করে—বিশেষত ধুলো-কালি অধ্যুষিত শহরাঞ্চলে। এখানে আর একটা কথা বলে নিই, কোল্ড ক্রিমগুলিরও তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই (অনেকে দাবি করেন যে, এতে

ল্যানোলিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যা শরীরের নিজস্ব চর্বির কাছাকাছি)। আর ভ্যানিশিং ক্রিমগুলি সম্পর্কেও একটা কথা বলার আছে—এগুলি বেশি ব্যবহার করলে চামড়ায় একটা জ্বালা জ্বালা ভাব অনুভূত হতে পারে কারণ এগুলি আবার চামড়া থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ করে। ভ্যানিশিং ক্রিম মেক-আপ এদেশে বহুলপ্রচলিত হলেও, বাইরের দেশে এর ব্যবহার ক্রমশই কমে আসছে, কারণ মেক-আপের জন্য অন্য বহুকিছুই (যেখানে ভ্যানিশিং ক্রিম মেখে মুখে একটি আবরণী ফেলে মেক-আপ করার দরকার হয় না) আজ বাজারে চলে এসেছে, যা সরাসরি মুখে লাগানো যায়।

মুখের ক্রিম সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব দাবি কোম্পানিগুলি করে থাকে তার একটি হলো, চামড়ায় পুষ্টি যোগাতে ভিটামিন-এর ব্যবহার। সাধারণ ভাবে বলা যায়, ভিটামিনের অভাবে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হওয়াটা এক বিরল ঘটনা। আর তা যদি কখনো হয়েও থাকে তার পূরণ ক্রিম দিয়ে করা সম্ভব নয়। ওভাবে চামড়ায় ভিটামিন পৌঁছে দেওয়া যায় না—যদি একান্তই তা দরকার ঘটে তাহলে প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাধ্যমেই তা পূরণ করতে হবে।

অপর যে-দাবিটি বহু ক্রিম-বিক্রেতা করে থাকে তা হলো মুখের রঙ ফর্সা করে দেবার চমকপ্রদ যুক্তি। চামড়ার ঠিক ওপরের স্তর, যাকে বলা হয় এপিডারমিস (Epidermis), তাতে এক ধরনের কোষ থাকে, তাকে বলে মেলানোসাইট—এরা তৈরি করে মেলানিন (Melanin)। এই মেলানিনের ওপরই শরীরের রঙ কতখানি কালো বা ফর্সা হবে তা নির্ভর করে। ফর্সা হওয়ার প্রতি আমাদের রয়েছে এক অসাধারণ মোহ। তাই স্বভাবতই এধরনের বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হন অনেকেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ক্রিমগুলিতে যে-সব রাসায়নিক সাধারণভাবে রয়েছে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই 'মেলানিন' তৈরির প্রক্রিয়াটিকে কোনো-ভাবে প্রভাবিত করার। তবে একটা অভিজ্ঞতা বোধ হয় সবারই আছে—রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করলে শরীরের রং তামাটে হয়ে যায়; তার কারণও কিন্তু এই 'মেলানিন'। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra-violet ray) চামড়ার ওপর পড়লে কোষগুলি উত্তেজিত হয় এবং মেলানিন-এর আধিক্য ঘটে।

তাই য়ুরোপের বহু মানুষই শরীরে একটু তামাটে ছাপ আনার উদ্দেশ্যে সূর্যস্নান (Sun-bath) করে থাকেন। কিন্তু এই রঙও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কারণ আমাদের শরীরে মেলানিন যেমন একদিকে তৈরি হচ্ছে, তেমনি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কারণে তা ভেঙেও যাচ্ছে ক্রমাগত। পুরোনো মেলানিন ভেঙে নতুন মেলানিন তার জায়গায় স্থান নিচ্ছে। এভাবেই শরীরের পূর্বের রঙ কিছুদিন পরেই ফিরে আসে। এই কারণটির জন্য আমাদের শরীরে কাটা-ছেঁড়া ইত্যাদি সেরে ওঠার পর কিংবা ব্রণের জন্য যে কালো দাগ পড়ে তাও কিছুদিনের মধ্যেই মুছে যায়—এবং এটা কোনো ক্রিম বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার ব্যতিরেকেই সম্ভব। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, চামড়ার এই মেলানিন যা সাধারণত চামড়ার ওপরের স্তর অর্থাৎ এপিডারমিসে (Epidermis) থাকে তা যখন নিচের স্তর অর্থাৎ ডারমিসে (Dermis) চলে যায় তখন এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো মলম তা সে যে নামেরই হোক না কেন, কোনো কাজ করতে পারে না। ডাল বাটা, ডাবের জল, মাখন, সর কোনো কিছুরই কোনো কার্যকর ক্ষমতা নেই এই কালো রঙ তুলে দেবার। মাখন-সর-ডাল বাটা এগুলি চামড়ার লালিত্য বা স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। এইসব পদার্থগুলি দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করার জন্য মুখের রক্ত সঞ্চালন কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্য সাধারণভাবে মুখে রক্ত সঞ্চালন যথেষ্টই, সেখানে ম্যাসাজের বাড়তি কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কেউ যদি সর-মাখন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে চান অসুবিধে নেই, যদি খরচে পোষায়।

সাধারণভাবে ক্রিম, ইত্যাদি সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি আটকাতে পারে না—কিছু কিছু রাসায়নিক (ক্যালামিন) অতিবেগুনী রশ্মি কিছুটা আটকানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সেক্ষেত্রে ক্রিমটি রাত্রিতে ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতাই থাকে না এবং সূর্যের আলোতে বেরোনোর প্রাক্কালে মাখার প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে আমাদের মতো দেশের জলহাওয়ায় (যা আর্দ্র ও উষ্ণ—একমাত্র শীতকাল ছাড়া) ক্রিম-এর মতো কোনো তেলতেলে সামগ্রী মুখে মাখা, বলতে গেলে কোনো কাজেই আসে না—না মুখ পরিষ্কার করতে, না চামড়ার 'সুস্থতা' বজায় রাখতে। শীতকালে চামড়ার শুষ্কতা রোধ করতে গ্লিসারিন বা অলিভ তেলের ব্যবহারই যথেষ্ট। বিভিন্ন ভেষজসমৃদ্ধ ক্রিম আজ বাজারে এসেছে। (ভেষজটি কখনো হলুদ, কখনও অন্য কোনো সামগ্রীও হয়ে থাকে)। বারবারই দাবি করা হয়—এগুলি প্রকৃতির থেকে আহরিত, তাই এর ব্যবহার 'স্বাভাবিক' চর্ম

পরিচর্যার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিত। মজার ব্যাপার হলো, প্রকৃতিতে তো অনেক ভেষজই রয়েছে, হঠাৎ এই কয়েক ধরনের ভেষজ চামড়ার কি উপকার সাধন করবে ? কিন্তু এর কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা কোথাও জানা যায় নি। এগুলিতে মূলত ক্রেতাদের আবেগকে ব্যবসার স্বার্থে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। কারণ চামড়ার উজ্জ্বলতা বা সুস্থতা বাইরের থেকে কোনো মলম ব্যবহার করে বজায় রাখা যায় না, তা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। আর সত্যিই যদি প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার কথা ভাবা হয় তবে তো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত এবং এদেশের হাজার হাজার মানুষ কোনো ক্রিম-মলম ব্যতিরেকেই চামড়ার উজ্জ্বলতা ও সুস্থতা বজায় রেখেছে ও রাখছে। আসলে নরম 'তুলতুলে' বা 'ফর্সা'-র গুরুত্বটি তুলনামূলকভাবে সৌন্দর্য বিচারের মানদণ্ডে জাঁকিয়ে না বসলে বোধহয় এমনটি হতো না।

ইদানীং ক্রিমগুলিতে আরো দু-টি জিনিসের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে। একটি হলো 'ভিটামিন-ই' এবং অন্যটি 'হরমোন'। 'ভিটামিন-ই'-র প্রচার রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। চামড়ার দাগ ও ভাঁজ পড়া তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো, এমনকি হৃত-যৌবন ফিরিয়ে আনার দাবিও এতে জুড়ে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য এগুলি আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আর হরমোনের ব্যবহার হয় একটু অন্যভাবে। বাচ্চা প্রসবের পর গর্ভাশয় থেকে বেরিয়ে আসে প্লাসেণ্টা (Placenta—চলতি কথায় যাকে বলে 'ফুলপড়া'), তা সংগ্রহ করা হয় হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলি থেকে। এমনকি আমাদের দেশে এবং এই কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত 'এজেণ্ট'রা রয়েছেন তা সংগ্রহ করার জন্যে।

এই প্লাসেণ্টা থেকে ওষুধ কোম্পানিরা তৈরি করেন হরমোন। আর ক্রিম-প্রসাধন ব্যবসায়িরা এই প্লাসেণ্টা-এক্সট্রাক্ট (Placenta-extract) মেশান তাদের প্রসাধনসামগ্রীতে। এমন একটি ধারণাও অনেকেরই রয়েছে যে, এর ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধের শরীরের চামড়াও শিশুর মতো পেলব-কমনীয় ও ভাঁজহীন হয়ে উঠবে। যদিও এটি একটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এছাড়া জীব-জন্তুর হাড়—তরুণাস্থি (Cartilage) থেকে সংগ্রহ করা হয় 'কোলাজেন' (Collagen) এবং মেশানো হয় নানান 'ফেস-ক্রিমে'—একই এক অদ্ভুতুড়ে বিশ্বাসে—তা নাকি চামড়ার সঠিক বয়েসকে লুকিয়ে রাখতে

পারবে। এই কোলাজেন প্রয়োজনে সংগ্রহ করা হয় মৃত ভ্রূণ থেকেও। এর ব্যবহার প্রভূত ; বিশেষত বিদেশী ক্রিমগুলিতে। শুধু কোলেজেন নয়, ভ্রূণ-এর স্প্লীন (Spleen) লিভার ইত্যাদি গুঁড়িয়ে পুরে দেওয়া হয় ক্রিমে এবং দাবি করা হয় একদম টাটকা কোষ মেশানো রয়েছে এতে যা ফিরিয়ে দেবে চামড়ার 'হৃত-যৌবন'। য়ুরোপ-আমেরিকায় এ-সব ক্রিমের কদর খুব বেশি—ফ্রান্সে ১৯৮০ সালেই প্লাসেণ্টা, ভ্রূণের স্প্লীন এবং লিভার যথাক্রমে ৬৩০ টাকা, ৫৬০ টাকা ও ৪২০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে।

এর সঙ্গে প্রসাধন বিক্রেতাদের প্রচারকৌশল তো রয়েছেই। সাধারণ ক্রেতা কিভাবে মোহিত হন বিজ্ঞাপনের প্রচারে তা বাজারে একটি ক্রিমের বিক্রি দেখলেই বোঝা যায়। হিন্দুস্থান লিভারের 'ফর্সা' করে তোলার ক্রিম 'ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী' বিক্রি হয় বছরে ৪ কোটি টাকার ওপর। ভারতবর্ষের মতো দেশেও প্রসাধনের ব্যবসায় বছরে ১৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়। শুধু পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের মানুষেরা সমগ্র প্রসাধনের ৩৫% ব্যবহার করে—তারা মূলত ক্রিম এবং চোখের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনগুলির ক্রেতা। দক্ষিণ ভারতে ট্যালকাম পাউডার ও লিপস্টিকের বাজার বাড়বাড়ন্ত। আজ বড়ো বড়ো শহরে বিউটি পারলার গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো—কলকাতা শহরও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রসাধনের এই ব্যবহার আজ শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিমিত আহার ও শরীর পরিচর্যার জায়গা দখল করছে ক্রিম, পাউডার, লিপস্টিক, নেল-পালিস ইত্যাদি সব প্রসাধন। তাই 'ল্যাকমে'-র ব্যবসা একলাফে চড়ে গেছে ১৯ কোটি টাকায়, 'পণ্ড্‌স'-এর ব্যবসা ২০ কোটি টাকারও বেশি। সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে 'ভিকো ল্যাবরেটরী' ও 'ডাবর' ; তাদের মূলধন···'ভেষজ নামের মাহাত্ম্য'! প্রসাধন ব্যবহারের প্রতি পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে যাচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন রুচির। আজ বহু মহিলাদের কাছে প্রসাধন ব্যতিরেকে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে ; শহরের বহু মহিলাকে দেখা যাবে যারা মাসে ৪০-৫০ টাকা শুধু প্রসাধনের পেছনে খরচ করছেন—অন্তত সমীক্ষায় তাই জানা যাচ্ছে।

ক্রিম ইত্যাদির দামের কথায় আপাতত আসছি না। এতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের বাজার-দর থেকে আপনিই হিসেব করে দেখে নিতে পারেন

কি বিপুল পরিমাণ লাভ করে স্রেফ এক শিশি মুখে-মাথার ক্রিম বিক্রি করে।

সূত্র :
1. Foods Drugs & Cosmetics ; Thakkamma Jacob
2. The Beauty Boom ; India Today, March 31, '82
3. Utusan Konsumer ; March '86

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত হিসেব-নিকেশ ১৯৮২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া।]

□ স্মরজিৎ জানা

লিপস্টিক ও সুর্মার বিপদ

বিশ্বাস করবেন, প্রথম যখন লিপস্টিকের ব্যবহার শুরু হলো তখন তার রঙ ছিল সাদা! উদ্দেশ্য—ঠোঁট ফাটা বন্ধ করা, ফাটা ঠোঁটের জ্বালা কমানো। আজকের দিনের লিপস্টিকও মূলত ঐ দুটো এবং সাথে সাথে আরো অন্যান্য কিছু কিছু উদ্দেশ্য সাধন করছে।

কি দিয়ে লিপস্টিক তৈরি হয় জানেন? মোম, রেড়ি বা প্যারাফিন, ক্যাষ্টর-অয়েল ইত্যাদি জাতীয় কোনো তেল, চর্বি—যেমন ল্যানোলিন বা হাইড্রোজেনেটেড ক্যাষ্টর, সুগন্ধি, রঙ, বিষক্রিয়া নষ্ট করতে পারে এমন কোনো ওষুধ (anti-toxidants) ইত্যাদি।

ভালো লিপস্টিকের মানদণ্ড কি? একটা আদর্শ লিপস্টিককে হতে হবে আকর্ষণীয়। অনুভবে এবং দেখতে একই রকম হতে হবে। এর গলনাঙ্ক দেহের তাপমাত্রার থেকে অবশ্যই বেশি হতে হবে। লিপস্টিক ঠোঁটে সহজেই লাগানো যাবে, চারিদিকে সমানভাবে লাগবে। ঠোঁটকে শুকনো হতে দেবে না, ফাটতে দেবে না, খরখরে হতে দেবে না। যথেষ্ট সময় ধরে ঠোঁটে লেগে থাকবে। ঘামবে না। চা খেতে গেলে কাপে, পোষাকে কিংবা রুমালে লিপস্টিক উঠে আসবে না। বছরের পর বছর

ধরে একই রকম থাকবে। অনেকদিন ধরে ঘরে রাখবার পরও নষ্ট হবে না। ঝড়ো কিংবা খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও একই রকম থাকবে। কখনো কোনো বিষক্রিয়া থাকবে না, ঠোঁটে লাগালে কখনোই ঠোঁট জ্বালা করবে না।

বাজারে যে-লিপস্টিক পাওয়া যায়, সাধারণভাবে তা এই সব প্রয়োজনীয় সর্তগুলির সবগুলি মেটাতে পারে না। খুব ভালো লিপস্টিকেরও যেটা সবচেয়ে বড়ো দোষ তা হলো রঙের ব্যবহারে অ্যালার্জিক রিঅ্যাক্শান। এই অ্যালার্জি কিম্বা অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা টের পাওয়া যায় যখন চামড়া ফুলে যাওয়া, ফুসকুড়ি ওঠা, ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, ঠোঁট ফাটা, চোখের পাতায় ফুসকুড়ি জাতীয় কিছু হওয়া, মাথা ধরা, চুলকানি হওয়া, ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি উপসর্গগুলি দেখা দেয়। যে-রঙগুলি অনেকসময় ধরে ঠোঁটে থাকে এবং ঠোঁটকে বেশি রাঙায় সেই সব ক্ষেত্রেই এই সব রিঅ্যাক্শানের সম্ভাবনা বেশি।

আমরা নানান ওষুধের অপব্যবহারের কুফলের কথা প্রায়শই শুনে থাকি। ওষুধতো তবু ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী খাওয়া হয়। তাছাড়া রোজ-ই তো আর কেউ ওষুধ খায় না, খায় মাঝে-মধ্যে। লিপস্টিক কিন্তু কেউ কেউ রোজই ঠোঁটে লাগায় এবং দিনের মধ্য কয়েকবার করে। কাজেই বুঝতেই পারছেন, মান ঠিক রাখার (quality control) কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এই সব প্রসাধন দ্রব্য, ব্যবহারকারীদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হতে পারে।

অন্যান্য যে সব প্রসাধনী শরীরের বাইরের দিকে চামড়ার ওপর লাগানো হয় লিপস্টিক ব্যবহারের বিপদটা তাদের চাইতে ঢের বেশি। কেন না লিপস্টিকের কিছু অংশ খাদ্য এবং লালা-থুতু ইত্যাদির সাথে সাথে পেটে চলে যেতে পারে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে লিপস্টিক ব্যবহারের ফলে ক্ষতি কি কি হয় সে-ব্যাপারে কোনো সমীক্ষা নেই, তবু এটুকু বলা যায় যে, রঙ কিংবা রঙ করার উপাদান থাকার ফলে লিপস্টিকের ব্যবহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। ঠোঁটের বাইরের চামড়াটা খুবই পাতলা এবং ঠোঁটকে নরম রাখবার জন্য কোনো তেল নিঃসরণকারী গ্রন্থিই (Sebaceous gland) নেই; সেই কারণেই ঠোঁট শুকিয়ে যায়। ঠাণ্ডা শুষ্ক আবহাওয়ায় ঠোঁট ফাটে যদি, তো সেই ফাটল দিয়ে লিপস্টিকে যে-পদার্থগুলি ব্যবহার করা হয় তা শরীরের ভেতর ঢুকে যেতে পারে। ইদানীং লিপস্টিকের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এক সময় মূলত

দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন ছিল, ইদানীং সারা ভারতেই লিপস্টিকের চল। তাই বছর দশেক আগেও যেখানে কোম্পানিগুলির ১০-১২টি রঙ-এর বেশি কোনো লিপস্টিক ছিল না, আজ সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি প্রস্তুতকারক সংস্থাই ৪০-৫০টি রঙ-এর লিপস্টিকের পসরা সাজিয়ে বসেছে। এদেশে সর্বমোট প্রায় ৫০০ বিভিন্ন রঙ ও ব্র্যাণ্ডের লিপস্টিক মেলে। এতে বিভিন্ন ধরনের এজো-ডাই (Azo Dye) রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের লিপস্টিকে রোডামিন বি (Rhodamine B) নামে একটি রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যার ক্যান্সার তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া ব্রিলিয়াণ্ট ব্লু (Brilliant Blue) রঙটিও ক্ষতিকারক। অ্যালার্জি ছাড়াও এ থেকে ক্যান্সার হতে পারে। আগেই বলেছি, প্রসাধনগুলির মধ্যে লিপস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ এতে প্রায় ২৪ রকমের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যেকটি রাসায়নিককে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে শুধু রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নতুবা ইঁদুর এবং গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করে নেওয়ার নীতিও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সবকটি প্রস্তুতকারকের সেই রকম বিস্তৃত ল্যাবরেটরি বা গবেষণা-গারের সুবিধা রয়েছে বলে জানা নেই। এদেশের ড্রাগ অ্যাণ্ড কসমেটিক অ্যাক্ট (১৯৬২) অনুযায়ী লিপস্টিকের প্রস্তুত-কারকদের ওপর বহু নিয়মবিধি আরোপিত হলেও তাকে কার্যকর করার মতো সরকারি সামর্থ ও গবেষণাগার কিছুই নেই। তাই এদেশের বাজারে চালু লিপস্টিকগুলিতে যে বহুধরনের ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহৃত হবে বা হচ্ছে তা বোধহয় অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

ছোট ছোট কারখানায় তৈরি কিছু কিছু লিপস্টিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এতে যে-পরিমাণ লেড, আর্সেনিক রয়েছে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া এতে যেসব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেইসব রঙ এবং তার পার্সেণ্টেজ এত বেশি যে তা বিভিন্নভাবে শরীরের ক্ষতি করে। অথচ শহরের বস্তিতে-গাঁয়ে-গঞ্জে এ ধরনের লিপস্টিকের চলই বেশি।

***

লিপস্টিকের মতো বহুলপ্রচলিত না হলেও—বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুর্মার প্রচলন আজও যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

সুর্মা এক ধরনের সূক্ষ্ম চূর্ণ, চোখে কাজলের মতো লাগানো হয়ে থাকে। অ্যাণ্টিমনির উর্দু প্রতিশব্দ সুর্মা। কারণ শুরুতে ব্যবহারের সময়

সুর্মার মূল উপাদান ছিল অ্যান্টিমনি সালফাইড। কিন্তু প্রাচ্য ফার্মাকোপিয়ায় এর সাথে দস্তা এবং সীসারও উল্লেখ আছে। বর্তমানে অ্যান্টিমনি সালফাইডের অভাবে তার বদলে লেড (সীসা) সালফাইড ব্যবহার করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান সম্প্রদায় এটি ব্যবহার করে আসছেন সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং চোখের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বর্তমানে এর সাথে সীসা মেশানোর ফলে সুর্মা থেকে মানুষের ক্ষতি হবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ মোটেও সচেতন নন।

উলফত আর আলি এবং তার সঙ্গীরা বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে [৩০শে-সেপ্টে, '৭৮] সুর্মা সম্পর্কিত তাদের গবেষণার ফলাফল বিবৃত করেন। তারা চার মাস ধরে নটিংহ্যাম শিশু হাসপাতালে মোট ৬২ জন এশিয়ান শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন।

পরীক্ষার পর দেখা গেল, ৬২ জনের মধ্যে যে ২৫ জন শিশু সুর্মা দেয় নি তাদের রক্তে সীসার পরিমাণ ছিল ·০২০৩ (±·০০৮৭) মিলি গ্রাম/১০০ মিলি লিটার। আর যে ৩৭ জন শিশু সুর্মা ব্যবহার করেছে তাদের রক্তে সীসার গড় পরিমাণ ছিল ·০৩৪২ (±·০১৪১) মিলি গ্রাম/১০০ মিলি লিটার। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। কারও রক্তে সীসার পরিমাণ ·০৩৭৩ মিলি গ্রাম/১০০ মিলি লিটার-এর বেশি হলে চিন্তার বিষয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ৩৭ জন সুর্মা ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫ জনের রক্তে সীসার পরিমাণ ছিল ·০৪৯৭ মিলি গ্রাম/১০০ মিলি লিটার বা তার চেয়েও বেশি। এদের কেউই অবশ্য তখন পর্যন্ত সীসা ঘটিত বিষক্রিয়ার শিকার হয় নি।

এই সমীক্ষা থেকে একটা কথা স্পষ্ট বলে প্রমাণিত হয় যে, সুর্মা ব্যবহার ও রক্তে সীসার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

কনজাংটিভা (চোখের ওপর পাতলা পর্দা) থেকে যদিও সরাসরি সীসা শরীরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু তার সাথে বেশি করে চোখের জল তৈরি হওয়া, আঙ্গুল দিয়ে চোখ ঘষা ও সেই আঙ্গুল চোষার ফলে শরীরে সুর্মাজনিত সীসা প্রবেশের খুবই সম্ভাবনা।

এই গবেষকরা বিভিন্ন ধরনের ২৯টি সুর্মার নমুনা বিশ্লেষণ করেন। সাদা সুর্মার যে ৬টি নমুনা পাওয়া গিয়েছিল তাতে খুব সামান্য সীসা বা কোনো সীসাই ছিল না। ১৮টি ধূসর রঙ-এর সুর্মায় সীসা ছিল খুবই

বেশি। এর মধ্যে ১৪টিতে ৮০%এর বেশি এবং ৩টি নমুনায় ৭৫-৮০% সীসা (লেড সালফাইড হিসেবে) ছিল। ৫টি কালো রঙ-এর নমুনায় সীসার পরিমাণ ১২-৩২% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটি নমুনায় অশ্রুবর্দ্ধক উপাদান মেনথল বা অনুরূপ রাসায়নিক ছিল।

মালয়েশিয়ার কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব পেনাঙ (Consumer Association of Penang, সংক্ষেপে CAP) সেদেশে বহুলব্যবহৃত তিনটি ব্র্যাণ্ডের সুর্মা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন সেগুলিতে অনুমোদিত মাত্রার তের হাজার থেকে আঠারো হাজার গুণ বেশি সীসা রয়েছে। ভাবনার কথা হচ্ছে মালয়েশিয়ায় সুর্মার মূল সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে ভারত এবং সেই একই সুর্মা মালয়েশিয়া প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও রপ্তানি করে। সুর্মা ছাড়াও চোখের তলায় যারা 'আই-লাইনার' ব্যবহার করেন সেখানেও সীসার ব্যবহার ধরা পড়েছে। ১৯৮১তে কুয়েতে এই সব আই-লাইনার ব্যবহারকারী আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সীসা দূষণের উপ-সর্গ নিয়ে। রসায়নবিদ্ মাইকেল হোলি ও ভেষজবিদ্ মোহাম্মদ আসলাম ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশে ব্যবহৃত সুর্মা ও আই-লাইনার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন এদের বেশ কিছু ব্র্যাণ্ড কার্যত প্রকৃতিতে পাওয়া একধরনের সীসার কিছু যৌগ যা মূলত লেড সালফাইড অথবা গ্যালেনা (Galena) দিয়ে তৈরি।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি ধর্মীয় বা সৌন্দর্যবৃদ্ধির কারণ ছাড়াও 'চোখ ভালো রাখে, চোখের অসুখ সারায়'—এই বিশ্বাসেও সুর্মার ব্যবহার চলছে। অথচ বাজারে চালু সুর্মাগুলিতে কম-বেশি পরিমাণে সীসা মেশানো হচ্ছেই এবং সুর্মা ব্যবহারের সঙ্গে রক্তে সীসার পরিমাণ বৃদ্ধির সরাসরি যোগও দেখা যাচ্ছে। কাজেই ঠিক কী ধরনের সুর্মা কতদিন ধরে কোন ধরনের মানুষ (শিশু-বয়স্ক, নারী-পুরুষ) ব্যবহার করলে কী ধরনের বিষক্রিয়াজাত ক্ষতি হতে পারে সে-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য এই মুহূর্তে না দেওয়া গেলেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায়—দীর্ঘকাল এই (সীসা মেশানো) সুর্মা ব্যবহারের পরিণতিতে ব্যবহারকারীর শরীরে বিভিন্ন মাত্রায় সীসা-ঘটিত বিষক্রিয়া দেখা দিতেই পারে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটতে পারে লিপস্টিক ব্যবহার করে, বিশেষত যে-সব লিপস্টিকে সীসার উপস্থিতি রয়েছে।

অল্প অল্প করে সীসা রক্তে জমতে জমতে যখন নিরাপদ সীমা ছাড়ায় তখনই দেখা দেয় তার বিষক্রিয়া। মুখ আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হতে থাকে।

সেটাই সবথেকে প্রথমে চোখে পড়ে। তারপর হয় অ্যানিমিয়া। শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে দাঁতের গোড়ায় মাড়িতে একটা নীল দাগ দেখা যায়। এসব কারণে পেট কামড়ায়। মাঝে মাঝে পেট শক্ত হয়ে ওঠে। খুব জোরে চেপে ধরলে একটু আরাম পাওয়া যায়। এর সাথে থাকে কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা বমি আর ডায়রিয়া। ১০% রোগীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাংসপেশী দুর্বল হবার ফলে হাতে পায়ে কাঁপুনি হয়, কব্জি ও গোড়ালীর জোর কমে যায়, ঝিমঝিম করে এবং শেষে পক্ষাঘাত হয়—কারণ স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও হৃদপিণ্ড ও কিডনির ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশি। মাসিক-এর গণ্ডগোল এবং বন্ধ্যাত্বের জন্যও সীসা দায়ী হতে পারে। এভাবে চলতে থাকলে স্নায়ুকোষে বিশেষত মস্তিষ্কে এত সীসা জমা হয় যে, সেখানকার স্বাভাবিক কোষগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রোগীর মানসিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে সীসার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের খিঁচুনী হয় এবং এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে মারাও যেতে পারে।

সূত্র :

১. বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল ; ৩০.৯.৭৮, পৃঃ ৯১৫-৯১৬, উলফত আর. আলি, অলিভার আর. সি. স্যালেস ও মোহম্মদ আসলাম
২. ল্যানসেট ; ৬.১.৭৯, পৃঃ ২৮
৩. The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology by Dr. K. S. Narayan Reddy, 5th Ed. '81
৪. মাসিক গণস্বাস্থ্য ৫ম ; বর্ষ ৯ম সংখ্যা

[‘মাসিক গণস্বাস্থ্য’ (পোঃ নয়ারহাট, ঢাকা, বাংলাদেশ)-এর ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭) ‘সুর্মার চোখে’—এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের ‘সুর্মা’ অংশটি গণস্বাস্থ্য পত্রিকার প্রবন্ধটির কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ।]

☐ প্রদীপ দত্ত / জ্যোতির্ময় সমাজদার

ত্বক যদি কেটে যায় ফেটে যায়…

—খবরদার! এমন কোনো জীবাণুনাশক মলম লাগাবেন না যাতে বোরিক অ্যাসিড (Boric acid) রয়েছে—তা যতই সুরভিত হোক না কেন।

অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক মলমের কথায় পরে আসছি। প্রথমে, অ্যাণ্টিসেপ্‌টিকটাই বা কী আর কেটে গেলেই বা কি করবেন, দু-এক কথায় তা সেরে নিই। কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। কেটে বা ছিঁড়ে গেলে প্রথম কাজটি হলো ঐ জায়গাটি পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলা, যাতে বাইরের ধুলোময়লা লেগে না থাকতে পারে। আমাদের শরীরের কোনো অংশ কেটে বা ছিঁড়ে গেলে শারীরবৃত্তীয় কারণ অনুযায়ী তা জুড়ে যায় বা সেরে যায়। মনে রাখবেন, এই জুড়ে বা সেরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই। এটা শরীরের নিজস্ব ব্যাপার এবং শরীর তা নিজের তাগিদেই করবে। কিন্তু এই সেরে যাওয়ার বা জুড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি করে বাইরের ধুলোবালি বা রোগ-জীবাণু। তাই এবার দ্বিতীয় কাজটি হলো কাটা জায়গাটি ধোয়ার পর ঐ অংশটি অন্তত কয়েকদিনের জন্য জীবাণুমুক্ত রাখা। আর তা সহজেই করা যায়, পরিষ্কার কাপড় বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জায়গাটি ঢেকে রেখে। ব্যাস, এটুকুই যথেষ্ট। অনেকে ভাববেন, তার মানে অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক মলম, ক্রিম এগুলির কি কোনো প্রয়োজন নেই? সত্যিই জায়গাটা দূষিত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোনো ওষুধের কোনো ভূমিকাই নেই! অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন, প্রতিরোধক হিসেবে কি কিছু ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়? যদি ঠিকভাবে প্রাথমিক কাজগুলি করা যায় এবং পরিষ্কার গজ বা ব্যাণ্ড-এইড (Band-aid) জাতীয় আবরণী দিয়ে জায়গাটা ঢেকে রাখা হয়, তবে সেটাই হবে সব থেকে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বরং সরাসরি কাটা জায়গায় ওষুধের গুঁড়ো বা মলম ব্যবহার করলে তা ঐ জায়গার নতুন কোষ গঠনে বাধারই সৃষ্টি করে। বাজারে অবশ্য বহুবিধ রাসায়নিক অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Band-aid-এ থাকে লাল রঙ-এর একটা

ওষুধ, যার নাম মারকিউরোক্রোম। কিন্তু কার্যত মারকিউরোক্রোমের জীবাণু-নাশক ক্ষমতা খুবই কম এবং তা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। এখানে Band-aid মূলত ঢাকা রাখার কাজটাই করে থাকে। আর Band-aid-এর ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বায়ু চলাচল সম্ভব হয় বলে কাটা জায়গাটা সেরে ওঠে তাড়াতাড়ি।

ডেটল আজ প্রায় ঘরে ঘরে সমাদৃত একটি নাম, ডেটলের জীবাণুনাশক ক্ষমতা কিছু ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও, আরও বহু ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে আদৌ কার্যকর নয়। অনেক ধরনের অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক মলম বাজারে রয়েছে—ফুরাসিন, নেবাসালফ ইত্যাদি। অনেকেই পটাপট এগুলির ব্যবহার করে থাকেন—প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। তবে সদ্য-কাটা কোনো জায়গায় তখনই কোনো মলম লাগাবার প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই কাটা জায়গাটা বড়ো হলে সেলাই করা ইত্যাদির দরকার রয়েছে। আর আগুনে পুড়ে গেলে? সেখানে প্রথম কাজটি হলো, পুড়ে যাওয়া অংশটি ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ (৫/৭ মিনিট) ডুবিয়ে রাখা বা ঠাণ্ডা জল আস্তে আস্তে ঐ পোড়া অংশটির ওপর ঢালতে থাকা। পোড়া অংশটি ছোটখাট হলে এর বেশি কিছু করার দরকার হয় না। ফোস্কা পড়লে ওগুলিকে গালবার একদম চেষ্টা করবেন না। তড়িঘড়ি কোনো মলম লাগাবার দরকার নেই। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার, পোড়া জায়গাটা যাতে দূষিত না হয়ে যায়—বাইরের ধুলো-বালি-ময়লার সংস্পর্শে যেন না আসে। পুড়ে যাওয়া ও বার্নল (Burnol) ওষুধের নামটি প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অনেকের ধারণা এটি পোড়া জায়গায় ঠাণ্ডা প্রলেপ দেয় এবং ওষুধ কোম্পানিটি ওইভাবেই তা প্রচার করে—যদিও এটি সর্বৈব মিথ্যা। বার্নলে এমন কিছু নেই যাতে পোড়া জায়গায় লাগালে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। এতে যে অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক পদার্থটি রয়েছে তার নাম ইউফ্লেবিন (Euflavin)। এর কার্যকারিতা এত অল্প যে, আমেরিকায় তা অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক পদবাচ্যই নয়। যদিও বহুজাতিক কোম্পানি বুটস্‌ প্রচার করে যে, এটি ব্যবহার করলে পোড়া জায়গা তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। ব্যাপারটি কিন্তু উল্টো, পোড়া জায়গায় বারবার এটি ব্যবহার করলে ঘা সারতে দেরিই হবে। আর মলমটির হলুদ রঙ-এর দরুন পোড়া ঘা-এর প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ হলুদ রঙ-এর জন্য তা ঢাকা পড়ে যায়।

এবারে সেই 'অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক' মলমগুলির কথায় আসছি। এগুলির

বাজার বেশ রমরমা। 'অ্যান্টিসেপ্‌টিপ' দাবিটাও তারা বেশ জাঁক করেই করে থাকে। যেমন বোরোলীন, বোরোপ্লাস, বোরোক্যালেগুলা ইত্যাদি। আগে দেখা যাক এগুলিতে কি থাকে? এগুলির মূল রাসায়নিক হলো বোরিক অ্যাসিড ও জিংক অক্সাইড এবং এগুলি সাধারণত সাদা পেট্রোলিয়াম জেলির মধ্যে মেশানো থাকে। এখানে পেট্রোলিয়াম জেলি বেস (base) হিসেবে কাজ করে। এর কোনো ওষধিমূল্য নেই। অনেকে আবার ল্যানোলিন নামক চর্বিটি মিশিয়ে থাকে বলে দাবি করে। এছাড়া বিভিন্ন কায়দায় আগডুম-বাগডুম (কখনো কোনো ভেষজ, কখনো হোমিও-প্যাথিক) মিশিয়ে ক্রেতা সাধারণের মন জয় করার চেষ্টা করে বিভিন্ন কোম্পানি। এদের বিশাল বিশাল ঝল্‌মলে পোস্টারে তো কলকাতার বড়ো বড়ো রাস্তাগুলি সুশোভিত এখন!

ধরা যাক এদের যে কোনো একটিকে—'বোরোপ্লাস'। এদের দাবিগুলি পরপর এভাবে সাজানো আছে—এক, চামড়াকে প্রখর সূর্যের তাপে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়; দুই, ছোটখাট পোড়া সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে; তিন, ছোটখাট কাটা-ছেঁড়া দ্রুত সারিয়ে তোলে; চার, দাড়ি কামানোর পর গালের চামড়ায় জীবাণুর সংক্রমণ না হতে সাহায্য করে; পাঁচ, শীত-কালে ঠোঁট ও চামড়া ফেটে যাওয়া বন্ধ করে এবং শুধু তাই নয়, ফেটে যাওয়া স্তনে প্রলেপ দেয়। যদিও দাবিগুলি একটি বিশেষ নামের মলমের, বাজারে ব্যবহৃত হাজার একটা এ-ধরনের মলমের মূল-সুরটি একই রকমের—বিশেষ কোনো হেরফের নেই। তাই কোনো একটিকে ধরেই আলোচনায় যাচ্ছি। এই বিশেষ নামটির আলাদাভাবে বিশেষ কোনো গুরুত্ব এখানে নেই।

যদিও এদেশে বোরিক অ্যাসিড জীবাণুনাশক হিসেবে বহুদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু কার্যত বোরিক অ্যাসিডের জীবাণুনাশক ক্ষমতা খুবই অল্প—আর যে অনুপাতে দেওয়া হয়, তার কার্যকর ক্ষমতা অধিকাংশ জীবাণুদের ওপর নেই বললেই চলে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বোরিক অ্যাসিডের ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে। অবশ্য উঠে যাওয়ার পেছনে আর যে বিশেষ কারণটি রয়েছে তা হলো এর ক্ষতিকারক ক্ষমতা। সাধারণভাবে বোরিক অ্যাসিড দেহের চামড়া দিয়ে শোষিত হয় না সত্য, তবে কাটা-ছেঁড়া বা পোড়া জায়গা দিয়ে এটা কিন্তু শরীরের ভেতর চলে যায়। আরও বিপদের ব্যাপার হলো, ল্যানোলিন শরীরে বোরিক অ্যাসিড শোষণে সাহায্য করে। এর ফলে পেটের গোলমাল, মাথাধরা, দুর্বলতা ইত্যাদি

উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া বোরিক অ্যাসিড শরীরে ঢুকলে তা লিভার (যকৃৎ) ও কিডনীর ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। তাই বাচ্চাদের কাটা-ছেঁড়াতে কখনোই এগুলি লাগানো উচিত নয়। জিংক অক্সাইডের ওষধিমূল্য না থাকলেও, বহুদিন ধরে ব্যবহার করলে এর ক্ষতিকারক প্রভাব শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পড়তে পারে। মূলত স্নায়ুতন্ত্র ও মাংসপেশীতে এর প্রভাব পড়ে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ঐগুলিতে যে-প্যারাফিন রয়েছে তার ব্যবহার ওষধি হিসাবে না হলেও শরীরের চামড়ার ওপরে এটি একটি প্রলেপ ফেলে যা বাইরের ময়লা বা জীবাণু প্রবেশের রাস্তা কিছুটা বন্ধ করে। কিন্তু সেখানেও লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। ময়লা-জীবাণু ইত্যাদি চটচটে মলমে আটকে গিয়ে ওখানে বাসা বাঁধতে পারে এবং কাটাছেঁড়া জায়গাকে দূষিত করতে পারে, কারণ অধিকাংশ জীবাণুর বৃদ্ধি ঠেকানো বোরিক অ্যাসিড বা জিংক অক্সাইডের ক্ষমতার বাইরে।

এবার 'বোরোপ্লাস' বা ওই ধরনের মলমগুলির দাবিগুলি যাচাই করা যাক।

সূর্যের কড়া-তাপ থেকে চামড়াকে রক্ষা করার ব্যাপারটা বিতর্কের বাইরে নয়। কড়া-তাপের ঝাঁঝটা পেট্রোলিয়াম জেলী কিছুটা আটকালেও আটকাতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি কাটাছেঁড়া থেকে সেরে ওঠা একটি শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। কোনো ওষুধের ঐ কাজ করার ক্ষমতাই নেই। একই কথা পোড়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দাড়ি কামানোর পর এগুলি লাগানোর যৌক্তিকতা হাস্যকর—তেমন কোনো জীবাণু প্রতিরোধী ক্ষমতা এগুলির নেই। শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে, সেহেতু শরীরের চামড়া থেকে জলীয় পদার্থ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ও চামড়া ফাটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সেখানে অবশ্যই পেট্রোলিয়াম জেলী এই বাষ্পীভবনকে রোধ করে, তাই এগুলি ঠোঁট বা চামড়া ফাটা বন্ধ করতে পারে। তবে এই কাজটা যে কোনো চর্বিজাতীয় পদার্থ দিয়ে খুব সহজে এবং সস্তায় করা যায়। বাজারে পেট্রোলিয়াম জেলী অনেক সস্তায় পাওয়া সম্ভব। ফাটা স্তনে এটা ব্যবহার করাটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং ক্ষতির সম্ভাবনাটাই বেশি—মা এবং শিশু দু-জনের ক্ষেত্রেই।

এতসব বোঝার পরও বোরোপ্লাসের ধুরন্ধর মালিকরা আরও অনেক কথা বলবেন। বলবেন—এতে রয়েছে এগুলি ছাড়াও অনেকগুলি 'প্লাস', যেমন

বারবেরিস অ্যাকুইফোলিয়াম (Berberis aquifolium) এবং ক্যালেনডুলা (Calendula)।

ইদানীং বাজারে একটা নতুন তত্ত্ব বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—তা হলো 'প্রকৃতিদত্ত সম্পদে প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এসে শরীরের যত্ন নিন।' কথাটা শুনতে বেশ জুতসই লাগে, সন্দেহ নেই। মানুষ আর প্রকৃতি তো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অতএব এর থেকে আর বেশি সঠিক পদ্ধতি কি-বা হতে পারে? সাধারণ মানুষের মনে কথাগুলি দোলা দেয় বেশি, বিশেষত আমাদের মতো দেশে, যেখানে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। কথাগুলি আজ য়ুরোপের ঘরে ঘরেও বেশ সমাদৃত হচ্ছে। আসলে এদেশে সম্প্রতি নতুন করে তা আমদানি হয়েছে, আর ভেষজ-এর প্রাচীন ঘরানার দেশে তা যে খুব তাড়াতাড়ি ঠাঁই করে নেবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই। না, কথাগুলিতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু প্রশ্ন হলো আধুনিক ওষুধগুলি কি প্রকৃতির বাইরের কোনো বস্তু? ভেষজের কোনো গুণ নেই—এমন কথাও বলছি না, কিন্তু কি আছে, কতখানি আছে এবং অন্তত কিভাবে আছে তার ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক সত্যতাটুকু যাচাই করার প্রয়োজন আছে বৈকি। সেগুলি সব এড়িয়ে গিয়ে স্রেফ 'ক্রেতা-সাধারণে'র মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন ওস্তাদ ব্যবসায়িরা। বোরোপ্লাসের আর এক চমক—'হোমিওপ্যাথিক অনুপান'। কি-না করতে পারে এই বোরোপ্লাসের বারবেরিস অ্যাকুইফোলিয়াম—মুখের ব্রণ থেকে শুরু করে চামড়ার পুষ্টি, ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ, এমনকি একজিমাও নাকি তা সারিয়ে তুলতে পারে! বিজ্ঞাপনের গরু আকাশেও উড়তে পারে দেখা যাচ্ছে। এর কোনো একটি ক্ষমতাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় নি। আর ক্যালেনডুলা তো কাটাছেঁড়া (বিশেষত যেগুলি সারতে দেরি হয়) থেকে শুরু করে খোলা ঘা সবই সারিয়ে দিতে পারে! চামড়ার কোনো ধরনের পুষ্টি বাইরের থেকে যোগান দেওয়া যায় না, আর কাটা-ছেঁড়া সেরে ওঠে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায়। কাটাছেঁড়া সেরে ওঠার জন্য মূলত প্রয়োজন জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটা এবং ঐ অংশটির বিশ্রাম।—শরীরের কিছু অংশে যেমন হাঁটু, কনুই বা গোড়ালীতে কাটা-ছেঁড়া হলে সারতে যে দেরি হয় তার কারণ ঐ অংশগুলি হাত পা নাড়াচাড়ার প্রক্রিয়ায় প্রায় সবসময়ই গতিময় থাকে, তাই বিশ্রাম পায় না। এছাড়া আরো কিছু শারীরবৃত্তীয় কারণে (যেমন রক্তে চিনি বেশি থাকা ইত্যাদি) কাটা-ছেঁড়া সারতে দেরি হতে

পারে—সেখানেও ক্যালেনডুলার কোনো ভূমিকা নেই।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—এসব তথ্য কি ঐসব প্রস্তুতকারক কোম্পানিদের অজানা? তারা কি জানেন না, বোরিক অ্যাসিডের বা ভেষজগুলির কার্যকারিতা বা অপকারিতার কথা? আসলে জানলেও তারা এটাই করবেন তার প্রধান কারণ মুনাফা। কোনো ক্রিমে একটু বোরিক অ্যাসিড মেশালে সেটা সরকারি খাতায় 'অ্যান্টিসেপ্‌টিকে'র শিরোপা পেয়ে যায়—এবং সেই সাদামাটা ক্রিমটি ড্রাগ লাইসেন্স-এর আওতায় চলে আসে। তার মানে হচ্ছে, প্রসাধন সামগ্রীর জন্য যে আবগারী শুল্ক (Excise duty) গুণতে হয় অন্যান্য ক্রিম প্রস্তুতকারকদের, তা বোরোলীন বা বোরোপ্লাস-এর ক্ষেত্রে খাটে না। এই সহজ প্রক্রিয়ায় তারা ৯০% আবগারী শুল্ক ছাড় পেয়ে যায়। ঠিক একইভাবে কিছু ভেষজ মিশিয়ে ক্রিমটিকে আয়ুর্বেদিক ড্রাগ লাইসেন্স এর আওতায় এনে একই পরিমাণ শুল্ক ছাড় পাওয়া যায়। যেখানে প্রসাধন প্রস্তুতকারকদের প্রায় ১০৫% শুল্ক গুণতে হয় সেখানে এগুলি প্রায় নামমাত্র শুল্ক দিয়ে সহজে ব্যবসা চালাতে পারে। এরপর বাকি যেটুকু দরকার তা হলো প্রচার। আর তার জন্য যে কী পরিমাণ টাকা খরচ করে, তার প্রকৃত হিসেব না পাওয়া গেলেও তথ্যাভিজ্ঞদের অনুমান, প্রায় মোট খরচের অর্ধেক খরচ এই খাতে হয়। যার ফলে বাজারের সিংহভাগ বোরোলীন-বোরোপ্লাস এর দখলে। ভিকো ল্যাবরেটারী একই কায়দায় ভেষজ ক্রিম, টুথ পেষ্ট ইত্যাদি বাজারে ছেড়ে বাজিমাৎ করে দিয়েছে; ১০ লাখ টাকায় ব্যবসা শুরু করে সাত বছরে তারা ৭ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে এই 'ভেষজ' মহিমায়।

আর এ-ধরনের মলমগুলিতে কি পরিমাণ লাভ থাকে তা ভাবলেও অবাক লাগবে। যেমন ধরুন বোরোলীন বা বোরোপ্লাসের একটা ২১ গ্রামের টিউবের দাম ৪·২৫ টাকা [কালো বাজারে ৬·০০ টাকা, ১৯৮৩ সালের মূল্য অনুযায়ী], আর এতে যা থাকে তার দামগুলি একটু যাচাই করে দেখুন।

২১ গ্রাম-এর মধ্যে ১% থাকে বোরিক অ্যাসিড অর্থাৎ ০·২ গ্রাম, যার দাম এক পয়সাও নয় (১ গ্রাম এর দাম ২ পয়সা)। ২০ গ্রাম পেট্রোলিয়াম জেলীর দাম হলো ২৬ পয়সা। আর যেটুকু জিংক অক্সাইড থাকে তারও দাম ২ পয়সার বেশি নয়। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ২৯ পয়সা। এবারে বাকি থাকে সামান্য ল্যানোলিন ও সুগন্ধের দাম। সব মিলিয়ে ধরা যাক খুব বেশি হলেও ৩২ পয়সা। এর পর অবশ্য মজুরি, প্যাকেজিং

ইত্যাদির খরচ রয়েছে। কিন্তু বাজারে এর দাম কতগুণ বেশি দিয়ে কিনতে হলো আপনারাই হিসেব করে দেখুন। অথচ শীতকালে গা-হাত-পা ফাটা বা ঠোঁট ফাটা খুব সহজেই বন্ধ করা যায় সস্তায় বাজার থেকে পেট্রোলিয়াম জেলী কিনে কিংবা গ্লিসারিন ব্যবহার করেও সমান ফল পাওয়া সম্ভব। বরং সেখানে ক্ষতিকারক পদার্থগুলি না থাকায় ভয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। গ্রামাঞ্চলে এগুলির অভাবে যে কোনো তেল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা তো বহুদিনের রেওয়াজ, নতুন করে তা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই।

সূত্র:

1. Text Book of Pharmacology ; W. C. Bowman, '80
2. R. Ghosh's Pharmacology—3rd Ed. ; '76
3. Drug Action Network Newsletter ; Oct '83

[এখানে ব্যবহৃত হিসেবপত্র ১৯৮৩র বাজার-দর অনুযায়ী করা হয়েছে।]

☐ স্মরজিৎ জানা

সাবান ডিটারজেণ্টের কিস্‌সা

আপনার প্রিয় চিত্রতারকার পছন্দসই সাবানটি কিনবার জন্য আপনি যে উদগ্রীব হয়ে থাকবেন এ-বিষয়ে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনার 'চামড়ার রঙ অধিকতর ফর্সা করতে' ও 'রূপসৌন্দর্য' ফুটিয়ে তুলতে নাকি ঐ বিশেষ সাবানটি অতুলনীয়।

সাবান বর্তমান সভ্যতায় এক অপরিহার্য সামগ্রী। চামড়ার ময়লা দূর করতে এর ব্যবহার হয়ে আসছে বেশ কিছুকাল ধরে। ইদানীং অবশ্য শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা ছাড়াও সাবান কোম্পানিরা হরেক-রকমের 'গুণাগুণ' লেপে দিচ্ছেন সাবানের গায়ে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানির বাজার দখল ও লাভের অঙ্কটা ফুলে উঠছে দিনকে-দিন। বাজারে আসছে হরেক-রকমের সাবান। কেউ বা মেশাচ্ছেন কোনো ভেষজ, কেউ কোনো জীবাণুনাশক সামগ্রী, কেউ বা গন্ধনাশক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে সব ধরনের সাবানে মূলত যে-বস্তুটি থাকে তা হলো কোনো ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ এবং এই অ্যাসিডটি সাধারণত স্টিয়ারিক অ্যাসিড হয়ে থাকে। সাধারণভাবে 'সোডিয়াম সল্ট অফ স্টিয়ারিক অ্যাসিড'-ই হলো সাবানের মূল রাসায়নিক। এটি তৈরি করা হয়ে থাকে মূলত পশুর চর্বি থেকে। অন্য কোনো ভেষজ তেল অপেক্ষা পশুর চর্বি (animal fat) সস্তা বলে প্রায় সব সাবান প্রস্তুতকারকেরা এটা ব্যবহার করে থাকেন। আর এই লবণটির পরিমাণ সমগ্র সাবানের অন্তত ৭৬ শতাংশ হওয়া চাই—এটাই সরকারি নির্দেশ। এর কম হলে তা 'নিম্নমানের' দায়ে অভিযুক্ত হবে।

শীতের দিনে আর এক বিশেষ ধরনের সাবান বহুল প্রচলিত, যাকে আমরা বলি গ্লিসারিন সাবান। সাধারণ সাবানগুলির থেকে এর তফাৎ একটুখানি। এ-সাবানগুলিতে থাকে গ্লিসারিন, যার ফলে এগুলি দেখতে হয় স্বচ্ছ। সাবান দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলবার পর চামড়ার খস্‌খসে ভাবটা

যাতে কম হয় তার জন্য এই গ্লিসারিনের ব্যবহার। তাছাড়া গ্লিসারিন জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সাহায্য করে, ফলে শীতের দিনে চামড়া ফাটার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই সব সাবানগুলিতে যদি এই গ্লিসারিন বা চর্বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ (অনেকে গ্লিসারিনের বদলে ল্যানোলিন ব্যবহার করেন) ২% এর বেশি হয় তাহলে সাবানের মূল উপযোগিতা অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষমতা, সেটাই ভীষণরকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এর থেকে কম পরিমাণ চর্বিজাতীয় পদার্থ সাবানে মিশিয়ে যেটুকু লাভ পাওয়া যায় সেটা কার্যত খুবই অল্প, যদিও এর জন্য আপনার গ্যাঁটের পয়সা খরচ হয় প্রায় দ্বিগুণ। একটা গ্লিসারিন সাবানে যেটুকু গ্লিসারিন মেশানো থাকে তার বাজার দর ৩০-৪০ পয়সার বেশি নয়। আর তাই সাধারণ যে কোনো একটি সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার করার পর আলাদাভাবে শরীরে গ্লিসারিন মাখাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

শরীরের ময়লা, ধুলোবালি ও জীবাণু ধুয়ে ফেলার কাজে সাবান একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী। বহু কোম্পানি কায়দা করে এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অজুহাতে কখনো 'নিম' কখনো বা 'চন্দন' ব্যবহার করে থাকেন। এগুলির জীবাণুনাশক ক্ষমতা অত্যন্ত কম, এমনকি সাধারণ সাবানের তুলনায়ও অল্প। এটুকু জীবাণুনাশক ক্ষমতা সাবানের নিজেরই রয়েছে। এগুলি স্রেফ ক্রেতাদের মন ভোলানোর চটকদারী বিজ্ঞাপন মাত্র। এতে সাবান কোম্পানিগুলির লাভের হিসেবটা বেশ রমরমা হয়, কারণ তখন আপনি একটু বেশি দাম দিয়ে এই সাবানগুলি কিনতে পিছপা হবেন না।

এর পর চলে আসে 'জীবাণুনাশক' হরেক-রকমের সাবানগুলির কথা। যেমন কার্বলিক সাবান, সালফার সাবান ইত্যাদি। এটা ঠিকই কার্বলিক অ্যাসিডের যথেষ্ট জীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু আপত্তির ব্যাপারটা হলো এখানেই যে, এটা যখন সাবানের সঙ্গে মেশানো হয় তখন এর জীবাণুনাশক ক্ষমতার বেশিরভাগটাই লোপাট হয়ে যায়। আর এই জীবাণুনাশক ক্ষমতাটা বজায় রাখতে গেলে যে-পরিমাণ কার্বলিক অ্যাসিড সাবানে মেশাতে হবে তাতে শরীরের চামড়াই পুড়ে যাবে, চামড়া পরিষ্কার করার আর দরকার হবে না। সালফার সাবানের এমনিতেই যথেষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই রোজ রোজ এগুলি ব্যবহারের নির্দেশ কখনোই দেওয়া যায় না। এছাড়া আরও একটি জীবাণুনাশক

দ্রব্য কিছুকাল আগেও ব্যবহৃত হতো, তা হলো মারকিউরিক আয়োডাইড। কিন্তু বহুকাল ধরে এর ব্যবহারের ফলে রক্তে এবং মস্তিষ্কের কোষে যে পরিমাণ বিষাক্ত 'মার্কারী' জমা হয় তার ফল ভীষণরকমের বিপজ্জনক হতে পারে। তবে রক্ষা যে, ইদানীং এর ব্যবহারের কথা কেউ জোরগলায় আর বলছেন না। আর একটি বহুল-প্রচারিত গন্ধনাশক, জীবাণুনাশক দ্রব্য, যা শুধু সাবানে নয়, বিভিন্ন ধরনের পাউডারে এমনকি 'ব্রণ'-এর ওষুধ বলে বিখ্যাত 'ক্লিয়ারসিল'-এও বড়ো বড়ো হরফে লেখা থাকতো তা হলো হেক্সাক্লোরফেন (HCP)। এই দ্রব্যটি লিভারে এবং মস্তিষ্কের কোষে ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে এবং এর ব্যবহার বন্ধ হলেও ক্ষতিসাধনের কাজটি বহুদিন ধরেই চলতে থাকে। এছাড়া আরো বহুধরনের জীবাণুনাশক দ্রব্য সাবানে ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। অনেক রাসায়নিকের ক্ষতিকর ক্ষমতা সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট জানা যায় নি। তাই এখন থেকেই বোধহয় এই সব জীবাণুনাশক সাবান-গুলির সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

এরপর হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলবেন, তবে কোন্ জীবানুনাশক সাবানটি আমরা ব্যবহার করব? সত্যি জীবাণুনাশক কোনো সাবান ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? এগুলির মাঝে-মধ্যে ব্যবহার কার্যত বিশেষ কোনো উপকারে লাগে না। আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এইসব জীবাণুনাশক সাবানগুলির ব্যবহার ভালোর থেকে খারাপটাই বেশি করবে, এটাই প্রমাণিত সত্য। আমাদের শরীরের চামড়ার রয়েছে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রয়েছে লক্ষ লক্ষ উপকারী জীবাণু—সারা শরীরের চামড়া জুড়ে এরা রয়েছে। এই ধরনের জীবাণুনাশক সাবানগুলি শুধু ক্ষতি-কারক নয়, উপকারী এই সমস্ত জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করবে। আর চামড়া হারিয়ে ফেলবে তার নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ক্রমশই উপকারী জীবাণুগুলির জায়গায় বাসা বাঁধবে আরো আরো শক্তিশালী সব ক্ষতিকর জীবাণু—যাদেরকে ঐ সাবানগুলিতে ব্যবহৃত জীবাণুনাশক দ্রব্যগুলিও আট-কাতে পারবে না একদিন। তাই সিদ্ধান্তটি একটু ভেবেচিন্তেই নেবেন।

প্রসঙ্গত ডিটারজেণ্ট সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নিই। কাপড়কাচা সাবানের জায়গাটা ক্রমশই আজ দখল করে নিচ্ছে 'সিনথেটিক সাবান' বা ডিটারজেণ্ট। চামড়ার ওপর এগুলির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার খবর আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে। ১৯৭৯ থেকে মার্চ ১৯৮২ এই তিনবছরে জাপানের

ছয়টি বড়ো হাসপাতালের সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে দেশে এই সব কৃত্রিম গুঁড়ো সাবান ব্যবহারের ফলে প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার লোক একজিমা ও নানান ধরনের চর্মরোগের শিকার হয়েছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় এক হাজার জন গৃহবধূর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, গুঁড়ো সাবানের দরুন তাদের হাতের চামড়ার স্বাভাবিক বর্ণ ও চামড়ার সুস্থতা নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সময়ই তা কিন্তু খালি চোখে ধরা পড়ে না—এর জন্য দরকার আলট্রাভায়োলেট (Ultra-violet) ল্যাম্প। যাদের হাতে সামান্য কাটা-ছেঁড়া রয়েছে তারা সাবধান। কারণ এইসব গুঁড়ো সাবান এগুলি সেরে উঠতে বাধা সৃষ্টি করে; তাছাড়া অ্যালার্জি বা ঘা বিষিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আমাদের দেশে যে-দ্রব্যটির ব্যবহার হয়, তা হলো অ্যালকিল বেনজিন সালফোনেট (ABS)। যে-প্রশ্নগুলি আজ বিভিন্নদেশে এই ধরনের রাসায়নিকগুলির বিরুদ্ধে উঠছে তাতে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ রয়েছে। এই রাসায়নিকটি পরিবেশে জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙে না (non biodegradable)—অপরিবর্তিত থাকে, তাই এটি আমাদের পরিবেশে ক্রমান্বয়েই জমতে থাকবে এবং এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক প্রভাব সমগ্র পরিবেশের ওপর পড়বে। ব্রিটেনে কোনো 'ডিটারজেণ্ট'কে বাজারে ছাড়পত্র পেতে হলে কোম্পানিটিকে দেখাতে হবে যে, সেটি অন্তত ৯০% বায়োডিগ্রেডেবল (biodegradable)। আমাদের দেশে এ-ধরনের কোনো আইন নেই। তাছাড়া এই ডিটারজেণ্টগুলিতে 'মূল রাসায়নিকটি' ছাড়াও, যে-সমস্ত রাসায়নিক মূল রাসায়নিকটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো বিভিন্ন ধরনের ফসফেট। এই ফসফেট জলের খরতা (hardness) দূর করে ও ময়লা পরিষ্কারে সাহায্য করে। এই ফসফেটের পরিমাণ (Sodium polyphosphate) এই ধরনের ডিটারজেণ্টগুলিতে প্রায় ৩০% থেকে ৩৫% থাকে। এই ফসফেট শেষ পর্যন্ত নদী বা লেকের জলে এসে মিশে জলের ছোট ছোট উদ্ভিদ যাকে অ্যাল্‌গি (Algee) বলে, সেগুলির প্রচণ্ডতম বৃদ্ধি ঘটায়। আর এই হঠাৎ বৃদ্ধির পরেই বেজে ওঠে অ্যাল্‌গিগুলির মৃত্যুর ঘণ্টা। এত বিশাল পরিমাণ অ্যাল্‌গি তার বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জল থেকে পেতে পারে না—কারণ জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। ফলে অ্যাল্‌গিগুলির অকালমৃত্যু ঘটে। অ্যাল্‌গির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জলজ প্রাণী প্রাণধারণের জন্য এই অ্যাল্‌গিদের ওপর নির্ভরশীল তাদেরও আয়ু শেষ হয়ে আসে,

ফলে সমগ্র পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। একটু আশ্চর্য শোনালেও কার্যত এই ব্যাপারটাই ঘটেছে আমেরিকার এরিক (Eric) আর উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের লাফ্ নেগ (Lough Neagh) লেকের জলে। তাই বিগত দু-দশক ধরে আমেরিকা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই ফসফেটের বদলে অন্য কিছু ডিটারজেণ্ট ব্যবহার করা যায় কি-না তা আবিষ্কারের। অথচ সাধারণ সোডা ফসফেটের কাজটি করে দিতে পারতো। কাপড় কাচার সাবান—ডিটারজেণ্টের থেকে খারাপ নয় কোনো অংশে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশের প্রয়োজনীয় সাবান তৈরি করার জন্য যে-পরিমাণ তেল বা চর্বির প্রয়োজন তা কি আমাদের দেশের পক্ষে মেটানো সম্ভব ? সেক্ষেত্রে বায়োডিগ্রেডেবল ডিটারজেণ্টের কথা হয়তো ভাবা যায় ? আর দামের কথা ? ডিটারজেণ্টে লাভের হার সাধারণ সাবান থেকে অনেকগুণ বেশি, যদিও শুরুতে এই সমস্ত ডিটারজেণ্টের দাম চলতি সাবানের থেকে সস্তা ছিল কিন্তু ইদানীং পেট্রোলিয়ামের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত ডিটারজেণ্টের দামও বেড়েছে ধাপে ধাপে। কারণ ডিটারজেণ্টের মূল রাসায়নিক উপাদানটি তৈরি হয় এই পেট্রোলিয়াম থেকেই। তাই, আবার ঘাড় ঘুরিয়ে সোডা-সাবানের ব্যবহারের কথা ভাবছেন অনেকেই।

সূত্র :

1. Foods Drugs & Cosmetics—Thakkamma Jacob
2. Goodman & Gilman's Pharmacological basis of Therapeutics ;
   (1980) 6th edition

☐ স্মরজিৎ জানা

চুল-চিন্তা

মানবদেহ, দেহের রোগ ও তার উপশম সম্বন্ধে নানা ধরনের যত বিচিত্র কাহিনী ও সংস্কার প্রচলিত আছে, চুল সম্বন্ধে গল্প বোধহয় তার চেয়ে কম নয়। এবং যত অদ্ভুতই হোক না কেন, প্রতিটি কাহিনীই কিছু কিছু লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাস করার কারণও আছে। মানবদেহে চুলের প্রধান ভূমিকা দৈহিক সৌন্দর্যের প্রয়োজনে। বলা বাহুল্য, নারীদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের আধার হিসেবে চুলের গুরুত্ব বিরাট। স্তন্যপায়ী জন্তুদের ক্ষেত্রে লোম শারীরিক প্রয়োজন মেটায়, শীতে শরীর গরম রাখে এবং সূর্যরশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে। মানবদেহে সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়াও লোমের আরও কিছু কাজ আছে। নাকের ভিতরের লোম কিছুটা ছাঁকনির কাজ করে, মাথার চুল সূর্যরশ্মি থেকে রক্ষা করে, চোখে পাতা ও ভ্রুর লোম সূর্য-রশ্মি ও ঘাম থেকে চোখকে রক্ষা করে এবং চুল একটি স্পর্শেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে।

লোমের গোড়া চামড়ার ভিতরে একটি লম্বা থলির মধ্যে থাকে—থলিটির নাম লোমকূপ। লোমকূপ চামড়ার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। লোমকূপের নিম্নপ্রান্তের নিচে অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় একগুচ্ছ কোষ আছে তাকে বলা হয় হেয়ার ম্যাট্রিক্স (Hair matrix) এবং ম্যাট্রিক্স-এর মধ্যে অন্য ধরনের কিছু কোষ থাকে যার নাম মেলানোসাইট(Melanocyte)।

কেশের জীবনধারায় তিনটি স্তর বা অবস্থা আছে। অ্যানাজেন (Anagen) বা বৃদ্ধির স্তর, ক্যাটাজেন (Catagen) বা পরিণতির স্তর ও টেলোজেন (Telogen) বা স্থিতাবস্থা। অ্যানাজেন কালে ম্যাট্রিক্স-এর কোষগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ট্রাইকো-কেরাটিন (Tricho-Keratin) নামক প্রোটিন তৈরি করে শক্ত হয়। দ্রুত বৃদ্ধির ফলে কোষগুলি লোমকূপের ভিতরে ঠেলে ওপরে উঠে যায় ও ক্রমাগত লম্বা হয়ে চামড়ার বাইরে চলে আসে। যতদিন অ্যানাজেন অবস্থা থাকে ততোদিন কেশ দৈর্ঘ্যে বড়ো হয়। মেলানোসাইট (Melanocyte) কোষগুলি মেলানিন (Melanin) নামক একরকম কালো রং-এর


নতুন চুল
লোমকূপ
পুরান চুল
হেয়ার ম্যাট্রিক্স
নতুন চুল
পুরান চুল
পূর্ণাঙ্গ নতুন চুল
হেয়ার ম্যাট্রিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ণাঙ্গ চুল
ছিন্নমূল চুল
আবার একটি নতুন চুলের জন্ম

প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ মেলানিন কেশের কোষের মধ্যে ঢুকে যায়। মেলানিন চামড়ার কোষেও আছে এবং আমাদের চুল ও চামড়ার কালো রং ঐ মেলানিন-এর জন্যই। ক্যাটাজেন স্তরে কোষবৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং কেশের তলদেশের কোষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হেয়ার ম্যাট্রিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মেলানিন-এর অভাবে কেশের শেষ প্রান্তটি সাদা বা বিবর্ণ দেখায়। টেলোজেন স্তরে কেশের কোষগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পরে আবার যখন অ্যানাজেন শুরু হয় তখন একই পদ্ধতিতে আর একটি চুলের জন্ম হয় এবং নতুন চুলটি পুরোনো চুলটিকে ঠেলে ওপরে উঠতে থাকে। ফলে পুরোনো চুলটি চামড়া থেকে খসে পড়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, একমাত্র অ্যানাজেন স্তরে লোমকূপের ভিতরে চুলের নিম্নপ্রান্তের কিছু কোষ জীবন্ত থাকে, ওপরের দিকে অন্য সব কোষই মৃত। ক্যাটাজেন ও টেলোজেন স্তরে চুলের সব কোষই মৃত। ম্যাট্রিক্স-এর নিচে রক্তবাহী নালি ও স্নায়ুতন্তু থাকে এবং ম্যাট্রিক্স-এর কোষগুলি রক্ত থেকে পুষ্টি আহরণ করে।

প্রতিটি চুলের জীবনধারার এই তিনটি স্তর একই সময়ে শুরু ও শেষ হয় না। তা যদি হতো তাহলে প্রতিটি চুল দৈর্ঘ্যে সমান হতো, একই হারে বৃদ্ধি পেতো এবং একই সময়ে শরীরের সব চুল একসঙ্গে খসে পড়ে যেতো। যেহেতু প্রতিটি চুলের বিভিন্ন-স্তরের পর্যায়কাল বিভিন্ন, তাই চুলের পরস্পরের দৈর্ঘ্যের অমিল থাকে এবং সারা বছর ধরেই নিয়মিতভাবে সামান্য কিছু চুল খসে পড়ে যায়। দেহের বিভিন্নস্থানের চুলের বৃদ্ধির হার ও দৈর্ঘ্যের অসঙ্গতির কারণ genetic বা বংশাণু নিয়ন্ত্রিত। বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে যেসব বিশেষ হরমোন নির্গত হয় সেগুলি যেমন যৌনাঙ্গ ও জননাঙ্গ বৃদ্ধির কাজ করে—তেমনি মাথা, বগল, বুক, যৌনাঙ্গ ও মুখের (গোঁফ-দাড়ি) চুলের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সোজা, পেঁচানো, কোঁকড়ানো, ঢেউ খেলানো ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতিও বংশাণু নিয়ন্ত্রিত।

মাথার চুলের অ্যানাজেন-এর সময়কাল ৩ থেকে ১০ বছর। অর্থাৎ একটি চুল ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ক্যাটাজেন ও টেলোজেন যথাক্রমে গড়ে ৩ সপ্তাহ ও ৩ মাস। সাধারণভাবে যৌবনকালে একজন সুস্থ মানুষের মাথায় গড়ে ৩ লক্ষ চুল থাকে এবং তার মধ্যে কমবেশি ৩০ হাজার চুল টেলোজেন স্তরে অবস্থান করে। বৃদ্ধির হার চুল প্রতি গড়ে

প্রতিদিন ০·৩৫ মিলিমিটার অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১০০ ফুট চুল বৃদ্ধি হয়।

চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রধানত দেহের স্বাস্থ্যের ওপর। দেহের পুষ্টি ও হরমোনগ্রন্থির কাজকর্ম ঠিক থাকলে চুলও ঠিক থাকে। দেহের কয়েকটি স্থানে পরিণত লোমের (Terminal hair) উপস্থিতি প্রাপ্তবয়স্কের লক্ষণ হিসেবে স্বীকৃত, যথা—পুরুষের ক্ষেত্রে মুখ, বগল, বুক ও যৌনাঙ্গ এবং নারীর ক্ষেত্রে বগল ও যৌনাঙ্গ। পুরুষ হরমোন অ্যাণ্ড্রোজেন (Androgen) এইসব স্থানের লোমবৃদ্ধির কারণ। কিন্তু মাথার চুলের ক্ষেত্রে অ্যাণ্ড্রোজেন উল্টো কাজ করে। অ্যাণ্ড্রোজেন বেশি হলে মাথার চুল পড়ে যায়—টাক পড়ে। নারীদেহে কিছু অ্যাণ্ড্রোজেন থাকার ফলে বগল ও যৌনাঙ্গে লোমবৃদ্ধি হয়। রজোনিবৃত্তির (Menopause) পরে নারী-হরমোনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়—ফলে অ্যাণ্ড্রোজেনের প্রভাব বেশি হয়ে পড়ে এবং সেজন্য বয়স্কা নারীদের মাথার চুল কমে যায় —টাক পড়ে এবং কারো কারো মুখের লোম বৃদ্ধি পায়। অপুষ্টিতে চুলের বৃদ্ধি আটকে যায়। কোনো ভারি রোগের সময় যে সাময়িক অপুষ্টি ঘটে সে সময়ও চুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয় বা কমে যায়।

নানা কাহিনী

চুল সম্বন্ধে, বিশেষত মাথার চুল সম্বন্ধে, যেসব প্রশ্ন নিয়ে প্রায় সকলেই নাড়াচাড়া করেন—ওপরের আলোচনা থেকে তার অনেক জবাব পাওয়া যাবে। একটি বিষয় নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, চুল শরীরের অভ্যন্তর থেকে গজিয়ে ওঠে এবং চুলের বৃদ্ধি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। একমাত্র আলো ও তাপ ছাড়া দেহের বাইরের কোনো কিছুই চুলের জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। অর্থাৎ দেহের বাইরে থেকে কোনো কিছু প্রয়োগ করে চুলের স্বাস্থ্যোন্নয়ন করা যায় না। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে—তেল, হেয়ার টনিক, হেয়ার ফারটিলাইজার, ওষুধ, ডিম, লেবু, তেঁতুল ইত্যাদি ইত্যাদি যে হাজার-রকম দ্রব্যগুণের গল্প বা চমকপ্রদ কাহিনী শোনা যায় সেগুলি শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়—অজ্ঞতাপ্রসূত বা ধাপ্পাবাজি। চুলের স্বাস্থ্যের ভিত্তি হচ্ছে হেয়ার ম্যাট্রিক্স-এর কোষগুলির স্বাস্থ্য এবং শরীরের কোনো অঙ্গের বা কোষগুচ্ছের স্বাস্থ্য নির্ভর করে শরীরের সার্বিক স্বাস্থ্যের ওপর। যাইহোক—কয়েকটি বিষয় এক এক করে আলোচনা করা যেতে পারে।

কাহিনী ১ ।। চুল কাটলে বা দাড়ি কামালে আরো ঘন হয়ে চুল-দাড়ি গজায় ।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ।। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র কারণ বহু পরীক্ষায় এর কোনো প্রমাণ মেলে নি ।

কাহিনী ২ ।। নিয়মিত চুলে তেল না লাগালে চুলের স্বাস্থ্যহানি হয় ।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ।। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । তবে তেল লাগালে চুলের চাকচিক্য বাড়ে । যাদের সেবোরিয়া (Seborrhoea—চর্ম থেকে স্বতনিঃসরিত তৈলাক্ত বস্তু সেবাম-এর আধিক্য) আছে তাদের ক্ষেত্রে ঘন ঘন তেল লাগানো ক্ষতিকর হতে পারে ।

আমরা সাধারণত নানা কেশ তৈল ও কেশ সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে যে সব কথা পড়ি তাতে চোখ কপালে উঠে যায় । হেয়ার ভাইটালাইজার, হেয়ার ফারটিলাইজার ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ নাম দেওয়া হয় । আমলা, জ্যাবোরাণ্ডি, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ক্যান্থারাইডিন ইত্যাদি নানা বস্তুর দ্রব্যগুণের কাহিনী ফলাও করে বলা হয় । একটি বিজ্ঞাপন পড়েছি যাতে 'মৃতদেহে চুল গজায়'—এই কথাটি ছাড়া আর সবরকম দাবি করা হয়েছে । 'প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়ায় তৈরি'—এই কথাটি ঐতিহ্যগত কারণে সহজেই আমাদের দেশের মানুষের মন কাড়ে । কিন্তু এইসব দাবি ও দ্রব্যগুণের কোনো বৈজ্ঞানিক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি নেই । অনেকটা মাদুলী বা চরণামৃতের মতো । কেশের স্বাস্থ্যহানি বা বিরল কেশের জন্য যিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন তিনি সহজেই এইসব বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হন । ভাবেন—'সবই তো করলাম, কিছুই হলো না । দেখাই যাক না এটা লাগিয়ে কিছু হয় কি-না ।' কয়েক লক্ষ লোক এইভাবে কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর ধরে 'দেখাই যাক না'-র পরীক্ষা করেন এবং বিজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্মী লাভ হয় । হতাশ ব্যক্তি তখন আর একটি বিজ্ঞাপনের দিকে তাকান এবং বলা বাহুল্য, আর একবার ভাবেন—'দেখাই যাক না' ।

কাহিনী ৩ ॥ ডিম দিয়ে মাথা ঘষলে চুলের পুষ্টিবৃদ্ধি হয় ।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ॥ ডিম ভক্ষণের প্রতি চুলের বিশেষ কোনো আগ্রহের প্রমাণ মেলে নি । এবং আগেই বলা হয়েছে চুলের কোনো রকম পুষ্টিবৃদ্ধি বাইরে থেকে করা সম্ভব নয় । চামড়ার ওপরে যে চুল থাকে তার কোষগুলি মৃত । চামড়ার ভিতরের অংশের নিম্নভাগ জীবিত (অ্যানাজেন কালে)

এবং পুষ্টি আসে তারও নিচে অবস্থিত রক্তবাহী নালি থেকে।

কাহিনী ৪ ॥ চুল খুব টেনে বাঁধলে এবং চুলের ডগা কেটে দিলে চুল বেশি বাড়ে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ॥ টেনে বাঁধার প্রক্রিয়াটি নিয়ে পরীক্ষা করে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ মেলে নি। ডগা কাটলে অধিকতর চুলবৃদ্ধির কোনো কারণই নেই। আমরা আগেই দেখেছি—বিভিন্ন ব্যক্তির বা একই ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন স্থানের চুলের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে প্রধানত বংশাণুপ্রভাবের ওপর। এছাড়া হরমোন এবং দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তাদের প্রভাব খাটায়। উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি বংশাণু, হরমোন ও পুষ্টির কোনো পরিবর্তন করে না। চুল আঁচড়ানোর সঙ্গে চুলের স্বাস্থ্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

কাহিনী ৫ ॥ সেলুনে দাড়ি কামালে দাড়ি কড়া হয়ে যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ॥ চুল দাড়ি কখনো আগের চেয়ে কড়া বা স্থূলতর হয় না। দৈর্ঘ্যের মতো এটাও বংশাণু ও পুষ্টি নিয়ন্ত্রিত। তবে নিয়মিত ঘর্ষণের ফলে চর্মের উপরিভাগের যে কোষস্তরের আস্তরণ থাকে তা স্থূলতর বা কড়া হতে পারে।

চুল পাকা

ম্যাট্রিক্স-এ মেলানোসাইট-এর সংখ্যা কমে গেলে বা তাদের মেলানিন তৈরি করার ক্ষমতা কমে গেলে বা নিঃশেষ হয়ে গেলে চুলের কোষে মেলানিন কমে যায় বা থাকে না। তখন চুল সাদা দেখায়। একেই পাকা চুল বলে। আসলে কিন্তু এতে 'পরিপক্বতা' বা পরিণত অবস্থা বোঝায় না। সাদা চুল ও কালো চুলে মেলানিন-এর অভাব ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। চুল পাকলে মাথা চুলকায় এটা নেহাতই গল্প। স্বভাবতই পাকা চুল টেনে তুলে ফেললে সেখানে পরে আবার পাকা চুলই গজায় এবং টেনে তুলে ফেললে আশেপাশের চুলে বা লোমকূপে কোনো পরিবর্তন বা ক্ষতি হয় না। যদিও সাধারণভাবে প্রবীণ বয়সে মেলানিন কমতে শুরু করে কিন্তু পাকা চুল প্রবীণতার লক্ষণ নয়। আগেই বলা হয়েছে, ম্যাট্রিক্স-এর কাজকর্ম বা জীবনধারা প্রধানত নির্ভর করে বংশাণু (genetic) চরিত্রের ওপর। চুলের ও মেলানোসাইট-এর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ বংশাণুর কার্যধারা বিভিন্ন জাতি বা মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভিন্ন, শুধু তাই নয়—বয়স, লিঙ্গভেদ এমনকি একই মানুষের দেহের বিভিন্নস্থানের লোমের এক এক রকমের চরিত্রগুণ থাকে।

বংশাণুজনিত কারণেই মাথার চুল (Terminal hair) লম্বা হয় কিন্তু হাত-পা-এর লোম ছোট (Vellus hair) হয়। একই কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন স্থানে চুল পাকে। বংশাণুপ্রভাবে যৌবনেই কারো কারো কোনো বিশেষ স্থানের মেলানিন কমে যায় এবং ফলে চুল পাকে। ইন্দিরা গান্ধীর মাথার সামনের একগুচ্ছ পাকা চুল প্রবীণতার আগেই পেকেছে এবং বিশেষ বংশাণুজনিত এরকম পাকাচুলের গুচ্ছ অনেকের মাথাতেই দেখা যায়। গল্প চালু আছে—কোনো এক রাজাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল, জীবনাশঙ্কায় তিনি সারারাত চিন্তায় ও আতঙ্কে কাটিয়েছিলেন এবং এক রাত্রে তার সব কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। এই গল্প কতটা সত্যি জানি না। কিন্তু এরকম ঘটার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে না। কোনো অজ্ঞাত রোগ বা বিষের প্রভাবে সমস্ত চুলের মেলানোসাইট নষ্ট হয়ে যাওয়ার হয়তো যুক্তি থাকতে পারে এবং তাতে নতুন চুলগুলি সাদা হতে পারে কিন্তু পুরোনো চুলের মেলানিন অদৃশ্য হবার কথা নয়। অন্যদিকে মাথার সমস্ত চুল সাদা করে দেওয়া যায় ব্লিচিং (Bleaching) করলে। একধরনের রাসায়নিক দ্রব্য—যাতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড (Hydrogen Peroxide) থাকে—কালো চুলে প্রয়োগ করলে মেলানিন জারিত হয়ে তার কালো রঙ হারিয়ে ফেলে, ফলে চুল ফ্যাকাসে ধরনের সাদা হয়ে যায়। অবশ্য বেশ কিছুদিন পরে ঐ চুল আবার স্বাভাবিক কালো রঙ ফিরে পায়। মেমসাহেবদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া খুব চালু। শ্বেতকায় মহিলাদের অনেকের স্বাভাবিক সাদা চুল আছে—ঠিক একেবারে দুধের মতো সাদা নয়, একটু সোনালী ধরনের (Blond hair)। এই রঙ-এর চুলে-র খুব কদর এবং যাদের চুল কালো তারা কৃত্রিম উপায়ে ব্লিচিং করে সোনালী চুলের অধিকারিণী হন—আমাদের মেয়েরা যেমন মুখে রং মেখে ফর্সা হবার চেষ্টা করেন। যাদের স্বাভাবিক সোনালী চুল তাদের চুলেও মেলানিন আছে এবং কালো চুলের মতো সমপরিমাণেই আছে কিন্তু সেই মেলানিন একটু ভিন্ন ধরনের, ফলে রঙটা ওরকম হয়। শ্বেতকায়দের অনেকের চুলের রঙ লাল—তাতেও অন্য এক ধরনের মেলানিন থাকে এবং সমপরিমাণেই থাকে।

'পাকা' চুল কালো করার কোনো প্রক্রিয়া বা ওষুধ আজ পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নি। 'পাকা' চুল কালো করার অসংখ্য ওষুধ একমাত্র ধাপ্পাবাজদের কাছেই পাওয়া যায়। যিনি প্রথম এই ধরনের ওষুধ

আবিষ্কার করতে পারবেন তিনি নিঃসন্দেহে অতি দ্রুত বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবেন। অবশ্য কোনো রোগে বা ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় যদি মেলানোসাইট-এর কাজ সাময়িকভাবে অবদমিত হয়ে থাকে তাহলে চুল সাদা বা ফ্যাকাশে হবে এবং ওষুধের প্রতিক্রিয়া কেটে গেলে বা রোগ সারলে নতুন চুল আবার কালো হবে।

মাথার খুষ্কি

প্রায় সকলেরই কিছু কিছু হয়, তবে যাদের সেবোরিয়া আছে বা যারা নিয়মিত তেল মাখেন তাদের বেশি হবার আশংকা থাকে। মাথার চামড়ার মৃত স্খলিত কোষ, ধুলোবালি, ময়লা, তেল, সেবাম ইত্যাদি সব মিলিয়ে খুষ্কি তৈরি হয়। লোমকূপের নালিমুখে ময়লা জমলে বা চামড়ায় খুষ্কি জমলে সেখানে রোগজীবাণু বাসা বাঁধার আশংকা থাকে—সুতরাং শ্যাম্পু বা সাবান ব্যবহার করে খুষ্কি পরিষ্কার করে নেওয়াই ভাল। এছাড়া, কিছু কিছু চর্মরোগ আছে যাতে মাথায় অধিক পরিমাণে খুষ্কি হয়—উপযুক্ত চিকিৎসায় এর উপশম হয়। স্নানের পর অনেকক্ষণ ধরে, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে, চুল ভেজা অবস্থায় রাখাটা ঠিক নয়। দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতার ফলে চামড়ার উপরের আবরণের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে রোগজীবাণু বাসা বাঁধতে পারে।

চুলের সেটিং (Setting)

চুলের স্বাভাবিক আকৃতি, গঠন বা প্যাটার্ণ পরিবর্তন করে পছন্দমতো আকৃতিতে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে সেটিং বলে। এবিষয়ে নানারকম পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। সাধারণত থায়োগ্লাইকোলিক অ্যাসিড (Thioglycolic acid) সংশ্লিষ্ট পদার্থ এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা চুলের ভিতরের প্রোটিন (Keratin)-এর রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। সাধারণত এতে চুলের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে বা বেশিক্ষণ ধরে লাগানো হয় তাহলে চুল নিষ্প্রভ হতে পারে, ভেঙে যেতে পারে, চুলের কোষগুলি ক্ষয়ে যেতে পারে। তাতেও অবশ্য আশঙ্কার কিছু নেই কারণ নতুন যে চুলটি গজাবে সেটি স্বাভাবিক হবে। কোঁকড়ানো চুল সোজা করার জন্য অনেকে ফরমালিন (Formalin) বা পারম্যাঙ্গানেট (Permanganate) ব্যবহার করেন কিন্তু এতে ক্ষতির

কিছুটা আশঙ্কা আছে। চুলকে টেনে নানারকম কায়দায় বেঁধে রেখে অনেকে সেটিং করেন। এতে কিন্তু লোমকূপের ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

কলপ

কলপ হিসেবে তিন রকম দ্রব্য ব্যবহার করা হয়—ভেষজ, খনিজ এবং সিন্থেটিক (Synthetic)। কলপে চুলের রাসায়নিক পরিবর্তন হলেও তেমন কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু সবরকম কলপেই কারো কারো চামড়ায় উগ্র অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াজনিত রোগ (Contact Dermatitis) হয়। কলপ ব্যবহার করলে কালো চুল পেকে যায় না।

মাথায় টাক

মাথায় চুল না থাকলে সেই স্থানকে আমরা টাক বলি। চুলবিহীনতাকে ডাক্তারী পরিভাষায় অ্যালোপেসিয়া (Alopecia) বলে—শুধু মাথায় নয়, দেহের যে কোনো স্থানে। অ্যালোপেসিয়া দু-রকমের হয়। যেখানে কোনো ক্ষত বা রোগের জন্য চামড়ার এত ক্ষতি হয় যে লোমকূপ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে আর চুল গজায় না ; এরকম অ্যালোপেসিয়া কখনো ভাল হয় না। আর একরকম—যেখানে কোনো কারণে চুল পড়ে যায় কিন্তু লোমকূপ ঠিক থাকে ; এখানে চুল আবার গজায়।

আগেই বলা হয়েছে, নতুন চুলের জন্ম হলে তা পুরোনো চুলকে ঠেলে বার করে দেয় এবং পুরনো চুল পড়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। প্রতিদিন চুল আঁচড়াবার সময় দেখা যায় কয়েকটি চুল পড়ে যায়। কিন্তু যারা এই তথ্যটি জানেন না তাদের কাছে চুল পড়ে যাওয়াটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে দৈনন্দিন ঘটনাটি খেয়াল করেন না। তারপর হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো যে একগুচ্ছ চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠে এলো! ব্যাস—তখুনি চিন্তা শুরু হয়। আমার চুল উঠে যাচ্ছে —আমার কি তাহলে টাক পড়ে যাবে? মেয়েরাই বেশি আতঙ্কিত হয়। আসলে এই চুল পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক। প্রশ্ন ওঠে—এই স্বাভাবিক চুল পড়ার সংখ্যাটি কত? আগেই আমরা জেনেছি যে কোনো এক সময়ে গড়ে ১০ হাজার চুল টেলোজেন স্তরে অবস্থান করে। টেলোজেন-এর সময়কাল কেটে গেলেই সেখানে অ্যানোজেন শুরু হবে এবং প্রতি লোম-কূপে নতুন চুল গজাবে। স্বাভাবিক কারণেই একদিনে ঐ ১০ হাজার

লোমকূপে টেলোজেন শেষ হয়ে অ্যানোজেন শুরু হয় না। প্রতিদিনই কিছু সংখ্যক লোমকূপে নতুন চুল গজানো শুরু হয় এবং কিছুদিন পরেই সেইসব লোমকূপ থেকে পুরোনো চুল পড়ে যায়। এই সংখ্যা কমবেশি হতেই পারে। যেদিন একটু বেশি সংখ্যায় চুল পড়ে, সেদিন নজর পড়লে অনেকে ভয় পান, অস্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, একদিনে ৫০টি চুল পড়ে গেলেও তা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে।

পুরুষের এক ধরনের টাক পড়ে যাতে কপালে দুই কোণ থেকে ধীরে ধীরে চুল উঠে যায়। এটা বংশাণু-নিয়ন্ত্রিত এবং অ্যাণ্ড্রোজেন-এর প্রভাবও এখানে কাজ করে। ঘর্ষণের ফলে নবজাত শিশুর মাথার চুল পড়ে টাক হতে পারে—এটা পরে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যায়। সন্তান প্রসবের পরে মেয়েদের মাথার চুল হঠাৎ অত্যাধিক পড়তে থাকে—এক্ষেত্রে কোনো একটি বা দু-টি স্থানে স্পষ্ট করে টাক পড়ে না কিন্তু সারা মাথার চুল হালকা, ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে যায়। হরমোনজনিত কারণে অ্যানাজেন-এ অবস্থিত বিরাট সংখ্যক চুল হঠাৎ টেলোজেন স্তরে চলে যায় এবং সেই চুলগুলি পড়ে যায়। ঠিক এরকম ঘটনা ঘটে টাইফয়েড ইত্যাদি ভারী রোগে কিম্বা ক্যান্সারের ওষুধ প্রয়োগের ফলে।

লোমকূপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে যে টাক পড়ে সেখানে চুল গজানোর কোনো ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। যেখানে লোমকূপ বা ম্যাট্রিক্স (Hair Matrix) নেই সেখানে চুল গজাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে সার্জারি এখন অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। এখন টেকো চামড়া কেটে বাদ দিয়ে সেখানে লোমকূপ ও ম্যাট্রিক্স সমৃদ্ধ স্বাভাবিক চামড়া সংস্থাপন (Graft) করে টাক মাথাকে সজীব চুলে ভর্তি মাথায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে —যদিও এই ধরনের অপারেশন উন্নত দেশেই হচ্ছে, আমাদের এখানে এখনো সম্ভব হয় নি। টাক ঢাকতে অনেকে পরচুলা পরেন—এতে মাথা বা অবশিষ্ট চুলের কোনো ক্ষতি হয় না।

চুলের নিজস্ব অনেক রোগ আছে। মাথার চামড়ার বহু রোগেও চুল আক্রান্ত হয়। বহু রোগের উপযুক্ত চিকিৎসাও আছে। সে আর এক কাহিনী।

□ সুজিত কুমার দাশ

তেল শ্যাম্পুর মাহাত্ম্য

'চুল যার শাওনের মেঘ'—তেমন চুলের জন্য কার না লোভ হয়। আর সেই রেশমী ঘন কালো চুল তৈরির জন্যই না বাজারে থরে থরে সাজানো রয়েছে হরেকরকমের তেল আর নামী-দামী শ্যাম্পু। শুধু কি তাই? চুল ওঠা ও চুল পাকা বন্ধ করতে, চুল ফাটা আটকাতে, চুলের ও মাথার আরো বিভিন্ন রোগে—খুস্কি থেকে শুরু করে মাথা গরম পর্যন্ত—সব কিছুতেই নাকি উপকার পাওয়া যায় এই বহু সমাদৃত তেল আর শ্যাম্পুতে।

এই 'চুলোচুলি'তে ঢোকার আগে আমরা চুল সম্বন্ধে দু-একটি কথা সেরে নিই। আমরা তো জানি যে চুল হলো মৃত কোষের সমষ্টি। একে বলা হয় কেরাটিন—এটা এক ধরনের প্রোটিন। এই চুলের গোড়াটা থাকে চামড়ার নিচে। তার পুষ্টি যোগায় রক্তবাহী নালিকা। শুধু তাই নয়, এই চুলের গোড়ার পাশেই থাকে এক ধরনের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine gland) যাদের বলা হয় সিবেসিয়াস গ্ল্যাণ্ড। এগুলি থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ যা চুলকে নরম ও চকচকে রাখতে সাহায্য করে। তাই সাধারণভাবে চুলের সজীবভাব বজায় রাখার দায়িত্ব শরীর নিজেই নিয়েছে। সুতরাং সঠিকভাবেই বলা যায় যে, চুলে বাড়তি কিছু তেল ঢেলে তাকে মোলায়েম রাখার ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বা চুলের জন্য এর সামান্য কিছু প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে। সাধারণভাবে স্ত্রী, পুরুষ সবার ক্ষেত্রে এটি সৌন্দর্য-চর্চার অঙ্গ হিসেবে কিভাবে এসে গেল তা আমাদের জানা নেই, তবে চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজনীয়তা আজও প্রমাণিত হয় নি। এরপরও তেলের যে বিভিন্ন গুণপনার বর্ণনা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে তার অভিনবত্বে বিস্মিত হতে হয়। তেলের মাধ্যমে চুলের গোড়ায় প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি পৌঁছে দেবার এমন অদ্ভুত দাবি তো প্রায়ই শোনা যায়। মানুষের মতো উন্নত জীবের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের কোষই খাদ্য-গ্রহণ, পরিপাক বা বর্জন করতে পারে না। আমাদের শরীরে খাদ্যগ্রহণের

জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কোষ রয়েছে, পরিপাকের জন্য আবার অন্য ধরনের কোষ আছে। চুলের কোষ খাদ্যগ্রহণ বা পুষ্টি-বর্ধনের কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ চুলের গোড়ায় প্রোটিন পৌঁছে দিলেই তা চুলের কোষ হজম করে নেবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আবার প্রোটিন কিংবা ভিটামিনের অভাবে চুল ওঠে—এমন কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। খুঁজে পাওয়া যায় নি চুলের রঙ পরিবর্তনের (পেকে যাওয়া ইত্যাদি) পেছনে কোনো শারীরবৃত্তীয় পুষ্টি বা কোনো রাসায়নিক পদার্থের অভাব বা আধিক্যের রহস্য (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া)। আর তেল বা শ্যাম্পুর মাধ্যমে চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছে দেবার এই দাবিগুলির কোনোটাই যুক্তিনির্ভর তো নয়ই, পরীক্ষাগারেও তা প্রমাণিত নয়। যদিও হাজার হাজার মানুষ এই ধারণাই পোষণ করেন; তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞাপনের দৌলতে—প্রায় গোয়েবলসীয় কায়দায়। লক্ষ লক্ষ ধরনের ভেষজ, হোমিওপ্যাথিক তেল, কী নেই বাজারে! তেল দিয়ে ম্যাসাজ করার জন্য (তা সে মাথা বা শরীর যাই হোক না কেন) চামড়ার রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়—স্বভাবতই চুলের গোড়াতেও রক্ত সঞ্চালন কিছুটা বেড়ে যায়, কিন্তু চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন (চুল ও চামড়ার) এমনিতেই যথেষ্ট, তাই ম্যাসাজ চামড়ার একটি ভালো ব্যায়াম হলেও কার্যত বিশেষ কোনো লাভ হয় না এতে।

চুলের তৈলাক্ত অবস্থার জন্য বাইরের ময়লা-ধুলো-বালি, এতে আটকে যায়, শহরাঞ্চলে তো কথাই নেই। তাই কয়েকদিন অন্তর মাথাটা ধুয়ে ফেলতে হবে এমন কিছু দিয়ে যা ভালোভাবে ময়লাটা তুলে ফেলতে পারবে। এই চিন্তা থেকেই এসেছে শ্যাম্পুর ব্যবহার। এখন দেখা যাক, শ্যাম্পুতে কী আছে। এতে থাকে জলের দ্রবণে প্রস্তুত কিছু পরিষ্কারক বা ডিটারজেণ্ট। এটি দু-রকমের হতে পারে—এক, সাধারণভাবে যাকে আমরা সাবান (Soft soap) বলি; অথবা দুই, কোনো সিনথেটিক পাউডার (যথেষ্ট সস্তা) যা সাধারণত কাপড় কাচায় ব্যবহৃত হয় (যেমন Surf, Det ইত্যাদি)। এছাড়াও থাকে চর্বিজাতীয় পদার্থ। কোনো শ্যাম্পুর ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষমতা তার ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে না (কতটা পাতলা বা ঘন)। কিছু লবণ যোগ করলেই পাতলাটা ঘন হয়ে যাবে। কতো পরিমাণ ফেনা তৈরি করছে তার ওপরও নির্ভর করে না। সিনথেটিক ডিটারজেণ্টের ফেনা তৈরি করার ক্ষমতা খুবই কম।

কিন্তু ক্রেতাদের এই ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝোঁক থাকার জন্য প্রায় সব কোম্পানিই ফেনা সৃষ্টির জন্য এক ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে। আরও যে-সব জিনিস থাকে শ্যাম্পুতে, যেগুলি বিজ্ঞাপনের প্রধান বক্তব্য হিসেবে দেখা দেয়, তা হলো চুল বা চামড়ার সজীবভাব বজায় রাখার জন্য (Skin and hair conditioning agent) কিছু পদার্থ—যেমন ডিম, প্রোটিন, লেবু ইত্যাদি। অনেকে আবার ভেষজ ব্যবহার করেন, ব্যবহৃত হয় জীবাণুনাশক সামগ্রী যেমন অ্যালানটয়েন (Allantoin), ট্রাই-ক্লোরোকার্বানিলাইড (Tri-choloro-carbanilide)—যা খুস্কি সারায় বলে দাবি করা হয়।

চর্বি জাতীয় পদার্থের মধ্যে দামী হলো ল্যানোলিন (Lanolin) যা ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয়, প্রায় সবাই এটি মেশায় বলে দাবি করে। এটি চুল ও চামড়ার সজীবভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ শ্যাম্পু ব্যবহার করার পর মাথার চামড়া থেকে যে অল্প পরিমাণ চর্বি চলে যায় তা ফিরিয়ে দিয়ে চুলে স্বাভাবিক তেলতেলে ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে বলে দাবি করা হয়। এই ব্যাপারটি বেশ মজার। ল্যানোলিনের এই ক্ষমতা রয়েছে ঠিকই কিন্তু শ্যাম্পুতে ২% এর বেশি তা মেশানো যায় না, কারণ তাহলে শ্যাম্পু বেশি পাতলা হয়ে যায়—ফলে ডিটারজেণ্টের ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষমতাও কমে যায়। অবশ্য বেশি ল্যানোলিন মেশানো গেলেও খুব একটা লাভ হতো না কারণ শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার সময় ময়লার সঙ্গে এটিও বেরিয়ে যায়, মাথায় লেগে থাকে না। শুধু ল্যানোলিন কেন, শ্যাম্পুতে মেশানো অন্যান্য চর্বিজাতীয় পদার্থগুলিও মাথা ধোবার সময় জলের সাথে বেরিয়ে যাবে। তাই শ্যাম্পুর সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে এই সমস্ত পদার্থগুলি থেকে বিশেষ লাভ পাওয়া সম্ভব নয়।

এবার 'এগ'-শ্যাম্পুর কথায় আসা যাক। এই শ্যাম্পুপ্রেমীরা শুনলে নিরাশ হবেন যে, অধিকাংশ 'এগ'-শ্যাম্পুতে ডিম আদৌ থাকে না। থাকলেও তা অতি অল্প মাত্রায়। অবশ্য বেশি মাত্রায় থাকলেও বিশেষ লাভ হতো না। এটা ঠিকই যে ডিমের হলুদ অংশ (মূলত চর্বিজাতীয় পদার্থ) চুলের তৈলাক্ত ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে যদি তা গরম জলে ফেটিয়ে লাগানো হয়। শ্যাম্পুর মাধ্যমে ব্যবহার করার ফলে সেই উপকার পাওয়া সম্ভব নয়, যে কারণে সম্ভব নয় ল্যানোলিনের বেলায়। আর

আগেই বলেছি. ডিমের প্রোটিন ওভাবে চুলের গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায় না। (এমনকি যদি প্রোটিনের আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকত।)

সিনথেটিক ডিটারজেন্ট দেওয়া শ্যাম্পুতে (সস্তার জন্য এটাই মূলত ব্যবহৃত হয়) লেবুর তেল বা লেবুর রস থাকে। এবং এটি ব্যবহার করার যৌক্তিকতাও খুব কম। লেবুর রস সাবানজলের পৃষ্ঠ-টান (Surface tension) বাড়িয়ে ময়লা পরিষ্কারে সামান্য সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু যথেষ্ট জল ও লেবু ছাড়া সাবান দিলেও ময়লা আপসেই মাথা ছেড়ে পালাবে। কোনো কোনো কোম্পানি শ্যাম্পুতে বহুধরনের ভেষজ ব্যবহার করেন, যাদের কার্যকারিতা আদৌ প্রমাণিত হয় নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, এগুলির কিছু ক্ষমতা আছে তবে তা শ্যাম্পুর সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য মাথায় ব্যবহার করে ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এইসব ভেষজ শক্তি-শালী রাসায়নিক পদার্থের (সাবান বা ডিটারজেন্ট) সঙ্গে ব্যবহার করার ফলে আদৌ কার্যকর থাকে কি-না যথেষ্ট সন্দেহজনক।

এছাড়া শ্যাম্পু ব্যবসায়িরা বিভিন্ন চুলের (শুকনো, তেলতেলে বা সাধারণ চুল) জন্য যে-বিভিন্ন ধরনের শ্যাম্পু বাজারে চালু করেছেন তা নেহাতই ধোঁকাবাজি। হালকা (mild) শ্যাম্পু বা 'রাতভর শ্যাম্পু' (all night) বলতে যা চালু—সেগুলিতেও কোনো বিশেষত্ব নেই—কোনোটাতে একটু বেশি ডিটারজেন্ট মেশানো থাকে কোনোটাতে একটু কম—তফাৎটা এইটুকু মাত্র। এবং এগুলো প্রায় সবই সিনথেটিক ডিটারজেন্ট দিয়ে তৈরি—যে ডিটারজেন্ট আমরা কাপড় কাচতে ব্যবহার করে থাকি।

তবে এই সব শ্যাম্পুগুলিতে 'সংরক্ষক' বা প্রিজারভেটিভ হিসেবে যে-সব রাসায়নিক মেশানো থাকে যেমন ফর্মালডিহাইড় বা BNPD (2-bromo—2 nitropropane – 1, 3 diol) তা 'চামড়ায় অ্যালার্জি' তৈরি করতে সক্ষম। তাছাড়া ইদানীং অনুমান করা হচ্ছে, ফর্মালডিহাইড চামড়ার ক্যানসার তৈরিতেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। দেখা গেছে, শ্যাম্পুগুলিতে নাইট্রোসায়ামিন (Nitrosamine) গ্রুপের কিছু রাসায়নি-কের উপস্থিতিও। এগুলি নিশ্চিতভাবে ক্যানসার সৃষ্টি-ধর্মী। এই নাইট্রোসায়ামিন তৈরি হয় BNPD ভেঙে যে নাইট্রেট তৈরি হয় তার সঙ্গে শ্যাম্পুতে থাকা ডাই এবং ট্রাই-থানোল্যামিনের (Trie-thanolamine) এর বিক্রিয়ায়। তাই শ্যাম্পুপ্রেমিকদেরও একটু সাবধান থাকার দরকার রয়েছে।

এবার খুস্কির কথায় আসা যাক। সাধারণভাবে বলতে গেলে এগুলি মরা (চামড়ার) কোষ। চামড়ার এই ওপরের কোষ মরে যাওয়া এবং নিচ থেকে নতুন কোষ তৈরি হওয়া একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি হারে ঘটে। সাধারণভাবে তাদের শরীরের চামড়া বেশি তৈলাক্তও থাকতে পারে। তাদের শরীরে সিবেসিয়াস গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরণও বেশি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের শরীরে ও মাথায় ময়লা জমার হারটাও বেশি, তাই তাদের প্রয়োজন দু-তিন দিনের ব্যবধানে মাথা পরিষ্কার করা। সাধারণভাবে খুস্কিতে জীবাণু থাকে না। যদি খুস্কি কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় (যা কদাচিৎই ঘটে) তখনই জীবাণুনাশক কোনো পদার্থের ব্যবহার করার প্রশ্ন আসে। তার আগে খুস্কিতে এই ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতাই থাকে না। কারণ জীবাণুনাশক ব্যবহার করে খুস্কি কমানো সম্ভব নয়। আর খুস্কি যদি জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় তখন শ্যাম্পু দিয়েও তা সারানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন।

তাই তেল বা শ্যাম্পু চুলের গোড়ায় ডিম, চর্বি, প্রোটিন, ভিটামিন কিছুই জোগান দিতে পারে না। চুল ওঠা, চুল পাকা, চুল ফাটা, খুস্কি, এ-সব কিছুই তেল শ্যাম্পু দিয়ে সারানো সম্ভব নয়। অবশ্যই মাথার ময়লা পরিষ্কার করার জন্য শ্যাম্পুর ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই—তবে তা আপনি অনেক সস্তায় সাবান দিয়েই করতে পারেন।

সূত্র :
1. Foods Drugs and Cosmetics ; Thakkamma Jacob
2. Utusan Konsumer ; Feb '87

☐ স্মরজিৎ জানা

টুথপেস্ট কি অপরিহার্য

'সুস্থ মাড়ি ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য' ; 'মজবুত ঝকমকে দাঁতের লাবণ্য বজায় রাখতে'; 'মাড়ির সুরক্ষায়' ইত্যাদি হরেক-রকমের চটকদার বিজ্ঞাপনের ভিড়ে আপনার প্রিয় টুথ পাউডার বা পেস্টটি বেছে নিতে বা যাচাই করতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন কি ? কেনার পর বা কিছুদিন ব্যবহারের পর হয়তো আফশোস করেন—না জানি এটা না কিনে ওটা কিনলে হয়তো অনেক ভালো হতো। কিংবা বাজারে নতুন নামের একটি পেস্ট আসা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়েন সেটি করায়ত্ত করতে—এতে হয়তো নতুন কোনো ভেষজ বা রাসায়নিক সামগ্রী রয়েছে যার ক্ষমতা প্রায় অসীম। কিন্তু হায় ! সেটাও কিছুদিন ব্যবহার করে দেখলেন আপনার মাড়ির স্বাস্থ্য আদৌ অটুট থাকছে না—ক্রমান্বয়ে মাড়ির রোগ হয়তো বেড়েই চলেছে। তাহলে ?

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। দাঁতের বা মাড়ির রোগে একবারও ভোগেন নি বা এখনো ভুগছেন না এমন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কতোজন ? সংখ্যাটি বলতে গেলে কোনো হিসেবের মধ্যেই আসবে না, এতো কম সেটি। এমনকি উন্নততম য়ুরোপের দেশগুলিতেও একই হাল। আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় শতকরা ৮০ জনই ভুগছেন কমবেশি কোনো মাড়ির রোগে—হিসেবটি খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। হরেক-রকমের পেস্ট পাউডার থাকতে এতো 'ক্ষমতাশালী' 'বহুগুণসম্পন্ন' পেস্ট পাউডারে বাজার ছেয়ে গেলেও কেন এমন অবস্থা ? বিভিন্ন কারণগুলি খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা সবাই একমতে পৌঁছেছেন—তাহলো, এর মূল কারণটি লুকিয়ে রয়েছে দাঁতের যত্ন না নেওয়া বা যথেষ্ট পরিমাণে পরিচর্যা না করার ভেতর। অর্থাৎ যথাসময়ে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দেওয়ায়। তাই দাঁতের মাড়ি ও পরবর্তীকালে যা দাঁতের নরম অংশে ছড়িয়ে পড়ে এমন রোগে (একসঙ্গে এদের বলে পেরিওডেণ্টাল রোগ) ভুগেছেন বা ভুগছেন কমবেশি প্রায় সকলেই। মুখের দুর্গন্ধ যথেষ্ট মাত্রায় না হলে সাধারণভাবে আমরা তার খুব একটা গুরুত্ব দিই না। যদিও রোগটা শুরু হয় বহু আগে

—মাড়ি ফোলা বা সামান্য রক্তপড়ার থেকেই।

সেই আদিম যুগে মানুষ যখন কাঁচা শাকসবজি, শক্ত কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতো তখন অবশ্য দাঁতের পরিচর্যার এতো প্রয়োজন ছিল না। শক্ত খাদ্য-দ্রব্যগুলিই একাধারে দাঁত পরিষ্কার করা তথা মাড়ির ম্যাসাজের কাজ করতো। কিন্তু এ-যুগে তো সেটা সম্ভব নয়, তাই একালে দাঁতের পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। মাড়ির রোগগুলি শুরু হয় দাঁতের ওপর গড়ে ওঠা জীবাণুদের কলোনি থেকে, ডাক্তারদের ভাষায় যাদের বলা হয় ডেণ্টাল প্লেক্ (Dental Plaque)। আর একে ঘষে-মেজে তুলে দেওয়াটাই হলো দন্ত পরিচর্যার মূল ব্যাপার। তারজন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বস্তুটি হলো 'ব্রাশ', ব্যাস! না—অবাক হবেন না, এটাই প্রথম ও প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে কি পেস্ট, পাউডার, এ সবের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই? এ-ব্যাপারে পরে আসছি। যে-ডেণ্টাল প্লেকের কথা বলছিলাম তা শুধু দাঁতের সামনে নয়, দাঁতের পিছনে, দুটো পাশাপাশি দাঁতের গায়েও তারা আস্তানা গাড়ে। তাই ব্রাশের দরকার—যা সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে বা ব্রাশিয়ে যাই বলুন দূর করে দেবে। আর এটা করতে গেলে দিনে ক-বার ব্রাশ করা উচিত? নিদেনপক্ষে দু-বার করলে ফলটা ভালো পাওয়া যায়। তিনবার করলে উপরি কোনো লাভ পাওয়া যায় না—অন্তত পরীক্ষায় তাই দেখা গেছে। তাই, স্রেফ দু-বার, আর হ্যাঁ এটা খাওয়া-দাওয়ার পর অবশ্যই করা চাই। তাতে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যের কণাগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায়। সেগুলিই আসলে Dental Plaque তৈরি করার মূল রসদ হিসেবে কাজ করে। এই ডেণ্টাল প্লেক্‌কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর ৭০ ভাগ হলো জীবাণু এবং বাকি ৩০ ভাগ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই প্লেক্ কেবল মাড়ির রোগই নয় কেরিজ বা দন্ত-ঘা-এর মূলেও রয়েছে। ডেণ্টাল প্লেক-এর জীবাণু খাদ্যকণাকে ভেঙ্গে তৈরি করে অ্যাসিড যা দাঁতের শক্ত অংশে ক্ষত সৃষ্টি করে। এই ক্ষত বাড়তে বাড়তে দাঁতে গর্ত তৈরি হয়; যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে কেরিজ। সাধারণ মানুষেরা একেই পোকা খাওয়া দাঁত বলে থাকে। রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে বহু তথাকথিত দাঁতের কবিরাজ ও হাতুড়ে চিকিৎসকরা ক্ষয়ে যাওয়া বা গর্ত হয়ে যাওয়া দাঁত থেকে পোকা বার করে ভেল্কি দেখিয়ে থাকেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের গর্তে কোনো পোকা থাকে না যা খালিচোখে দেখা সম্ভব। প্লেক্-এর জীবাণু একমাত্র

মাইক্রোস্কোপ-এর নিচেই দেখা যেতে পারে, দাঁতের গর্ত থেকে পোকা বার করাটা একটা লোক-ঠকানো খেলা মাত্র। এই সব ভণ্ডরা পোকা বার করার 'যাদু' দেখিয়ে হরেক নামের মাজন বা জড়িবুটির ওষুধ বিক্রি করে থাকে—সেগুলিও স্রেফ ধাপ্পাবাজি। এই প্লেক্ আবার দাঁতের গোড়ায় জমে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে শক্ত পাথরে পরিণত হতে পারে। এর ফলে দাঁতের মাড়িতেও প্রদাহ দেখা দিতে পারে। অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের পরামর্শে তখন স্কেলিং (পরিষ্কার করা) ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা দরকার। তাই দেখা যাচ্ছে, দাঁতের এইসব সাধারণ রোগগুলি যাতে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ভুগছে তার মূলে রয়েছে এই ডেণ্টাল প্লেক্। আমাদের দেশে তথা এশিয়ার অধিকাংশ দেশে মাড়ির রোগে (পেরিও-ডেণ্টাল) ভোগা রোগীদের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি। অন্য দিকে আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও য়ুরোপের দেশগুলিতে কেরিজের হার আমাদের দেশের তুলনায় বেশি। এইসব দেশে বয়স্কদের শতকরা প্রায় ১০০ জন এবং বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা দশজন কেরিজে ভুগছেন। অথচ স্রেফ একটু সচেতনতা ও দন্ত পরিচর্যার অভ্যেস এই অবস্থাটার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারতো। শুরুতেই বলেছি দন্ত পরিচর্যার মূল হাতিয়ার হলো ব্রাশ। অনেকেই মনে করেন ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ফাঁকা হয়ে যায়। ধারণাটি পুরোপুরি ভুল। ব্রাসের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়েও মাথা ভারী করার দরকার নেই। মোটামুটি নাইলনের রোঁয়ার উচ্চতা ½ ইঞ্চি ও ব্রাশের ১ ইঞ্চি অঞ্চল জুড়ে থাকলেই যথেষ্ট। নাইলনের সব রোমগুলির উচ্চতা সমান হলে ভাল হয়। আর কতোক্ষণ এবং কি ভঙ্গীমায় আপনি ব্রাশ করবেন ? এ ব্যাপারে বাজারে অবশ্য বহুধরনের উপদেশ চালু আছে, ওসবে আদৌ কান দেবেন না। ব্রাশ করার কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার কোনো মাহাত্ম্য নেই, পরিষ্কারটা ভালোভাবে করতে গেলে দাঁত ও মাড়ির সমস্ত অংশগুলি ব্রাশ করা হলো কি-না সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সময়েরও কোনো বাঁধাধরা হিসেব নেই। তবে প্রত্যেকবার দু-চার মিনিটই এ-সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এরপর দাঁত ও মাড়ির রোগগুলির জন্য বহুজনই বহুশত কারণ শোনাবে, দাঁতের গঠনবিন্যাসের দোষ, প্রোটিনের অভাব, ভিটামিনের অভাব, এমনি বহুকিছু কারণ দর্শাবে হয়তো অনেকে। জানবেন এসব অধিকাংশ কারণের আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। মূল ব্যাপাটা নির্ভর করছে মূলত

সঠিকভাবে দাঁতের যত্ন নেওয়া না নেওয়ার ওপর। দেখা গেছে, উচ্চবিত্তের লোকেরা কম ভোগেন তুলনায় নিম্নবিত্তদের থেকে। সেখানেও কারণটা খুঁটিয়ে দেখা গেছে, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, জীবনযাত্রার উচ্চমানের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের যত্ন নেওয়ার এই অভ্যেসটা খুব ছোটবেলা থেকেই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। তাই এই তফাৎটা। মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পর ভালোভাবে মুখ না পরিষ্কার করলে এর কণাগুলি ঐ জীবাণুদের কলোনি গড়তে খুব সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। বরং মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখাটা অভ্যেস করতে হবে। আসলে ঝামেলা পাকান তারাই, যারা সারাদিনে প্রায় সমস্তক্ষণই চকোলেট, ক্যাণ্ডি বা ঐ জাতীয় জিনিস চুষে বেড়ান (মূলত আমেরিকা ও য়ুরোপের কিছু জায়গায় এই অভ্যেসটা প্রচলিত)। ধূমপায়ীদের মুখের স্বাস্থ্য স্বভাবত খারাপ থাকে। সব থেকে খারাপ কাজ করেন তারা যারা তামাক খৈনি চেবান বা ঐ জাতীয় বস্তুতে দাঁত মাজেন।

এবার ফিরে আসি পেস্ট-পাউডারের কথায়। প্রথমে দেখা যাক, এগুলিতে কি আছে। এতে থাকে মূলত কিছু ঘষে পরিষ্কার করার দ্রব্য যাকে বলে Polishing agent আর থাকে কিছু রাসায়নিক পদার্থ (Detergent) যা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এছাড়া অবশ্য হাবিজাবি আরো অনেক কিছুই মেশানো থাকে বিভিন্ন পেস্ট-পাউডারে আর প্রচারের দৌলতে তাই-ই হয়ে ওঠে সেই কোম্পানিটির ব্যবসার প্রধান মূলধন। সেগুলির আলোচনায় পরে আসছি। সাধারণভাবে পেস্ট-পাউডার দাঁত পরিষ্কারে কিছু সাহায্য করে। অবশ্যই এটা গৌণ ব্যাপার, মুখ্য ব্যাপারটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে সেই ব্রাশ করার ভেতরই। কেউ যদি পেস্ট পাউডার ব্যতিরেকে ব্রাশ করতে পারেন তাহলেও কিন্তু মোদ্দা ফলটার বিশেষ কোনো হেরফের হবে না! তাই গ্রামাঞ্চলে যারা দাঁতনকাঠি ইত্যাদি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করেন—পরিষ্কারের কাজটা যদি সঠিকভাবে করে চলেন, তাহলেও কিন্তু দাঁতের ও মাড়ির সুস্থতা বজায় থাকবে। তা সে নিমের কাঠি বা শেওড়ার কাঠি যাই হোক না কেন। এখানে নিম কিংবা পেস্টে ব্যবহৃত কোনো ভেষজ বা রাসায়নিক দ্রব্যটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এরপর সেইসব 'চমকপ্রদ' বস্তুগুলির কথায় আসা যাক। প্রথমেই আসছি ক্লোরফিল-এর কথায়। ১৯৫১ সালে বস্তুটি বাজারে আসামাত্র এক অত্যাশ্চর্য জীবাণুনাশক উপাদান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে—মূলত বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে, যদিও পরবর্তীকালে এর

কার্যকারিতা আদৌ প্রমাণিত হয় নি।

এছাড়াও টুথপেস্টে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক (ফেনল জাতীয়) দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে যদিও এগুলির ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত নয়। কারণ আমাদের মুখের ভেতর ক্ষতিকর জীবাণু ছাড়াও রয়েছে বহু উপকারী জীবাণু (কয়েক-শ' কোটি) যেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া আরো একটি ব্যাপার হলো এই জীবাণুনাশক দ্রব্যগুলি অল্প সময়েই মুখের ভেতর লালা-থুতু ইত্যাদির সঙ্গে মিশে এতো লঘু হয়ে পড়ে যে, মূল বহিরাগত ক্ষতিকর জীবাণুদের বিরুদ্ধে এরা শেষ পর্যন্ত কতোটুকু কার্যকর হয়, তা-ও বিচারসাপেক্ষ ব্যাপার।

টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারের মাধ্যমে দাঁত বা মাড়ির কোনো রোগ সারানো যাবে—এমন ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত। মাড়ির কোনো ধরনের রোগ সারানোর ক্ষমতা কোনো পেস্ট পাউডারের নেই। এই ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে তা সারানো সম্ভবও নয়। তারজন্য সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

এটা ঠিকই ফ্লোরাইড দাঁতের ক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে। আর এই ফ্লোরাইড আমরা সংগ্রহ করি মূলত পানীয় জল ও অল্প কিছুটা খাদ্যদ্রব্য থেকে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ফ্লোরাইড হলো 'শাঁখের করাত'। অর্থাৎ প্রয়োজনের থেকে কম নিলে যেমন দন্তক্ষয়ের নিবারণ সম্ভব নয়, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিলে দাঁতের ক্ষতি করে প্রচণ্ড। শুধু দাঁতের নয়, পরিমাণ যদি আরো বেশি হয় তবে তাতে শরীরের হাড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। য়ুরোপ-আমেরিকার বহু জায়গায় জলে মিশে থাকা ফ্লোরাইডের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে, সে-দেশগুলিতে পানীয় জলে ফ্লোরাইড মেশানোর ব্যবস্থা রয়েছে। (ওদের দেশে প্রায় ৯০% মানুষ দাঁতের শক্ত অংশের ক্ষয়ের রোগে ভোগেন, আমাদের দেশে তা মাত্র ১৫%।) কিন্তু আমাদের দেশের ছবিটা ঠিক উল্টো, ভারতবর্ষে এখনো এমন কোনো জায়গা পাওয়া যায় নি, যেখানে জলে ফ্লোরিনের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

উপরন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমরা প্রচুর পরিমাণ জল খাই বলে এর অভাবটা প্রায় ঘটেই না। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, কেরল ইত্যাদি প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় জলে ফ্লোরিনের উপস্থিতি এতো বেশি যে, এসব অঞ্চলের লোকেদের শুধু দাঁতের ক্ষয় নয়, হাড়ের ক্ষতিও ঘটছে ব্যাপক হারে। অথর্ব হয়ে পড়ছেন অনেকে। তাই আমাদের দেশে উল্টে পানীয় জলের থেকে ফ্লোরিনের পরিমাণ কমানোর জন্য গবেষণার মাধ্যমে এক

উল্লেখযোগ্য ও কম ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। একে বলা হয় 'নালগোণ্ডা পদ্ধতি' (Nalgonda technique) এবং এই পদ্ধতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে টুথপেস্টে আলাদা-ভাবে আরো কিছু ফ্লোরিন নেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (জল ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষত চায়ের পাতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফ্লোরিন থাকে।) শুধু দাঁত বা হাড়ের ক্ষতিই নয় অতিরিক্ত ফ্লোরাইড গ্রহণের ফলে শুরুতে পিপাসা ও ঘামের পরিমাণ বেড়ে যায়, মাংসপেশী দুর্বল হতে পারে, তাছাড়া শ্বাসতন্ত্র ও হৃদপিণ্ডের ওপরও ফ্লোরাইডের প্রভাব রয়েছে। তবে বাঁচোয়া এই যে, টুথপেস্টের ফ্লোরিন দাঁতের এনামেল দিয়ে খুব অল্প পরিমাণ শোষিত হয়। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিপদটা থেকেই যায়। তারা দাঁত মাজার সময় কিছুটা পরিমাণ পেস্ট খেয়ে ফেলে বা

টুথপেস্ট দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে

ঝকঝকে দাঁতের জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করা কি নিরাপদ ? এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য 'ন্যাশনাল সারভে অফ কণ্টাক্ট ডারমাটাইটিস ইন ইণ্ডিয়া'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার পাঁচজনের একটি বিশেষজ্ঞ দল গত ১৯৮১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে এই বিষয়ে গবেষণা চালান।

ওই বিশেষজ্ঞদের মতে টুথপেস্ট ব্যবহার করা সব সময় নিরাপদ নয়। টুথপেস্টের 'ডিফোমিং এজেণ্ট' (ফেনা কমিয়ে দেয় এমন পদার্থ) ঠোঁটের চারপাশে চর্মরোগ এমনকি কখনো কখনো শ্বেতী বা ধবলের কারণ হতে পারে। গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকেরা এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেন যা চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে, এ ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের কথা জানতে পারা গেছে তার মধ্যে আছে কীটনাশক, সাবান, কৃত্রিম কাপড়, জুতো, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি।

সূত্র : স্টেটসম্যান ; ২৬. ৩. ৮৬

তাদের পেটে চলে যায়। অনেক বাচ্চা তো মিষ্টি স্বাদের জন্য ইচ্ছে করেই কিছুটা খেয়ে ফেলে। এই অতিরিক্ত ফ্লোরিন গ্রহণের ফলে বাচ্চাদের কিডনী (বৃক্ক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এখানে আরো একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন, অতিরিক্ত ফ্লোরিন গ্রহণের ফলে দাঁতের যে ফ্লুরোসিস হয় তার সঙ্গে দন্তক্ষয় বা কেরিজের বহু মিল রয়েছে। কারণ ফ্লুরোসিস-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্বে দাঁতের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা সাদা চকের রং ধারণ করে, এর পর সাদা আবরণীটি হলুদ অথবা বাদামী বা কালো হয়ে যায়। এরপর দাঁতের এনামেল খসে যায় এবং ঐ জায়গাটা খাঁজকাটা হয়ে যায়, যাকে অনেকেই কেরিজ বলে ভুল করতে পারে। ফ্লুরোসিস অনেক বেশি মারাত্মক রোগ এবং এরজন্য দীর্ঘ-মেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই অকারণ ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ব্যবহার করে সেই সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলার কোনো অর্থই নেই। কার্যত আমাদের মতো দেশে এই ধরনের টুথপেস্ট-এর বিক্রির ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত। কেনিয়ায় এই ধরনের টুথপেস্ট-এর বিজ্ঞাপনের ওপর কড়া নিষেধবিধি বলবৎ রয়েছে।

দাঁতের ও মাড়ির সুস্থতা দন্ত-পরিচর্যার ওপর নির্ভরশীল। তাই ব্রাশ দিয়ে বাচ্চাদের দাঁত পরিষ্কার করাটায় অভ্যস্ত করে তুলুন। দাঁতের রোগে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। অবহেলা করে বা প্রচারের ভাঁওতায় ভুললে মাশুল গুনতে হবে আপনাকেই।

সূত্র:
1. WHO, TRS; No. 621
2. গণস্বাস্থ্য; ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

☐ স্মরজিৎ জানা

রঙিন বিপদ

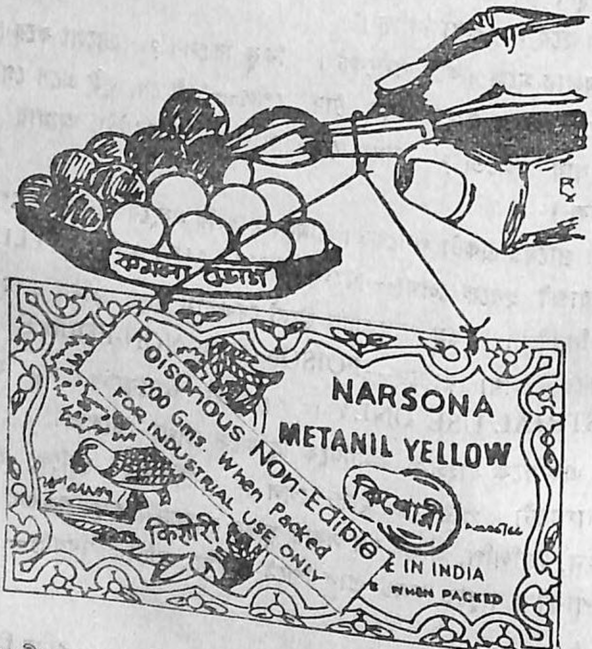
সকালে চায়ের আশায় ডাইনিং হলের দরজায় পেঁছতেই বুঝলাম বাইরে আজ যতোটা ঠাণ্ডা, খাবার ঘরের ভেতরটা ততোটা নয়। বাইরে দাঁড়িয়েই বেশ আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে দরজা ঠেলে ঢুকতেই বাধা পেলাম, সামনে এক বড়ো জটলা। হোস্টেলের যে-সব বাসিন্দা আজ আটটার বদলে সাতটায় উঠে পড়েছে, তারাই জয়ন্ত আর মেস-ম্যানেজার মানিকদাকে ঘিরে ধরেছে। জয়ন্তর হাতে একটা প্যাকেট, তখনও উঁচু করে ধরা। এইমাত্র একপ্রস্থ লেকচার শেষ করে এখন দম নিচ্ছে। এই থম্‌মারা পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানিকদা তখন একটা রেকর্ডই চালিয়ে যাচ্ছে—'জয়ন্তবাবু ওটা নোটিশ বোর্ডে টাঙাবেন না। বিশ্বাস করুন, এর আগে এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। ভবিষ্যতে এমন আর হবে না, কথা দিচ্ছি।'

ঝামেলার মূলে একটা প্যাকেট। কিন্তু কিসের? ভালো করে দেখতে কাছে যেতেই জয়ন্ত হাতে যেন চাঁদ পেল—'এই যে, তুই এসে গেছিস। কি করা যায় বলতো?' সমাধানের আশায় প্যাকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

দুশো গ্রামের একটা প্যাকেট। সামনে বাহারি ময়ূরের ছবির পাশে বড়ো বড়ো ইংরাজী হরফে লেখা—NARSONA, METANIL YELLOW, নেহাতই নিরীহ। কিন্তু প্যাকেটটা উল্টে দেখলাম হলুদ জমির ওপর গোটা গোটা করে লেখা রয়েছে—POISONOUS NON-EDIBLE, FOR INDUSTRIAL USE ONLY। চৌকো প্যাকেটের সরু ফালির দিকটায়, একদিকে বাংলায় অন্যদিকে হিন্দিতে লেখা 'কিশোরী'। এতোক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টিফিনের বোঁদে, দরবেশ, ক্ষীরমোহন, জিলিপি, আলুর দম সবার সুন্দর লোভনীয় হলুদ রঙ-এর বাহার ওই 'কিশোরী'র যাদুতে অথচ তার পিঠে তকমা আঁটা—'বিষাক্ত—খাবার জন্য নয়'।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি পরিস্থিতির হাল ধরলাম—'এটা আজ প্রমাণ হলো যে মানিকদা নিজের লাভের জন্য এতদিন আমাদের বিষ খাইয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা বোর্ডারদের জানিয়ে নোটিশ বোর্ডে একটা পোস্টার দেওয়া হোক, সঙ্গে পিন দিয়ে প্যাকেটটা লাগিয়ে দিলে ভালো হয়। এখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা আর মানিকদাকে রাখবো কি-না।—ব্যাস।'

'না, ব্যাস্ নয়'—জয়ন্ত অসন্তুষ্ট মুখে বলে উঠলো, 'ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। মানিকদা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে তার বাবা-কাকারা জিলিপি বা বোঁদের মণ্ডতে ওই "কিশোরী" বা "গাই মার্কা" হলুদ রং মেশায়। ফুরিয়ে গেলেই ছুটে গিয়ে দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে আবার কিনে আনে। কোনোদিন দেখতে যায় নি প্যাকেটের গায়ে কি লেখা আছে। আজ সকালের এই চেঁচামেচির পর, ও জানতে পারলো যে ওটা বিষ। আর শুধু মানিক-দাকেই বা দোষ দিই কেন, এই আমরা এতোগুলি মেডিকেল স্টুডেন্ট বসে আছি, আমরাই কি ছাই জানি খাবারে কি কি রঙ দেওয়া যায়? কোন্‌গুলি দেওয়া মানেই বিষ দেওয়া? কেনই বা এগুলি বিষ? এগুলি খেলে কি



কি বিষক্রিয়া হতে পারে ? না, আমার মনে হয় মানিকদাকে এবারের মতো মাপ করা যেতে পারে। তবে আজ থেকে হোস্টেলের খাবারে রঙ দেওয়া বন্ধ।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে জয়ন্ত থামলো।

ও থামলো বটে, কিন্তু আমার মাথায় তখন ভাবনাগুলো জড়ো হতে শুরু করেছে। সত্যিই তো, আমরা অনেকেই জানি না যে, সেই ১৯৫৪ সালেই পার্লামেন্টে PFA আইন (Prevention of Food Adulteration Act) পাশ হয়েছে। তাতে খাবারে দেওয়া যাবে বলে কেবল তেরোটা রঙ-কে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই আইন সংশোধনের সময় ক্ষতিকারক এই অজুহাতে পাঁচটা রং তালিকা থেকে বাদ পড়ে। পরে বাকি আটটার সঙ্গে আরও তিনটে যোগ করে এখন তালিকায় এগারোটা রঙ দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃতিজাত (Natural) রং যেমন হলদি, জাফরান (Saffron), ক্লোরোফিল (Chlorophyll) ইত্যাদির সঙ্গে মাত্র যে এগারোটা আলকাতরা-জাত (Coal Tar জাত) রং এখন PFA আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় তা হলো—

	রঙের নাম	রঙ
১.	Brilliant Blue FCF	নীল
২.	Indigo Carmine	”
৩.	Fast Green FCF	সবুজ
৪.	Wool Green BS	”
৫.	Tartrazine	হলুদ
৬.	Sunset Yellow	কমলা
৭.	Amaranth	লাল
৮.	Carmoisine	”
৯.	Erythrosine	”
১০.	Fast Red E	”
১১.	Ponceau 4R	”

এই রঙগুলি নির্ভেজালভাবে বাজারে আসছে কি-না, সেটাই নজর রাখে ISI (Indin Standard Institute)। ISI ছাপ ছাড়া যদি এইসব রঙ

বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা হয় তবে তা আইনত দণ্ডনীয়। জরিমানা জেল এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে [Food Adultertion (Amendment) Act, April, 1976]। যে এগারোটা রঙ খাবারে দেবার অনুমতি আছে তাও আবার খাদ্যদ্রব্যের কিলোপ্রতি একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি মেশানো যায় না।

খাবারের রঙ-এর সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা
(মিগ্রা প্রতি কিগ্রা খাদ্যদ্রব্যে)

১. Amaranth—০.৭৫	২. Sunset Yellow—২.৫
৩. Fast Green FCF—১২.৫	৪. Ponceau 4R—১২.৫

আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যদ্রব্যে জেনে-না-জেনে নানা ক্ষতিকারক রাসায়নিক রঙ মেশানো হচ্ছে। Toxicological Research Centre, Lucknow ১২,৫৭৫টি খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করে ৮,৮২০টার মধ্যেই ক্ষতিকারক 'অখাদ্য' রঙ খুঁজে পেয়েছেন। তার মানে ওখানকার ৭০ শতাংশ খাবারই কম-বেশি বিষাক্ত।

ব্যবসায়িকভাবে যে রঙটা সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় তা হলো Metanil Yellow। এই রঙ পাওয়া যায় আলকাতরা (Coal Tar) থেকে। এর এতো বেশি ব্যবহারের কারণ এটা গুলে যায় সহজে, সস্তা এবং সহজেই পাওয়া যায়। গুদামের বহু পুরোনো মুগ বা ছোলার ডালকে তাজা দেখাতে, গুড়ো বা আস্ত হলুদকে লোভনীয় করে তুলতে এর জুড়ি নেই। বেসন, গুঁড়ো মসলা, জিলিপি, বোঁদে, মিহিদানা, মাখন, ঘি ইত্যাদিতে এর ব্যবহার এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্ণৌতেই পশুদের ওপর Metanil Yellow-র প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে অণ্ডকোষে এর ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। অণ্ডকোষের একটা অংশকে (Seminiferous Tubules) এই যৌগটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং শুক্রকীট তৈরি কমিয়ে দেয়। এর ফলে পুরুষ বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

Metanil Yellow ছাড়াও আরও যে সব মারাত্মক রঙ রোজ ব্যবহার করা হচ্ছে তা হলো—Rhodamine B, Blue VRS, Auramine, Orange I এবং II, Sudan II এবং III, Congo Red, Malachite Green, Citrus Red II, Lead Chromate, Iron Oxide এবং Copper Sulphate (তুঁতে)।

Lead Chromate গুঁড়ো মশলাতে এবং আস্ত হলদি পালিশ করতে ব্যবহার করা হয়। Lead (সীসা) এমনিতেই বিষাক্ত, Chromate যোগ হয়ে তা আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। দুঃখের কথা এই যে, দিল্লীর এক সুপার বাজারে দেখা গেল আস্ত হলুদ এই রঙ দিয়ে পালিশ না করলে গৃহিনীরা সেই হলুদ কিনতে চান না। নয়ন মনোহর উজ্জ্বল বর্ণের হলুদের দিকেই তাদের টান। তারা যদি জানতেন যে Lead Chromate গর্ভপাত, রক্তাল্পতা (Anaemia), মস্তিষ্কের ক্ষতি ও পক্ষাঘাতের অগ্রদূত, তবে বোধহয় রঙ করা আস্ত হলুদের চাহিদা বাজারে এতো বাড়িয়ে তুলতেন না। ক্রেতা-সাধারণের এই ধরনের মানসিকতাই কিন্তু উৎপাদককে জিনিসপত্রে রঙ মেশাতে অনেকখানি উৎসাহিত করে।

আমাদের রোজকার অনেক মুখরোচক সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে আমরা নীলকণ্ঠের মতো গিলে ফেলছি এই রঙ-বেরঙ-এর বিষ। আর এর ফলে আমরা হজমের গণ্ডগোল, রক্তাল্পতার (Anaemia) শিকার হচ্ছি। আস্তে আস্তে এইসব রাসায়নিকগুলি জখম করে দিচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক, বৃক্ক (Kidney), প্লীহা (Spleen) এবং যকৃতের (Liver) মতো গুরুত্বপূর্ণ অংগগুলিকে (Organs)। টিউমার, ক্যান্সার, পক্ষাঘাতের উৎসের তালিকায় এগুলি স্থান পাচ্ছে। গর্ভস্থ ভ্রূণও রেহাই পাচ্ছে না। চোখ, চামড়া, হাড়ের দোষ নিয়ে জন্মাচ্ছে আগামী দিনের নাগরিকরা।

তাহলে ?—কী করবো ? করা যায় অনেক কিছুই। যেমন—

১. ভেজাল রঙ-এর ক্ষতিকারক বিষক্রিয়া সম্বন্ধে ক্রেতাদের শিক্ষিত করে তোলা।
২. সেইসব রঙিন খাবারই কেনা যাতে ISI ছাপ মারা আছে।
৩. যারা রঙিন খাবার বিক্রি করেন তাদের বোঝানো যে, যখন নিতান্ত দরকার পড়ে তখনই যেন তারা রঙ মেশান এবং তাও যতোটুকু না দিলেই নয়।
৪. বিক্রেতাদের এটা বোঝানো যে, সস্তা রঙ মিশিয়ে মোটেই কিছু লাভ হয় না, কারণ খাবার রঙিন করতে খুব অল্পই রঙ দরকার হয়। সে ক্ষেত্রে তালিকা অন্তর্ভুক্ত রঙ দিলে খুব বেশি খরচ হয় না।
৫. যেখানে খাবারে ভেজাল রঙ খুঁজে পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে যাতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য সক্রিয় হওয়া উচিত।

PFA তালিকায় যে এগারোটা রঙ রয়েছে, তারাই কি নিরাপদ ? অনুমোদিত রঙ এর ব্যবহার আমাদের দেশে এমনিতেই খুব কম। ১৯৬০ থেকে '৭০ সাল এই দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষ্ণৌ Industrial Toxicological Research Centre উত্তর প্রদেশে সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা গেছে —তালিকায় আছে এমন মোটে তিনটে রঙ এই এলাকায় ব্যবহার হয় —Tartrazine, Sunset Yellow এবং Carmoisine। অন্যান্য রঙ যা ব্যবহার হয় সবই তালিকার বাইরে।

অনুমোদিত রঙ যে-সব জিনিসে বেশি ব্যবহার করা হয় তা হলো— ওষুধ, ঠাণ্ডা পানীয়, জেলি, মাখন, লিপস্টিক, আচার, আইসক্রিম ইত্যাদিতে। আমাদের শরীরে এদের প্রভাব উপেক্ষা করার মতো নয়। এদের ক্ষতি-কারক প্রভাব সম্বন্ধে যা জানা গেছে তার তালিকা না বাড়িয়ে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এরা ক্যান্সারের অগ্রদূত। মৃত-সন্তান বা বিকলাঙ্গ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার পেছনে এদের অশুভ প্রভাব যথেষ্ট। বাড়ন্ত শিশু ও প্রসূতি এদের এড়িয়ে চললেই ভালো করবেন।

● খাবারে ভেজাল রঙ আপনিও ধরতে পারবেন

খাদ্য	ভেজাল রঙ	যেভাবে ভেজাল ধরবেন
☐ হলুদ (আস্ত/গুঁড়ো)	মেটানিল ইয়েলো	অল্প হলুদ কিছুটা জলে ঝাঁকিয়ে নিন। হলুদ গোলা জলটা এবার পাতলা করে নিন যাতে হলুদ রঙটা আর বোঝা না যায়। এই পাতলা হলুদ জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশান। জলটা লালচে বেগুনী হয়ে উঠবে।
☐ শুকনো লঙ্কা	লাল রং দিয়ে পালিশ করা	তরল পেরাফিন-এ (Paraffin) একটুকরো তুলো ভিজিয়ে নিন। এবার তুলোটা শুকনো লঙ্কার গায়ে ঘষতে থাকুন। তুলোর গায়ে লাল রঙ উঠে আসবে।

খাদ্য	ভেজাল রঙ	যেভাবে ভেজাল ধরবেন
☐ মুগ ডাল (খোসা ছাড়ানো)	মেটানিল ইয়েলো	ঠাণ্ডা জলে কিছুটা ডাল দিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন। জল যদি হলুদ হয়ে ওঠে তাতে কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে জল লালচে-বেগুনী হয়ে উঠবে।
☐ ডাল	লেড ক্রোমেট (ডালের রঙ চকচকে হলুদ রাখার জন্য ব্যবহার হয়)	পাঁচ গ্রামের মতো ডাল অল্প পরিমাণ জলে মিশিয়ে (পাঁচ সি. সি.) তাতে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাতে হবে। হালকা বেগুনী রঙ-এর (pink) উপস্থিতি ভেজাল প্রমাণ করে।
☐ চা (পাতা/ গুঁড়ো)	কৃত্রিম উপায়ে রঙ করা	একটা ভেজা সাদা কাগজের ফালির ওপর চা পাতা ছড়িয়ে দিন। গোলাপী অথবা লাল ছোপ কাগজের ওপর ফুটে উঠবে।
☐ চা	কোলটার-এর ডাই (Coal-Tar dye)	কাঁচের পাত্রে অল্প কলিচুন (slaked lime) ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর চায়ের অল্প কিছু গুঁড়ো বা পাতা ছড়িয়ে দিতে হবে। খাঁটি চা পাতায় একটা হালকা সবুজাভ হলুদ রঙ ফুটে ওঠে, লাল বেগুনী বা অন্য কোনো ধরনের রঙ ভেজাল প্রমাণ করে।

রঙ ছাড়াও আরো বহু ধরনের ভেজাল মেশানো হয় খাদ্যদ্রব্যে। কয়েকটির ক্ষেত্রে তা ধরে ফেলা যায় কিছু সহজ-সরল পদ্ধতির সাহায্যে।

খাদ্য	ভেজাল রঙ	যেভাবে ভেজাল ধরবেন
☐ ঘি এবং মাখন	বনস্পতি, রঙ, আলুসেদ্ধ	১. এক চামচ ঘি বা মাখনের সঙ্গে সম-পরিমাণ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাতে হবে। এরপর তাতে কয়েক দানা চিনি মিশিয়ে মিনিট খানেক নাড়তে হবে। মিনিট পাঁচেক পর টেস্ট-টিউবের তলার দিকে ঘন লাল রঙ (crimson) হলে বুঝতে হবে বনস্পতি রয়েছে। আর চিনি মিশানোর আগে অ্যাসিড মিশ্রিত ঘি-য়ে যদি অল্প জল মেশানো হয় এবং লাল রঙ আসে তবে বুঝতে হবে কোনো কোলটার রঙ মেশানো হয়েছে। ২. ঘি-য়ে কয়েক ফোঁটা আয়োডিন মিশিয়ে যদি নীল রঙ পাওয়া যায় তবে আলুর উপস্থিতি ধরা পড়ে।
☐ ভোজ্য তেল	মিনারেল তেল (পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি)	টেস্ট টিউবে আধ চামচ (২ সি. সি.) তেলের সঙ্গে সমান পরিমাণ N/2 অ্যালকোহলিক পটাশ মিশিয়ে গরম জলের বাথে বসিয়ে ১৫ মিনিট

খাদ্য	ভেজাল রঙ	যেভাবে ভেজাল ধরবেন
		ফোটাতে হবে। এরপর দু-চামচ (১০ সি. সি.) জল মেশালে যদি মিশ্রণটি অস্বচ্ছ হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে ওতে মিনারেল তেল ভেজাল দেওয়া হয়েছে।
□ ভোজ্য তেল	রেড়ির তেল (Castor oil)	টেস্ট-টিউবে কিছুটা পেট্রোলিয়াম ইথার নিয়ে তার সঙ্গে তেল মেশাতে হবে কয়েক ফোঁটা, এবার এটিকে ডিপ-ফ্রিজে বসিয়ে কয়েক মিনিট ঠাণ্ডা করতে হবে। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্রবণ অস্বচ্ছ হয়ে গেলে বুঝতে হবে ওতে রেড়ির তেল মেশানো হয়েছে।

মানিকদার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেদিন বিকেলে মানিকদার ক্যাণ্টিনে ঢুকে বোঁদের অর্ডার দিতেই খোকন এক প্লেট ফ্যাকাশে মিষ্টি দানা দিয়ে গেল। সেই লাল-হলুদের 'জেল্লা' নেই বটে, তবে মুখে দিতেই বুঝলাম স্বাদ সেই একই। পাশে শিবেন বসে ছিল, বললো—"দেখতে একটু কেমন লাগে বটে, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আজ থেকে হোস্টেলের বোঁদের রঙ সাদা হলো এই যা।"

এই রঙগুলি তো খাদ্য নয়, খাবারে কোনো নতুন খাদ্যগুণও এরা যোগ করে না। বরঞ্চ পচা, নষ্ট খাবারের বদগন্ধ ঢাকতে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এদের। কি তালিকার বাইরের, কি ভেতরের, কোনো রঙ-ই নিরাপদ নয়। এসব দেখেশুনে একটা প্রশ্নই দেখা দিয়েছে—"খাবার রাঙানো কী একান্তই প্রয়োজনীয়?"

সূত্র ঃ

1. Foods Drugs and Cosmetics ; Thakkamma Jacob
2. Food Adulteration ; Thakkamma Jacob
3. Text Book of Preventive & Social Medicine ; J. E. Park
4. WHO ; TRS (Technical Research Series) ; No. 669 এবং 683
5. Mirror ; July '87

* ভেজাল সহজে ধরার জন্যে একটি ছোট্ট পুস্তিকা বার করেছেন Central Health Education Bureau (Director General of Health Services, New Delhi)। বইটির নাম 'Quick Tests for some adulterants in food'।

☐ জ্যোতির্ময় সমাজদার, স্মরজিৎ জানা

ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপদ

গোটা কয়েক তোলা দাঁত (অবশ্যই মানুষের) কোলা জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়তে ডুবিয়ে রেখে পরীক্ষা করছিলেন আমেরিকার নাভাল ইনস্টিটিউটের ডাঃ ক্লাইভ ম্যাকে (Clive Mackay) । দু-দিন পরে দাঁতগুলি তুলে দেখলেন, ঐগুলির এনামেলের বেশিরভাগটাই ক্ষয়ে গেছে। এই এনামেল হচ্ছে দাঁতের ওপরের চক্‌চকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আবরণ।

কারণটা আর কিছুই নয়, প্রায় সমস্ত ধরনের ঠাণ্ডা পানীয়গুলিতে থাকে ফসফরিক বা সাইট্রিক অ্যাসিড। কোলা জাতীয় পানীয়ে থাকে মূলত ফসফরিক অ্যাসিড এবং বেশ ভালো পরিমাণে। প্রশ্ন উঠতে পারে, অ্যাসিড যদি থাকে তবে তেমন টক লাগে না কেন ? টক স্বাদটা ঢাকা পড়ে থাকে এর মিষ্টতার জন্য। এরজন্য তারা কয়েক চামচ চিনি অথবা সস্তার স্যাকারিন ব্যবহার করে। আর যেহেতু এই জাতীয় পানীয়গুলি সাধারণত আমরা খাওয়ার পর খাই এবং যেহেতু এসব খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার রেওয়াজ নেই বললেই চলে—তাই এই মিষ্টি পদার্থ দাঁতের গোড়ায় লেগে থাকে যার

থেকে পরে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি এবং তাতে মাড়ি এবং দাঁত দুয়েরই ক্ষতি-সাধন সমান হারে চলতে থাকে। অবশ্যই এখানে দাঁত ক্ষয়ে যাবার মূল কারণ, দাঁতের ওপর ফসফরিক অ্যাসিডের সরাসরি প্রভাব। কোলা পানীয়ের নাম শুনলে যাদের জিব দিয়ে জল পড়ে—ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায় তাদের চোখ দিয়েও জল পড়তে পারে একদিন, তা যেন খেয়াল রাখেন। আর শুধুমাত্র কি দাঁতের ক্ষতি? যারা কোলা পানীয়তে বেশ আসক্ত হয়ে পড়েন তাদের আরো অনেককিছুই ঘটতে পারে। যেমন পানীয়ের সঙ্গে যে-পরিমাণ ফসফরাস যৌগ (ফসফরিক অ্যাসিড) তারা গ্রহণ করেন তা শরীরের স্বাভাবিক ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের অনুপাতকে ব্যাহত করে। শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। শুধু তাই নয়, এই ফসফরাস যৌগ আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় লোহা বা আয়রনের শোষণকেও ব্যাহত করে।

না, এখানেও ব্যাপারটা শেষ হলো না। যারা যখন-তখন কথায়-কথায় কোলা খাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে তাদের জন্য আরো দুঃসংবাদ আছে। কোলার এই অ্যাসিড বিশেষত খালি পেটে খেলে আমাদের পাকস্থলীর ক্ষতি-সাধন করে। বেশ কয়েকবছর এভাবে চলতে থাকলে অম্বলের রোগে ভুগতে হতে পারে। আর যারা অম্বলের রোগী তাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। আদপেই খালিপেটে এসব খাওয়া ঠিক নয়।

মজার ব্যাপার হলো, উল্টে অম্বলের বহু রোগী এসব খায় এবং খেয়ে ভালো থাকে বলতে শোনা যায়। কেন এমনটা হয় ভাবতে একটু অবাক লাগতে পারে। কিন্তু তারও কারণ আছে। এই জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) উচ্চচাপে জলে গোলা থাকে। তাই এগুলি খাওয়ার পর জলের সঙ্গে মিশে বাইকার্বনিক-অ্যাসিড ও কিছুটা সোডিয়াম বাইকার্বনেট তৈরি করে যা আমাদের পাকস্থলীর জারক-রস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে সামান্য পরিমাণ প্রশমিত (neutralise) করে। তাই সাময়িক-ভাবে রোগী একটু উপকার পায় ঠিকই কিন্তু পানীয়ে দ্রবীভূত এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাকস্থলীকে ক্রমশ ফাঁপিয়ে দেয় (distended), ধীরে ধীরে পাকস্থলীর দেওয়ালে চাপ পড়তে থাকে এবং শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুযায়ী আরো বেশি অম্ল পাকস্থলীতে ক্ষরিত হতে থাকে। ফলে রোগ পরে আরো বেড়ে যাওয়ার রাস্তায় চলে যায়। বিশেষত সোডা জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ভয়ঙ্কর রকমের বেশি। শুধু তাই নয়,

এ-জাতীয় পানীয় খেলে এসব রোগীদের জীবনে মারাত্মক ফল হতে পারে, পাকস্থলী ফুটো হয়ে যাওয়া কিংবা পাকস্থলী বা অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার এ-জাতীয় পানীয়গুলির সঙ্গে যুক্ত। এগুলি সাধারণভাবে খিদে নষ্ট করে দেয়। বিশেষত কোলা জাতীয় পানীয়গুলি, কারণ এতে ক্যাফিনও থাকে। তাই বিশেষত বাড়ন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট। আমাদের দেশে কোনো হিসেব না পাওয়া গেলেও আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু দেশে কোলা-আসক্ত বাচ্চাদের অপুষ্টিতে ভুগতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া এতো দাম দিয়ে এ-জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয় খাবার কোনো যুক্তি সাধারণের থাকতে পারে না। কিন্তু স্রেফ প্রচারের দৌলতেই এমন একটি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক সামগ্রী হু-হু করে বেড়ে চলেছে বিশ্বময়। আফ্রিকায় কোলা পানীয়ের ব্যবহার '৬০ থেকে '৭০ এই দশবছরে মধ্যবিত্তের ঘরে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। জাম্বিয়ায় ১৮ মাসের শিশুর মুখে গুঁজে দেওয়া হয় কোকা কোলা। চিত্রটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও ভিন্ন নয়। কলকাতার রাস্তায় বহু মা-কেই দেখা যাবে কোলের বাচ্চার মুখে তুলে দিতে কোনো নামী কোলা পানীয়। তারা হয়তো জানেন না, '৪৩ থেকে '৫০ এই সাতবছর কুকুর-ইঁদুর-বাঁদর ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল, পরিমিত খাদ্য ও সঙ্গে কোলা পানীয় মাত্র ছ-মাস ধরে এইসব প্রাণীদের খাওয়ানোর ফলে তাদের মোলার (molar) বা পেষক দাঁত প্রায় পুরোপুরি ক্ষয়ে যেতে—বাচ্চাদের দুধে-দাঁত-এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। যারা প্রচুর পরিমাণ কোলাজাতীয় পানীয় খান তাদের ক্ষেত্রে পরিমিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়; এই দুয়ে মিলে তাদের লিভারে (যকৃত) সিরোসিস হতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

কারণ কোলা পানীয়তে পুষ্টির কোনো ব্যাপার নেই। ক্যালরি যোগানোর উপাদান বলতে এক বোতলে কিছু পরিমাণ চিনি। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিনির বদলে স্যাকারিনই দেখা যাবে। ঐ পয়সায় অনেক পুষ্টিকর ঠাণ্ডা পানীয়ই পাওয়া বা খাওয়া সম্ভব। অবশ্য কোম্পানি-গুলি এই জায়গা থেকেই এখন প্রচার জোরদার করছে—অর্থাৎ ক্যালরি নেই অথচ পেট ভরা থাকছে, শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর সহজতম রাস্তা। এ-রাস্তায় পা বাড়ালে ওপরে বলা সমস্ত শারীরিক ক্ষতিগুলিকেই স্বীকার

করে নিতে হবে—সঙ্গে আরো কিছু থাকছে। তা হলো, এ-জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ের বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহার করা হয় তার কিছু হয়তো সরকার অনুমোদিত ; তবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বহুদিন ব্যবহারে এর ক্ষতিকারক কোনো প্রভাব শরীরের ওপর পড়বে না—বিশেষত, ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রঙ-গুলির ক্ষেত্রে এ-সম্ভাবনা যথেষ্ট।

সাধারণভাবে কোলা পানীয়গুলিতে যে-সব রাসায়নিক মেশানো হয় তার অধিকাংশই ক্ষতিকারক এবং বহুদেশে তা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন লাল রঙ কারমোসিন (Carmoisine) যা আমেরিকা ও কানাডায় নিষিদ্ধ। এটি ক্যান্সার সৃষ্টি-ধর্মী। তাছাড়া আমেরিকায় জীবজন্তুদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ভীষণভাবে ব্যাহত হতে। এই রঙ মাত্র ২% হারে কুকুরদের খাইয়ে এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। টার্টাজিন যা কমলারঙের জন্যে বিখ্যাত—একইভাবে ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভূমিকা নিয়ে থাকে। এটি নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ এবং আমেরিকায় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। হলুদ রঙ আনতে সানসেট ইয়েলো-র ব্যবহার বেশ ভালো-ভাবেই হয়ে থাকে। এটি সুইডেন নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ ওই একই বিপদের জন্যে। ব্রিটেনে স্কুলের বাচ্চাদের হাঁপানি ইত্যাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অনুমানে সম্প্রতি সেদেশে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ হয়েছে! কমলা-হলুদ রঙ আনতে 'পন্‌সু' (Ponceau) এর ব্যবহার বহুদিন ধরে চলে আসলেও বর্তমানে এটিকে আদৌ নিরাপদ ভাবা হচ্ছে না। এটি অ্যালার্জি-হাঁপানী-ক্যানসার ইত্যাদি তৈরিতে ভূমিকা তো নেয়-ই, তাছাড়া আমাদের রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়ে দিতেও দেখা গেছে। ফলে এর ব্যবহার আমেরিকা ও কানাডায় বন্ধ হয়ে গেছে। এসব গেল অনুমোদিত রঙ-এর ব্যবহারের কথা।

আর তাছাড়া সরকার অননুমোদিত (Prevention of Food Adulteration Act বহির্ভূত) রাসায়নিকের ব্যবহার অর্থাৎ ভেজালের কারবার এসব পানীয়গুলির ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়। তবে না, বড়ো কোম্পানিগুলির ওপরও আদৌ ভরসা রাখবেন না। এব্যাপারে তারাও পিছপা নয়। কয়েকবছর আগে কলকাতায় কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার (Central Food Laboratory) এরকম ২৪টা পানীয় পরীক্ষা করে দেখে-ছিলেন ১১টাতে বিভিন্ন ধরনের ভেজাল রয়েছে। ৭টাতে চিনির বদলে

পুরোপুরি স্যাকারিন ছিল। এসব বিভিন্ন ক্ষতির কথা ভেবেই ইতালী এবং গ্রীসে কোলা পানীয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট কোলা পানীয় নিষিদ্ধ করার বিল পাশ করলেও বিশ্বজোড়া কোলা কোম্পানিদের চাপে পড়ে তা তুলে নিতে বাধ্য হয়। কোলার ফলাও কারবার আমাদের দেশেও ; এক কোম্পানি চলে গেলেও বাকিরা জোর কদমে ব্যবসা চালাচ্ছে।

কোলা পানীয়ের গ্রামীণ সংস্করণ হলো বোতল ভর্তি ঠাণ্ডা জল। এক কথায় 'জল'। বিশেষত ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে ট্রেনে-বাসে গরীব মানুষদের কাছে 'ফটাস্ জল' ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে বেশ প্রচলিত। এগুলিতে গোলা থাকে সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড যা সোডাতে থাকে। এগুলির পাকস্থলীর ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব আগেই বলেছি। অম্বলের প্রকোপ এতে বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া যে-সব ছোটখাট কারখানায় এগুলি তৈরি হয় সেখানকার পরিবেশ ও জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ থেকেই যায়।

এছাড়া আরো রঙ-বেরঙ-এর ঠাণ্ডা পানীয় রয়েছে, গ্রামাঞ্চলে যেগুলির প্রচলন যথেষ্ট। এগুলিতে সস্তা দামের যেসব রঙ বা গন্ধের জন্য যেসব রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়—সেগুলির ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে বলেও ভাবা হচ্ছে।

এরপর অনেকেই হয়তো আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন—গরমের দিনে একটু ঠাণ্ডা পানীয়ও খেতে পাব না ? সবেতেই অসুবিধা ! ঠাণ্ডা পানীয়ের কি একটুও প্রয়োজন নেই ? ঠিক। কার না একটু ভালো লাগে গরমের দিনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় হাতের কাছে পেতে। তবে তেমন অনেক কিছুই রয়েছে—ঠাণ্ডা লেবুর সরবৎ, বেলের সরবৎ, পয়সা থাকলে আরো একটু ভালো দইয়ের বা নিদেনপক্ষে ঘোলের সরবৎ বা লস্যিও খাওয়া যায়। আখেরে লাভ হবে নিজেরই। বিজ্ঞাপনের চাতুর্যে ভুলে গিয়ে কোম্পানিদের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজের রুচিকে গড়তে দেওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি ?

সূত্র :

1. Foods Drugs & Cosmetics ; Thakkamma Jacob
2. Gaddums Pharmacology ; A. S. V. Berger, K. J. F. Mitchell
3. Insult or Injury ; Charles Medwar
4. Utusan Consumer ; Jan '87

☐ স্মরজিৎ জানা

সর্দি-কাশির ওষুধ

সর্দি-কাশিতে আমরা সকলেই মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হয়ে থাকি। থেকে থেকে হাঁচি এবং সেই সঙ্গে নাক এবং চোখ দিয়ে জলীয় পদার্থ ক্ষরণ হলো সর্দির (Cold) লক্ষণ। নাকের ভেতরের ঝিল্লি এবং করোটির (Skull) মধ্যে যেসব বায়ুকোটর (Sinus) আছে তাদের ঝিল্লি সর্দির সময় আক্রান্ত হয়। আক্রমণের পর যতো সময় যেতে থাকে ততোই নাকের জল গাঢ়তর হয়ে কফে রূপান্তরিত হয়। এই কফ আমরা নাক ঝেড়ে বের করে দিই। অনেকটা অংশ আমাদের অগোচরে নাকের যে ফুটো গলবিলে মিশেছে সেখান দিয়ে গলা বেয়ে আমাদের পেটে চলে যায়। করোটির হাড়ের মধ্যস্থ বায়ুকোটরে যে-সর্দি বা কফ জমে সেটা নির্দিষ্ট রন্ধ্র পথে নাকে চলে আসে। কখনও প্রদাহজনিত কারণে অথবা কফ খুব গাঢ় হয়ে গেলে ঐ রন্ধ্র পথে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং বায়ুকোটরে জমে যেতে পারে, এই অবস্থায় আমরা কপালে বা চোখ-সংলগ্ন এলাকায় ব্যথা অনুভব করি, সামান্য জ্বর হতে পারে—একেই বলা হয় সাইনুসাইটিস (Sinusitis)।

সর্দি সাধারণত স্ব-নিরাময়যোগ্য (Self-limiting) অসুখ। মুজতবা আলীর গল্পের বিখ্যাত উক্তি—সর্দি চিকিৎসা করলে সাতদিনে সারে এবং চিকিৎসা না করলে সারতে এক সপ্তাহ লাগে—মোটামুটিভাবে সঠিক। অর্থাৎ সর্দি'র জন্য চিকিৎসার তেমন প্রয়োজন নেই। মাঝে-মধ্যে অত্যধিক মাথাব্যথার জন্য নিরাপদ ব্যথা নিরোধক বড়ি দু-একটা ব্যবহারই যথেষ্ট। তবে ডাক্তারের পরামর্শে জীবাণুনাশক ওষুধ খেতে হতে পারে।

কাশি

কাশি কোনো অসুখ নয়, এটা হলো একটা লক্ষণমাত্র। কাশি আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষামূলক এক প্রতিবর্তী ক্রিয়া। কাশি হলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের শ্বাসনালী বা ফুসফুসের কোনো অসুখ হয়েছে অথবা বাইরের কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ আমাদের শ্বাসনালীতে ঢুকেছে। কাশির মাধ্যমে শরীর ঐ ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

আমাদের শ্বাসনালীতে স্বাভাবিক অবস্থায় খুব সামান্য পরিমাণে এক ধরনের তরল পদার্থ (লালা জাতীয়) ক্ষরিত হয়, যেটা আমাদের অজান্তে খাদ্যনালী বেয়ে পেটে চলে যায়—আমরা টেরও পাই না। কোনো কারণে শ্বাসনালীর এই তরল যদি গুণগতভাবে অর্থাৎ বেশি ঘন বা আঠালো হয়ে যায় অথবা পরিমাণগতভাবে অর্থাৎ কম বা বেশি পরিমাণে নির্গত (ক্ষরিত) হয় তখন আমাদের কাশি শুরু হয়। নিম্নলিখিত কারণে সাধারণত আমাদের কাশি হয়ে থাকে।—

এক, শ্বাসনালীর অতি সংবেদনশীলতা (Allergy)

দুই, শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে জীবাণু-সংক্রমণ—যেমন ব্রঙ্কাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ইত্যাদি

তিন, শ্বাসনালীতে কোনো অবাঞ্ছিত বস্তুর উপস্থিতি—যেমন ধোঁয়া, ময়লা, ক্ষতিকর গ্যাস ইত্যাদি

চার, শরীরে জলাভাব ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের এক স্নায়ুকেন্দ্র কাশিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কেন্দ্র উদ্দীপিত হলে কাশি হয় আবার এই স্নায়ুকেন্দ্রকে দমিয়ে (Inhibit) দিলে যে কোনো কারণের জন্যই কাশি হোক না কেন, সেটা কমে যায়।

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কাশি কোনো অসুখ নয়, লক্ষণমাত্র। কাশির আসল প্রতিকার হলো অন্য অসুখের মতো কারণ খুঁজে বের করা এবং কারণকে দূর করা। কাশির কারণ খুঁজে সেটা দূর করতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক মাস লাগতে পারে, এই অন্তবর্তী সময়ের জন্য রোগীর কাশি উপশমের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কাশি উপশমের জন্য বাজারে চালু আছে হাজার রকমের কাশির সিরাপ (Cough expectorant), বড়ি, মলম ইত্যাদি। এই সব 'ওষুধ' ব্যবহারের যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা এবং ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করার আগে কাশি উপশমের বৈজ্ঞানিক উপায় এবং কিছু প্রচলিত ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে কাশি উপশমের সবচেয়ে ভালো ওষুধ (প্রক্রিয়া) হলো ফুটন্ত জলের ভাপ (বাষ্প) নাক এবং মুখ দিয়ে নেওয়া (Steam inhalation)। এই জলীয় বাষ্প শ্বাসনালীতে গিয়ে জমাট বাঁধা (ঘন আঠালো) শ্লেষ্মাকে তরল করে কাশির মাধ্যমে বের করে দিতে সাহায্য করে। এটা দিন-রাতে ৩/৪ বার করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্ণরূপে নিরাপদ। ফুটন্ত জলে বেনজাইন টিংচার মিশিয়ে ভাপ নেবার

প্রথা অনেকদিন থেকে চালু আছে। এটা প্রমাণিত যে, বেনজাইন টিংচার মেশানোর কোনো বাড়তি উপকার বা প্রয়োজন নেই।

এছাড়া শুকনো কাশির জন্য বেশি করে জল বা সরবৎ খেলে কাশির উপশম হয়। মুখে এমন কিছু জিনিস (মিছরী, লজেন্স, লবঙ্গ, আদা) রাখা যেতে পারে যার ফলে মুখে প্রচুর লালা সৃষ্টি হয় (Salivation) এবং এতে শুকনো কাশি বিশেষ করে গলা খুসখুস করা কাশির উপকার হয়। কোনো বড়ো ধরনের অপারেশন, ছানি অপারেশন, হার্ট-অ্যাটাক ইত্যাদি অবস্থায় যে কোনো ধরনের কাশিই বিপজ্জনক হতে পারে, সেইজন্য এইসব অবস্থায় এমন সব ওষুধ (কোডিন, নস্কাপিন, মরফিন ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেগুলি মস্তিষ্কের কাশির কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণকে, দূর করে না। এদের মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘ ব্যবহারে নেশার (Drug dependence) সৃষ্টি হতে পারে। খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে খুব সতর্কতার সাথে ডাক্তারদের পরামর্শে এইসব ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কাশির উপশমের বৈজ্ঞানিক উপায় বেশ সহজ এবং ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তবে যদি কাশির কারণকে (যেমন জীবাণু-সংক্রমণ) একই সাথে দূর করার চিকিৎসা না করা যায়, তবে উপশম দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে।

কাশির সাথে সম্বন্ধযুক্ত যে সব ধারণা যেমন—কাশি হলে টক, ঠাণ্ডা বা দই খেতে নেই, তার বেশিরভাগেরই কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। কাশির মধ্যে এসব খাবার খেলে কাশি বাড়ে না বা কমে না। তবে গলবিলে জীবাণু-সংক্রমণের দরুন কাশি (ফ্যারিনজাইটিস, টন্সিলাইটিস) হলে বরফ, আইসক্রিম জাতীয় খাদ্য কিছু পরিমাণে অসুখকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

কাশির সিরাপ

আজকের দিনে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মানুষ (বিশেষ করে যার পয়সা আছে) কোনোরকম কষ্টকে স্বীকার করতে রাজি নয়। দৈহিক বা মানসিক যে কোনো ধরনের কষ্টের লাঘবের জন্য চাই তাৎক্ষণিক (Instant) আরাম—যে কোনো উপায়ে বা মূল্যেই হোক। ধৈর্য ধরার সময় বা মানসিকতার বড়োই অভাব। ডাক্তারের কাছে বা ওষুধের দোকানে গিয়ে

আমাদের অধিকাংশেরই দাবি—আমার বা আমার আত্মীয়ের 'কষ্ট' এখনই দূর করতে হবে। যুক্তিশীল ডাক্তারবাবু (যাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম) যদি এই দাবির কাছে নতিস্বীকার না করে এবং শরীরের ক্ষতির কথা ভেবে যৌক্তিক (Rational) বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন যাতে 'আরাম হতে' দেরি হতে পারে, তবে দ্বিতীয়বার আর সেই ডাক্তারের কাছে যাবো না—আমাদের চাই সংগে সংগে আরাম (নিমেষেই শক্তি !)। ওষুধ কোম্পানিগুলি সংগঠিত প্রচারের মাধ্যমে (ডাক্তারের কাছে গিয়ে, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে) আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আমাদের বোঝাতে পেরেছে যে ওষুধের মাধ্যমে এই তাৎক্ষণিক আরাম এনে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এর ফলে সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী সুদূরপ্রসারী যে ক্ষতি-কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব সেটার কোনো উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই কোনো পণ্য-বিক্রেতার কাছে আশা করা যায় না। অন্যান্য বহু ওষুধের মতো আপাত নির্দোষ কাশির সিরাপের এই রমরমা কারবার ওষুধ কোম্পানিগুলির নোংরা ব্যবসায়িক চরিত্রের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

কমবেশি পরিমাণে অ্যাণ্টি-হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, মস্তিষ্কের কাশি নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র নিস্তেজক ওষুধ, ঐ কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করার ওষুধ এবং চিনির গাঢ় রসের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত এক জগা-খিচুড়ির নাম হলো কাশির সিরাপ (Cough syrup expectorant)। এই মিশ্রণে অনেক সময় দেখা যায় দেশী গাছগাছড়া এবং বিদেশী (রাসায়নিক) ওষুধের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

কাশির সিরাপে যে ওষুধ মেশানো থাকে সেগুলির কাশির মূল কারণকে দূর করার কোনো গুণ থাকে না। কিছু ওষুধ যেমন অ্যাণ্টি-হিস্টামিন জাতীয় বা কাশির কেন্দ্র নিস্তেজক ওষুধের কাজ হলো কাশিকে চাপা দেওয়া, শ্লেষ্মাকে গাঢ় করা বা শুকিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে কাশি উদ্দীপক ওষুধের কাজ হলো কাশি বাড়িয়ে দেওয়া, শ্লেষ্মাকে তরল করা। কি সুন্দর ব্যবস্থা! একই বোতলে পাওয়া যাচ্ছে এমন সব ওষুধ, যারা একদিকে কাশিকে থামাবে, আবার অন্যরা কাশি বাড়িয়ে দেবে। অনেকে হয়তো বলবেন যে—"এইসব কাশির সিরাপ ব্যবহার করলে তো কাশি কমে।" এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে—প্রথমত, উপরের আলোচনায় আমরা জেনেছি কাশি কমাবার অন্য নিরাপদ বিকল্প আছে। দ্বিতীয়ত, কাশি কমাতে হলে কেবলমাত্র থামাবার ওষুধ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। কাশি থামাবার জন্য কাশি উদ্দীপক ওষুধ কেন ব্যবহার করা হবে? আসলে কাশির ওষুধে কাশি

থামে কারণ ওতে যেসব কাশি কমাবার ওষুধ থাকে সেগুলির ক্ষমতা কাশি বাড়াবার ওষুধের থেকে বেশি অর্থাৎ কাশি উদ্দীপক ওষুধ না থাকলেও কমতো। এরই জন্য অনেক সময়ে সাময়িকভাবে কাশির উপশম হওয়া বিচিত্র নয়। কাশির সিরাপের এই তথাকথিত 'গুণ' পেতে আমাদের আর্থিক খেসারত ছাড়াও যে পরিমাণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় সেটা দেখা যাক।

অ্যান্টি-হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ (বেনাড্রিল, জিট, অ্যাভিল, ডাইলোসিন, কোরেক্স, ফেনসেডিল, ইত্যাদি ইত্যাদি) ব্যবহারে ঘুম পায়, বাচ্চাদের বেশি পরিমাণে ব্যবহারে তড়কা (খিঁচুনি) হতে পারে, গলা মুখ শুকিয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাব করতে কষ্ট, মাথা ঘোরা এবং কখনো কখনোও রক্তের দোষ ঘটাতে পারে।

কাশি উদ্দীপক হিসেবে যে-সব ওষুধ মেশানো থাকে তাদের মধ্যে কয়েকটি (যেমন এফিড্রিন) ঘটায় অনিদ্রা, উত্তেজনা, বুক-ধড়ফড়ানি ইত্যাদি। আবার কারও ব্যবহারে (যেমন ইপিক্যাক, অ্যামোনিয়াম লবণ) দেখা দেয় পেট জ্বালা, বমি। সব থেকে মারাত্মক হলো ক্লোরো-ফরমের উপস্থিতি। এর ক্রমাগত ব্যবহারে লিভার নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি লিভারের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এই জন্য অজ্ঞান করার ওষুধ হিসেবে ক্লোরোফরম আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না। তবুও কাশির ওষুধ হিসেবে ওষুধ কোম্পানিগুলি আমাদের এটা খাইয়ে চলেছে। ডাক্তার-বাবুদেরও বোধহয় এসব তথ্য জানা নেই অথবা তারা ভুলে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রতি বাংলাদেশে যে জাতীয় ওষুধ নীতি (১৯৮২) ঘোষিত হয়েছে তাতে সমস্তরকম কাশির সিরাপ বা বড়িকে বাতিল করা হয়েছে। সেদেশে কোনো কাশির সিরাপ তৈরি করা বা বিক্রি করা বেআইনী। সাধারণ লোক বা চিকিৎসকদের মনে এখনো কাশির সিরাপের উপকারিতার (!) মোহ থাকার ফলে প্রতিবেশী দেশ থেকে ঐসব ওষুধ চোরা পথে উপস্থিত হয়ে কালো বাজারের দরে বিক্রি হয়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তাদের পুস্তিকাগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধের যে তালিকা দিয়েছেন তাতেও কোনো রকমের কাশির সিরাপ তথা কাশির ওষুধের উল্লেখ নেই।

তবুও 'কাশির ওষুধ' দোকান আলো করে আছে আমাদের দেশে। কিন্তু কার প্রয়োজনে ? অন্তত রোগীর যে নয় সেটা আশা করি এখন পরিষ্কার।

সূত্র :
1. Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics; (1980), 6th Ed ; Macmillan
2. Respiratory Pharmacology & Therapeutics ; Ziment-Mosby
3. The Selection of Essential Drugs ; TRS No. 615 (1977), 641 (1977), 681 (1983) ; WHO ; Geneva
4. বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওষুধ ; ডায়না মেলরোজ ; গণ-প্রকাশনী, বাংলাদেশ

□ পীযূষকান্তি সরকার

নাকের জলে ব্যবসা ফাঁদা

সর্দি হলে তো অস্বস্তি লাগবেই, জল ঝরবে নাক দিয়ে, হাঁচি হবে, কখনো নাক এঁটে যাবে, মাথা ভারী ভারী লাগবে, গলা শুকিয়ে আসবে—সে এক যন্ত্রণার একশেষ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে রুপোলী পর্দায় দেখা ব্যস্তসমস্ত অফিসবাবুটির অসহায়তা অথবা কোনো এক সুবেশা তরুণীর বিব্রত মুখটি যা অল্প কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ফের ভরে উঠবে ঝলমলে হাসিতে ; অফিসবাবুটি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিয়ে। আর এই অত্যল্প সময়ের 'নায়ক' অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিশিষ্ট নামের ট্যাবলেটটি অথবা মালিশটি জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকবে আপনার মনের মধ্যে এবং একটু একটু করে ঠেলতে থাকবে পাশের দোকানটির দিকে—অবশেষে সেটি কিনে, তবেই না শান্তি।

আচ্ছা সত্যিই কি এমনধারা পরিবর্তন ঘটে আপনার শরীরে ? এগুলি ব্যবহারের পর সঠিকভাবে যাচাই করে দেখেছেন কি, এই সমস্ত সর্দির ট্যাবলেট বলে বাজারে খ্যাত এবং বিখ্যাত নামের মালিশগুলির

কার্যকারিতা ? আমরা অনেক সময়ই মানসিকভাবে প্রস্তুত করি নিজেকে—হ্যাঁ এবারে একটু কমছে বা কমে গেছে। মনে মনে মেনে নিই—এগুলি ব্যবহার করে কিছু না কিছু উপকার তো হবেই। কিছু না কিছু পরিবর্তন তো ঘটেই, এটাতো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্নটা হলো তা আপনার কতোখানি উপকারে লাগে ? অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যে আপনার সর্দির উপসর্গগুলি কমে আসে, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন আপনি, আপনার এই সুস্থ হয়ে ওঠার পেছনে এই দাওয়াইগুলির 'কর্মদক্ষতা'কে কেউ কেউ যদি কারণ হিসেবে মেনে নেন তাহলে তা হবে এক বিরাট রকমের ভুল। এ সমস্ত দাওয়াইগুলির ব্যবহার ব্যতিরেকেও যে বহুজন সুস্থ হয়ে ওঠেন এতো এক সাধারণ ঘটনা। এ-ধরনের কোনও ওষুধ কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে কোনও ধরনের কোনো ওষুধই সর্দি সারাতে পারে না, সর্দি সারে সাধারণ শারীরবৃত্তীয় নিয়মানুযায়ী, সেখানে কোনো ওষুধেরই কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্য সারার প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না ; প্রশ্ন, উপসর্গ-গুলিকে সাময়িকভাবে কতোখানি উপশম দিতে পারে এই ওষুধগুলি ?

সর্দি হওয়ার পেছনে রয়েছে এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ। এরা বাসা বাঁধে আমাদের শ্বাসতন্ত্রের আবরণী বা ঝিল্লিতে (Mucous membrane)। সেখানে তারা বংশবৃদ্ধি করে, কোষগুলি উত্তেজিত হয়, কোষগুলি ফুলে ওঠে ছিঁড়ে যায়, ফলে প্রচুর রস নিঃসরণ ঘটে যা নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। [একে বলে মিউকাস (Mucous)।] এসব কারণে নাক এঁটে আসে, কোষগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। জল ঝরে নাক-চোখ দিয়ে, এক কথায় সে এক নাকাল অবস্থা। অবশ্য আপনি শুধু সর্দি'র জন্য নাকাল হবেন আর ব্যবসায়িরা তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে তাতো হয় না—আপনাকে আর একটু 'কাতর' করার সুযোগ তারা ছাড়বে কেন ? তাই তারা এগিয়ে আসে কখনো 'ভিকস্' মলম বা 'স্টেপসিল্‌স' ট্যাবলেট নিয়ে। আর আপনি যাতে তাদের 'সততা'য় বিন্দুমাত্রও সন্দিহান না হন—তারজন্য তারা সমস্ত ধরনের প্রচার মাধ্যম-গুলিকে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। প্রতিদিন আপনার কানের গোড়ায়, চোখের সামনে সাজিয়ে তুলছে বিজ্ঞাপনের হরেক 'পসরা', হরেক-রকমের কলাকৌশল ; এতে আপনার কেন, খোদ বিজ্ঞানীদেরও মাথা ঘুলিয়ে যাবে। এমনি করে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এগুলির প্রতি এক 'মানসিক চাহিদা' এবং ক্রমান্বয়ে তা আপনার স্বাস্থ্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে

ওঠে। যেমন ধরুন সর্দি'র মালিশগুলির কথা, ভিকস্ ভেপোরাপ বা রুবেক্স তো এখন কথায় কথায় সবাই ব্যবহার করেন। এছাড়াও আরো বহু নামের মলম রয়েছে বাজারে। প্রায় সবগুলিতেই একই ধরনের উপাদান থাকে। এই দু-টি নাম করার কারণ আমাদের দেশের বাজারের প্রায় ৫০% এরাই নিয়ন্ত্রণ করে—কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা চলে এই দাওয়াইগুলির ওপর। এই দু-টি দাওয়াইতে একই ধরনের রাসায়নিক প্রায় একই মাত্রায় রয়েছে। এর মূল উপাদানগুলি হলো কর্পূর, মেন্থল ও তার্পিন তেল, এগুলিকে যন্ত্রণাবিরোধী রাসায়নিক হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়। এগুলি মেশানো থাকে প্যারাফিনে—মালিশ করার সুবিধার্থে। এগুলি শরীরের যে-সব জায়গায় মালিশ করা হয়, সেখানকার রক্ত চলাচল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং সেখানে তাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি খালি হাতে মালিশ করেন তাহলেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে। মেন্থল স্থানীয় স্নায়ু-তন্তুর ওপর প্রভাব ফেলে ঐ জায়গাটায় একটা শিহরণ ও ঠাণ্ডা ভাব আনে। কর্পূরের এই ঠাণ্ডা করার ক্ষমতাটুকুও ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। এগুলিতে আর থাকে ইউক্যালিপটাস তেল। এর গন্ধ বেশ ভালোই লাগে সন্দেহ নেই। কিন্তু মালিশ করে সর্দির কি বিশেষ উপকারে আসবে তার কোনো হদিশ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। এতো গেল এর রাসায়নিক বস্তুগুলির সাধারণ কার্যকারিতার কথা। কিন্তু রক্ত-সঞ্চালন একটু বাড়িয়ে বা স্থানীয়ভাবে একটু ঠাণ্ডাভাব এনে এগুলি সর্দির লক্ষণগুলির উপশমের ক্ষেত্রে কি অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছে তার কোনো ধরনেরই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত মেলে নি, কোনো পরীক্ষিত সত্যও বেরিয়ে আসে নি এই মলমগুলির ব্যবহারকে ভিত্তি করে। এমনি আর এক ধরনের মালিশের নাম হলো অমৃতাঞ্জন, বাজারে এর বেশ নামডাক। সর্দি থেকে শুরু করে মচকানোর ব্যথা অর্থাৎ সব ব্যথাতেই ব্যবহারের নিদান দেওয়া আছে এই মালিশটির বেলায়। এতে অতিরিক্ত যে-জিনিসটি থাকে তা হলো মিথাইল স্যালিসাইলেট (Methyl Salicylate)। এটি একটি বিপরীত প্রদাহ সৃষ্টিকারী পদার্থ (Counter irritant)। সহজ কথায় এটি যে জায়গায় মালিশ করা হয় সেখানে স্থানীয়ভাবে প্রদাহের সৃষ্টি হয়—তখন মূল প্রদাহটি আর অনুভূত হয় না। কিন্তু এতো কায়দা কসরৎ করেও সর্দির মূল উপসর্গ-গুলিকে সামান্যভাবে কমাতে বা প্রভাবিত করতে এগুলি অক্ষম। তবুও সাধারণের মনে এগুলির প্রতি রয়েছে এক গভীর মোহ। বিশিষ্ট এক

ভেষজবিদের ভাষায় (Pharmacologist) "এই মালিশগ‍ুলির উদ্বায়ী তেলের (তার্পিন তেল ইত্যাদি) উষ্ণতা, শিহরণ ও বাষ্পের দিকে লোকেরা ঝুঁকে পড়ে কারণ বড়ি খেলে তো সঙ্গে সঙ্গে সে-রকম কিছু অনুভব করা যায় না"—এই মানসিক দুর্বলতাটুকু ভাঙিয়ে বাজার মাৎ করেছে এইসব দাওয়াই ব্যবসায়িরা।

এইসব মালিশগুলি ব্যবহারের আর এক ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়—তা হলো, গরম জলের বাষ্পের সঙ্গে এগুলিকে নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় উপসর্গগুলির সাময়িক কিছু উপশম ঘটে এতে। কিন্তু এই উপশমের ক্ষেত্রেও এই মলমগুলির কোনো বিশেষ কারিকুরি নেই। গরম বাষ্প নাকে নিলে শ্বাসতন্ত্রে ও ঝিল্লিতে জমে থাকা চটচটে বা শুকনো নিঃসরণ নরম করে দেয়, তাছাড়া নিঃসরণ কিছু বাড়িয়ে দিয়ে অস্বস্তির ভাবটা অনেকখানি কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। সাধারণ কাশি প্রশমনেও এই গরম বাষ্প নাকে নেওয়ার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। তার জন্যে জলে ভিকস্ বা অম্রুতাঞ্জন মেশানোর কোনো দরকার নেই। ইউক্যালিপ্টাস্ তেলের অতি সামান্য কিছু ভূমিকা রয়েছে এই ঝিল্লীর নিঃসরণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে, কিন্তু স্রেফ গরমজলের ভাপ নাক দিয়ে টেনে নিলে তার থেকে অনেকগুণ বেশি সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

অবশ্য সর্দির মালিশগুলির রমরমা বাজার আছে বলেই যে সর্দি-কাশির ট্যাবলেটের কোনো কদর থাকবে না এমন কোনো কথা নেই। পানের দোকানে গিয়ে চাইলেই আপনি পেয়ে যাবেন 'ভিকস্-এ্যাকশন ৫০০' বা 'কোলডারিন ট্যাবলেট'। সর্দিতে এঁটে থাকা নাক পরিষ্কার করতে এটি নাকি অদ্বিতীয়। মাথা ভারী হয়ে থাকা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, এসব দূর করতে এগ‍ুলির 'ক্ষমতা যে অসীম' তা বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়। ভিকস্ ট্যাবলেটে রয়েছে এফিড্রিন (Ephidrin) আর কোলডারিনে রয়েছে ফেনিলেফ্রিন (Phenylephrine), এফিড্রিন হাঁপানী ইত্যাদি শ্বাসকষ্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সর্দিতে যে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় তার কারণ হলো নাক এঁটে যাওয়া। এক্ষেত্রে কি এই ওষুধগ‍ুলির কোনো কার্যকর ভূমিকা রয়েছে ? এফিড্রিনের অবশ্যই রয়েছে, কারণ, এটি স্থানীয়ভাবে রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে নিঃশ্বাস চলাচলের রাস্তা করে দিতে পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ওষুধটিকে ব্যবহার করতে হবে স্থানীয়ভাবে, নাকে স্প্রে করে বা নাকের ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করে।

ফেনিলেফ্রিন (Phenylephrine), সিউডো-এফিড্রিন (Pseudoephidrine) এবং ফেনাইল প্রোপানোল্যামিন নাকের ড্রপে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকে। অবশ্য এই স্প্রেগুলির অন্য একটা বিপদ রয়েছে; সাময়িকভাবে এগুলি স্বস্তি এনে দিলেও একটু পরেই আবার নাক তীব্র ভাবে এঁটে যায়, একে বলে ওষুধটির 'রিবাউণ্ড-এফেকট' (Rebound effect)। ফলে রোগীকে বার-বারই তা ব্যবহার করতে হয়। এবং যত সময় যেতে থাকে, ততই এই ভালো থাকার সময়টা কমে যায়। এতবার 'স্প্রে' ব্যবহারের ফলে নাকের ঝিল্লীর ক্ষতি হয়ে থাকে এবং সর্দিতে রোগভোগের সময় না কমে উল্টে বেড়ে যেতে পারে। এফিড্রিন ছাড়া অন্যগুলো ট্যবলেট হিসাবে বন্ধ নাক খোলার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। অথচ ভিকোরিল, র‍্যাল-সিডিন, কোরাজেসিক ট্যাবলেটেও থাকে ফেনিলেফ্রিন আর কনটাক সি-সি; এসকোল্ড ইত্যাদিতে থাকে ফেনাইল প্রোপানোল্যামিন্ এবং অ্যাক্টিফেট; সুডাফেড ইত্যাদি ট্যাবলেটে রয়েছে সিউডো-এফিড্রিন। এগুলি সারা শরীরের রক্তবাহী নালিকার সংকোচন ঘটিয়ে রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়—বিশেষত ফেনাইলপ্রোপানোল্যামিন যুক্ত ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে এর দরুন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে যেতে পারে। এছাড়া এতে তীব্র মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং মানসিক অস্থিরতা চিন্তা-ভাবনার অসামঞ্জস্য এবং হ্যালুসিনেশান ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। অ্যাক্টিফেট জাতীয় ট্যাবলেট থেকেও অনিদ্রা, মানসিক-অস্থিরতা, ভয়, উদ্বেগ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সব ওষুধ হ্যালুসিনেশান ইত্যাদির জন্ম দিতে পারে। বড়োদের ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদি বেড়ে যেতে পারে। এফিড্রিন যুক্ত ট্যাবলেট বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বিশেষত যাদের প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বেড়ে গেছে তাদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে বিপত্তিও দেখা দিতে পারে।

তেমন মাথা ধরলে সাধারণ একটা 'অ্যাসপিরিন' ট্যাবলেটই যথেষ্ট। বাজারে শুধু 'অ্যাসপিরিন' ট্যাবলেটের বদলে বহু ব্র্যাণ্ড নামের ওষুধ পাওয়া যায়, তাতে অ্যাসপিরিন ছাড়াও হাবিজাবি এটাসেটা যেমন কিছুটা ঘুমের ওষুধ বা কিছুটা ভিটামিন বা কিছু অল্প পরিমাণ ক্যাফিন মেশানো থাকে। কার্যত এগুলির জন্য কোনো বাড়তি উপকার তো নেই-ই উপরন্তু বেশ বেশি দামেই কিনতে হয় এগুলি। অনেক সময় এগুলিতে বহু বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক যেমন ফেনাসেটিন বা অ্যামাইডোপাইরিন মেশানো থাকে। যেমন সিবালজিন, অ্যারিস্টোপাইরিন, এসজিপাইরিন ইত্যাদি।

ফেনাসেটিন মেশানো ব্যথার বড়ি যেমন ভেগানিন বা ডিস্ট্র্যান বা কোডোপাইরিনও বিপজ্জনক ওষুধ। অবশ্য ইদানীং বহু কোম্পানি ঐ ক্ষতিকারক দ্রব্যগুলি ঐ নামের ওষুধগুলি থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তবুও জ্বরের জন্য শুধুমাত্র প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এবং গায়ে-ব্যথা ও মাথা-ব্যথার জন্য অ্যাসপিরিন ট্যাবলেই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটটি জলে গুলে কিছু খাওয়াদাওয়ার পর (অর্থাৎ খালি পেটে নয়) খাওয়াটা যুক্তিযুক্ত। অনাবশ্যক আজে বাজে কম্বিনেশন ওষুধ (অর্থাৎ যে-ওষুধে একাধিক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে) না খাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সর্দির ওষুধগুলির আর একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান হলো অ্যান্টি-হিস্টামিন। ভিকোরিল ট্যবলেটে এটি রয়েছে, এছাড়াও অবশ্য বহু অ্যান্টিহিস্টামিনিক ট্যাবলেট (Anti-histaminic) বাজারে রয়েছে যেমন ফরিস্টল (Foristol), অ্যাভিল (Avil), একটিফেড (Actifed) ইত্যাদি। এগুলি অ্যালার্জি ছাড়া অন্য কোনো ধরনের সর্দিতে কোনো কাজই করে না। কিন্তু সাধারণের মনে প্রচণ্ড বিশ্বাস রয়েছে যে, এটি কিছু না কিছু কাজ করছে তাদের ক্ষেত্রে। এটা ঠিকই, এই রাসায়নিকগুলি একটু ঘুম ঘুম ভাব এনে দেয়। এছাড়া আর যা তারা করতে পারে, তাহলো শ্বাসনালীর নিঃসরণ শুকিয়ে দেওয়া। ফলে অনেক সময়ই তা সৃষ্টি করে প্রচণ্ড অস্বস্তির। সর্দির উপসর্গগুলির উপশম তো দূরের কথা বরং গলা এবং শ্বাসনালীর কষ্টদায়ক অনুভূতিটি আরো একধাপ বাড়িয়ে দিতে পারে এই ওষুধগুলি।

সর্দিতে বহুল প্রচারিত আর একটি দাওয়াইয়ের সাধারণ নাম 'কাফ্-ড্রপ'। এগুলির গঠন যেমন বিচিত্র, তেমনি এগুলিতে ওষধির অনুপান ও মিশ্রণ বড় বিচিত্র ধরনের। আর বহু বিচিত্র কায়দায় মন এরা জয় করে সাধারণ ক্রেতাদের। রাস্তায়, সিনেমা হলে, ট্রেনের কামরায়, কোনো হকার বা সুবেশ কোনো রিপ্রেজেণ্টেটিভদের হাত থেকে পেয়ে যেতে পারেন এরকম কোনো একটা দাওয়াই—অনেক সময় স্রেফ উপহার বা গিফ্‌ট (gift) হিসেবে। ডাক্তার ছাড়াও সাধারণ ক্রেতারাও এই গিফ্‌ট পেতে পারেন, এগুলি হলো স্ট্রেপসিলস (Strepsils), হল্‌স বা ভিকস্ কাফ ড্রপস। প্রতিটি ভিকস্ ভিস্ক-এ রয়েছে এফিড্রিন, মেন্থল এবং আর একটি রাসায়নিক যার নাম ডেকস্ট্রোমেথরফ্যান (Dextrometherphan)। এফিড্রিন এবং মেন্থলের কার্যকারিতার কথা তো আগেই আলোচনা করেছি। সর্দির চিকিৎসায় এগুলির যে কোনো ভূমিকাই নেই তা দ্বিতীয়বার বলার অপেক্ষা

রাখে না। অবশ্য ডেকস্ট্রোমেথরফ্যান কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাশির কেন্দ্রকে (Cough centre) প্রভাবিত করে কাশি বন্ধ করতে পারে—সত্যি কথা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ১৫ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম ডোজের ওষুধ। অথচ এই ভিক্‌স ভিস্ক-এ রয়েছে মাত্র তিন মিলিগ্রাম ডেকস্ট্রোমেথরফ্যান। অর্থাৎ কাশি বন্ধ করতে হলে আপনাকে একবারে খেতে হবে অন্তত ৫টি ঐ ভিকস্ বড়ি। কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন এই ধরনের ট্যাবলেটগুলি চুষলে কিছুটাতো স্বস্তি পাওয়া যায়—গলার শুকনো ভাব কিছুটা চলে যায়। অবশ্যই তা হয়। এই ট্যাবলেটগুলি চুষলে মুখের লালা নিঃসরণ বাড়ে এবং তাতে গলার প্রদাহ কিছুটা কমে, শ্বাসনালীর প্রদাহও কিছুটা প্রভাবিত হয়। কিন্তু এর জন্য আপনাকে স্ট্রেপসিল্‌স বা হলস্ খেতে হবে না। বাজারে যে কোনো লজেঞ্চুস বা শুধু এক টুকরো মিছরি চুষলেও ঐ একই ফল পেতে পারেন আপনি। 'দুলালের তালমিছরি'-রও এক্ষেত্রে বাড়তি কোনো সুবিধা নেই। সাধারণ মিছরিতেই একই কাজ পাওয়া সম্ভব। আর সঙ্গে যদি প্রচুর পরিমাণ জল খান তাতে আপনার শ্বাসনালীর প্রদাহেও স্বস্তি এনে দিতে পারে। সর্দিতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রচুর পরিমাণ পানীয় এবং প্রয়োজনে গরম জলীয় বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে নিন, দেখবেন যথেষ্ট আরাম পাচ্ছেন। স্ট্রেপসিল্‌স, হলস্ ইত্যাদি ধরনের ট্যাবলেট বাইরের দেশে বহু পূর্বেই বাতিল হয়ে গেছে। এতে ব্যবহৃত মেন্থল ইত্যাদি বস্তুগুলির কথা আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের বই (Pharmacopoeia) থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু স্ট্রেপসিল্‌স কোম্পানি এদেশে মুনাফা লোটে কোটি টাকারও বেশি।

সর্দির উপর ভিটামিন 'সি' এর ব্যবহারের কথা না বলে, শেষ করলে বোধ হয় যথোচিত কাজ হবে না। এদেশে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং এর ব্যবহারের পেছনে বেশ একটা ভাবগম্ভীর বৈজ্ঞানিক বাতাবরণের সৃষ্টি করা হয় সাধারণ তথা ডাক্তারদের মনেও। ৫০০ মিলি গ্রামের এই ট্যাবলেটগুলি বেশ বড় বড় কিছু কোম্পানির ব্যবসার আওতায় এখন। রেডক্সন (Redoxon) বা সাক্‌সী (Suckce) ট্যাবলেটের জন্য ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন দরকার হয় না। সুনিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Randomised double blind control trial) মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সর্দি প্রতিরোধে ভিটামিন 'সি'-র কোনো ভূমিকাই নেই। যারা শীত পড়লে ভিটামিন 'সি' খেতে শুরু করেন তারা একটু ওয়াকিবহাল হোন এবার থেকে, কারণ বেশ কিছুদিন উচ্চ ডোজে ভিটামিন 'সি' খাওয়ার

পর তা ছেড়ে দিলে—শরীরে ভিটামিন 'সি'-এর অভাব দেখা দিতে পারে। কারণ ঐ উচ্চ ডোজের ভিটামিন 'সি' ভেঙে শরীর থেকে বের করার প্রক্রিয়ায় কিছু দিনের মধ্যেই শরীর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন স্বাভাবিক মাত্রার ভিটামিন (যার দৈনিক প্রয়োজন ৩০ থেকে ৫০ মি. গ্রা.) যা শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতো তা আর তাল রাখতে পারে না শরীরে বর্দ্ধমান ভিটামিন ভাঙার প্রক্রিয়াটির সঙ্গে। অতএব সাবধান। অবশ্য সর্দির সময় ভিটামিন 'সি' খেলে রোগভোগের সময় উপসর্গগুলি কিছুটা কম হতে পারে। তার জন্য ৫০০ মি. গ্রা. ভিটামিনের কোনো প্রয়োজন নেই, ৮০ থেকে ১০০ মি. গ্রা. ভিটামিন 'সি' খেলেই যথেষ্ট আর তা সাধারণ শাকসবজি বা একটা কমলালেবু বা একটা আমলকী খেয়ে পুষিয়ে নিতে পারেন আপনি, তার জন্য আলাদাভাবে ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট খাওয়ার কোনো দরকার নেই। শুধু তাই নয় উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'সি' খেয়ে গেলে রেচনতন্ত্রে (Urinary tract) পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সূত্র॥

1. Megavitamins, Fact & Fancy ; James O. Woolliscroft
2. Chalmers T. C. ; Am. J. Med
3. Uelean B I., Hughes R.E., Wilson H., Ketae ; Am. J. Clir Nulir
4. Rhead W. J. Schrawzer G. N. ; Nutr. Rev
5. Pharmacology & Pharmacotherapeutics ; R. S. Satoskar & S. D. Bhandarkar
6. Drugging the Indian
7. নিষিদ্ধ ওষুধ ; ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম
8. Problem Drugs ; HAI Publication (1986)

☐ স্মরজিৎ জানা

টনিক খাওয়ার বাতিক

আপনার নিজের কথাই ভাবুন। প্রত্যহ দিনগত-পাপক্ষয় করতে অফিস-কাছারি বা কর্মক্ষেত্রে যাবেন, সারাদিনের নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার পর ক্লান্ত পায়ে ঘরে পেঁছে খাওয়া-দাওয়া শেষ করবেন আর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেওয়ার আগেই দু-চামচ ভালো (কোনো নামী কোম্পানির) কোনো টনিক হৃষ্টচিত্তে সেবন করবেন। আঃ! সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদের নিরাময় লুকিয়ে রয়েছে এই টনিকে, তাইতো! প্রায়ই আপনার বন্ধুদের বলতে শোনা যায়, ছেলেটা কাজে-কর্মে কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না, মন দিতে পারছে না, কেমন যেন সবসময়েই হাই তোলে; কিংবা ঐ ছেলেটা বারবারই অসুখে ভুগছে, মেয়েটা কেমন যেন বোকা বোকা— নির্ঘাৎ ওদের সবারই ভিটামিনের অভাব হয়েছে—অতএব ওদের টনিক খাওয়া দরকার। এরকম হাজার-একটা উপসর্গের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা ভিটামিনের অভাব দেখতে পাই (আমাদের ডাক্তাররাও দেখতে পান !), আর হাসপাতালের আউটডোরগুলিতে তো কথাই নেই, প্রায়শই রোগীদের বলতে শোনা যায়—শরীরে একটুও বল পাচ্ছি না, খিদে ঠিকমতো হয় না, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে—একটা ভালোমতো টনিক লিখে দিন না। আবার উচ্চবিত্ত ঘরের মহিলারাও আসেন। তার ছেলে সবে সাঁতার শিখতে শুরু করেছে, পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, সুতরাং তাকে একটা ভালো দামী টনিক লিখে দেওয়া হয় যেন।

আসুন, এবার দেখা যাক আমাদের এই ধারণাগুলি কতোখানি সত্যি, আর কতোখানি যুক্তিহীন সংস্কার; ডাক্তাররাই বা এতো টনিক খাওয়ার উপদেশ দেন কেন, এর পেছনের কারণগুলি কী? আর এর ফলে লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে কাদের তারও একটু হিসেব-নিকেশ করার দরকার আছে —কেন না গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে টনিকগুলি কিনতে হয় আপনাদেরই।

টনিকগুলি হচ্ছে মূলত কয়েক ধরনের ভিটামিন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিনারেল আর কিছু 'হাবিজাবি' জিনিস—সাধারণত অ্যালকোহলের সাথে

মিলিয়ে তৈরি করা হয়। আপাতত ভিটামিন ব্যাপারটি ছোট কথায় বুঝে নেওয়া যাক। 'হাবিজাবি'-র কথায় পরে আসছি।

ভিটামিন হচ্ছে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ যেগুলি আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুঘটকের কাজ করে। (এই বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমেই শরীর তার প্রয়োজনীয় শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে।) ভিটামিন নিজে কোনো শক্তি উৎপাদন করতে পারে না। এই ভিটামিন-গুলি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে থাকে এবং আমাদের শরীর সেইভাবেই তাদের শোষণ করে। একমাত্র ভিটামিন-'ডি' ছাড়া আমাদের শরীর অন্য কোনো ভিটামিন তৈরি করতে পারে না। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-সামগ্রীতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ছড়িয়ে আছে। ভিটামিন দু-রকমের —এক, জলে দ্রবীভূত হয় এমন (Water soluble); দুই, স্নেহ-জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় এমন (Fat soluble) ভিটামিন। জলে দ্রাব্য ভিটামিন হচ্ছে বি-গ্রুপের ভিটামিনগুলি এবং ভিটামিন-সি; আমাদের টনিক বা ভিটামিন-ট্যাবলেটগুলির মূল উপাদান হচ্ছে এই শ্রেণীর ভিটামিন-গুলি আর দু-নম্বর ভিটামিন হচ্ছে এ, ডি, ই, এবং কে; কিছু কিছু টনিকে এ, ডি এবং ই ভিটামিনও আছে।

আগেই বলেছি ভিটামিন হচ্ছে একশ্রেণীর 'জৈব অনুঘটক'। আমাদের শরীর শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থের বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি ও তাপ সঞ্চয় করে। এই সব প্রক্রিয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিটামিন-গুলি অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। তাই অনেক ভিটামিনের প্রয়োজনীয় মান অর্থাৎ সেটা কতোখানি প্রয়োজন তা নির্ধারিত হয় শক্তি উৎপাদনের অনুপাতে। যেমন,

বি$_১$—০·৫০	মিলিগ্রাম	দরকার	১০০০	ক্যালরি	উৎপাদনের অনুপাতে
বি$_২$—০·৫৫	,,	,,	,,	,,	,,
বি$_৭$—৬·৬	,,	,,	,,	,,	,,

অর্থাৎ যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মোটামুটি ২,৫০০ ক্যালরির অনুপাতে খাদ্য দরকার হয়, সেখানে বি১-এর দরকার ০·৫ × ২·৫ = ১·২৫ মিলিগ্রাম। এখানে তাই একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার যে, মানুষ

যেখানে এই ক্যালরি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল খাদ্য-উপাদানগুলিই পায় না সেখানে সেই অনুপাতে ঐ ভিটামিনের প্রয়োজনও কমে যায়।

মানবদেহের এই ভিটামিনগুলির অভাব দেখা দিতে পারে কিছু কারণে —এক, যদি দেখা যায় আমাদের খাওয়া-দাওয়াতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন মিলছে না ; দুই, যদি দেখা যায়—যে-ভিটামিনগুলি আমরা খাচ্ছি সেগুলি শোষিত হচ্ছে না। সাধারণত বহুদিন ধরে পেটের বিভিন্ন ধরনের অসুখে যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। (এখানে আরেকবার মনে করিয়ে দিই, ভিটামিনগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু হজমের কোনো প্রশ্ন উঠছে না। অর্থাৎ, যেমন শর্করা জাতীয় পদার্থ পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে গ্লুকোজ হয় তারপর শোষিত হয়, কিন্তু ভিটামিন খাদ্যদ্রব্য থেকে সরাসরি শোষিত হয়।)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে ভিটামিন খাওয়া সত্ত্বেও শোষিত হচ্ছে না পেটের অসুখ ইত্যাদি ব্যাপারগুলির জন্যে, সেখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার—শুধু ভিটামিন নয় অন্যান্য সমস্ত মূল উপাদানগুলিও দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বরং জলে দ্রবীভূত ভিটামিনগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক কমই পায়খানার সাথে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রেও টনিক খাওয়ার কোনো মানেই হয় না। এখানে মূল রোগটার চিকিৎসাই প্রাথমিক ব্যাপার।

এরপর আসে আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। চাল, রুটি, ছাতু, বাজরা, শাকপাতা ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী রান্না করার সময় এ থেকে কয়েক রকমের ভিটামিন কিছু কিছু নষ্ট হলেও নিঃসন্দেহে হিসেব করে বলে দেওয়া যায়, ভাত বা রুটির সঙ্গে সস্তা দামের তরি-তরকারি শাকপাতা খেয়ে যারা পেট ভরায় তাদের সাধারণত ভিটামিনের অভাব হয় না। আর এর থেকে যারা ভালো খায় তাদের ক্ষেত্রে তো টনিক খাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শুধু অঙ্কের হিসেব-নিকেশ নয়। ঘটনাগতভাবে এটাই সত্যি। ডাক্তারদের চেম্বারে যারা ফি দিয়ে দেখান সেইসব মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের তো নয়ই, এমন কি সরকারি হাসপাতালগুলিতেও দূর-দূর গ্রামগঞ্জ ও বস্তি থেকে ভিড় করেন যে সব মানুষেরা, কিংবা যেসব মানুষেরা দাতব্য চিকিৎসা-লয়গুলিতে ভিড় জমান (লেখকের নিজের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা আছে) তাদের ভেতর শুধুমাত্র ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গ নিয়ে

এসেছে এমন মানুষ নেই বললেই চলে। (ব্যতিক্রম—ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত উপসর্গ নিয়ে যেসব ছেলেমেয়েরা আসে এবং যাদের চিকিৎসা করা হয় মূলত ভিটামিন 'এ' ইনজেক্‌শন্ বা নির্দিষ্ট ডোজে খাইয়ে। সেখানে টনিক খাইয়ে এ-অভাব পূরণ করা যায় না একদমই।)

এবার আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, যারা পেট পুরে খেতে পাচ্ছে না—এদের সংখ্যাই তো আমাদের দেশে প্রচুর—তাদের বেলা? হ্যাঁ, সেখানেও টনিক খাওয়ানোর কোনো মানে হয় না। হাঁড়িতে চাল না দিয়ে শুধু জল ভর্তি করে ফুটিয়ে গেলে কি ভাত তৈরি হবে?

অথচ প্রায় সকলেই টনিক চান, টনিক খান। আবার ডাক্তাররাও না চাইলেই অনেক ক্ষেত্রে টনিক লিখে দেন। সাধারণ মানুষের বেলায় না হয় টনিক খাওয়ার একটা মানসিক প্রয়োজনীয়তা (Psychic need) তৈরি হয়েছে, কিংবা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের বেলায়? এরজন্যে আমরা হাসপাতালে বেশ কিছু হাউসস্টাফ আর ইন্টার্নদের প্রশ্ন করেছিলাম। তাদের বক্তব্যগুলি একজায়গায় করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায় —আসলে রোগীরা চায় তাই তারা লেখেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরও ডিসচার্জের সময় টনিক লিখে দেওয়া এক প্রচলিত ব্যবস্থা তাই অতো ভাবনা-চিন্তা না করেই ডাক্তাররা লেখেন। আর আউটডোর, চেম্বার ইত্যাদিতে রোগীর উপসর্গগুলির কোনো হদিশ যখন পাওয়া যায় না— তখন ভিটামিন লিখে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ এটাতো কোনো 'ক্ষতি করে না'! এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা কিন্তু কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন না। অবশেষে তারা বলেন—আর যাই হোক,

---

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি টনিকেই ঘটা করে ভিটামিন বি১২ মেশানো হয়। সাধারণভাবে এর অভাব আমাদের দেশে ঘটে না। বিশেষ জেনেটিক কারণে য়ুরোপের কিছু কিছু মানুষ এর অভাবে ভোগেন। অথচ মজা হলো ব্রিটেনে, যেখানে ভিটামিন বি১২ যুক্ত বাজারজাত ওষুধের সংখ্যা মাত্র ১৬টি, সেখানে আমাদের দেশে এই সংখ্যা ১২৬।

সূত্র : Bitter Pills ; Diana Melrose

টনিক খেয়ে তো প্রায় সব রোগীই বলে, সে বেশ ভালোই আছে। টনিকটার ওষধি মূল্য না থাকলেও মানসিক জগতে তো রোগীর উন্নতি ঘটাচ্ছে (Placebo), সেটাই বা কম কি ? তাই টনিক লেখার সময় তাদের সব থেকে বেশি বিবেচ্য বিষয় হয়, টনিকটা দেখতে বা খেতে কতো সুন্দর ; কারো গন্ধ লজেন্সের মতো, কোনোটা নামী কোম্পানির, কিংবা বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা কোনোটা লেখেন। এছাড়াও টনিক সম্বন্ধে এদের অনেক মজার মজার ধারণা আছে যা কিনা কোম্পানির লিটারেচার থেকে আহরণ করেন ডাক্তারেরা।

কোম্পানির লিটারেচার আর সেলস্-রিপ্রেজেণ্টেটিভদের শেখানো বুলি ! হ্যাঁ, এসব লিটারেচার আর বুলির জন্যই ওষুধ কোম্পানিগুলি লাখ লাখ টাকা খরচ করে। রঙ-বেরঙ-এর ছবি ছাপায়, বোতলের কারুকার্য বাড়ায়, প্যাকিং-এ যুগান্তর আনে। আর হুদো-হুদো টনিকের বোতল সাজিয়ে দেয় ডাক্তারদের টেবিলে (সঙ্গে আরও অনেক কিছু)। সেটা কি স্রেফ এমনিই তারা করে ?

আর দোকানের শো-কেসগুলি দেখেছেন কি ? সেখানেও আমরা কিছু সার্ভে করেছিলাম। দোকানের শো-কেসগুলিতে সাজানো ওষুধের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ওষুধই হলো টনিক, যাতে শো-কেসের সুদৃশ্য বোতলগুলি দেখে আপনি নিজেই উৎসাহিত হতে পারেন।

এই টনিকগুলিতে আর কি কি থাকে ? বি গ্রুপের প্রথম তিনটে ভিটামিন ও বি১ ছাড়া থাকে Pantothenie-A, Inocetol, Biotim, PABA ইত্যাদি। মানুষের আদৌ কখনোও এগুলির অভাব ঘটে কি-না তা এখনো জানা যায় নি। এমনকি বি৬-এরও অভাব বিশেষ বিশেষ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ঘটেনা। ভিটামিন-ডি একমাত্র বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে, যাদের রৌদ্রে রাখা হয় না, কিংবা পর্দানশীন অসূর্যম্পশ্যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিতে পারে ; এদের বাদ দিলে আমাদের দেশের লোকেদের ভিটামিন-ডি-রও অভাব ঘটে না। আর 'হাবিজাবি'-র ভেতর থাকে নানান গ্লিসারো-ফসফেট। এগুলির বিন্দুমাত্রও কোনো উপকার আছে একথা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। কেউ কেউ আবার দেন কিছু কিছু মিনারেল যেগুলির অভাব মানুষের জীবনে কদাচিৎ ঘটে। এমনি করেই বাজারের 'সর্বাপেক্ষা সেরা' উপাধি কেনবার দৌড়ে রঙ-স্বাদ আরো অনেক কিছুর কায়দা-কসরত দেখায় কোম্পানিগুলি—কারণ এসব না করলে, টনিকের

দামও বাড়বে না, নামও বাড়বে না। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, এইসব বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনগুলির পরিমাণ বিভিন্ন টনিকে বিভিন্ন হয়। কে কতো বেশি দিতে পারে তারই একটা প্রতিযোগিতা চলে। যে যার ইচ্ছেমতো এগুলি মেশায় এবং সেই অনুযায়ী দামও করে আকাশচুম্বী। নিচে কয়েকটা নামী টনিকের বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের পরিমাণের নজীর দেখাচ্ছি (কোম্পানি প্রদত্ত ডোজের হিসেব অনুযায়ী একজন সারাদিনে কি পরিমাণ ভিটামিন পাচ্ছেন তার হিসেব)।

সারণি ১

ভিটামিনের দৈনিক প্রয়োজন

বি$_{১}$	বি$_{২}$	বি$_{৬}$	বি$_{১২}$
১.২—২ মি.গ্রা.	১.৩-২.২ মি. গ্রা.	১.৪ মি. গ্রা.	১ মাইক্রোগ্রা.

সারণি ২

অথচ ভিটামিন টনিকগুলিতে ভিটামিনের পরিমাণ

ভিটামিন টনিক	ভিটামিন			
	বি$_{১}$	বি$_{২}$	বি$_{৬}$	বি$_{১২}$
ইউনোভা (Eunova)	৬ মি.গ্রা.	৫ মি.গ্রা.	২ মি.গ্রা.	১৫ মা.গ্রা.
ভিটাহেক্সট (Vitahext)	৪.৫ "	৩ "	১২ "	৩০ "
স্যান্টিভিনি (Santivini)	৯ "	৫ "	৩ "	—
হেমিফস (Hemiphos)	৮ "	৪ "	২ "	৩০ "
বি জি ফস (B G Phos)	৬ "	৩ "	১.৫ "	৪৫ "
ডিজিপ্লেক্স (Digiplex)	১৬ "	২ "	২ "	৮ "

ভিটামিন সি-র যেখানে দৈনিক প্রয়োজন ৩০ থেকে ৫০ মি. গ্রা., সেখানে টনিকওয়ালারা ন্যূনতম ২০০ থেকে ১০০০ মি. গ্রা. মিশিয়ে গেছেন। এতো মাত্র কয়েকটা টনিকের কয়েকটা উপাদানের হিসেব দিলাম, এরকম হাজার হাজার টনিক বাজারে আছে। ইচ্ছে হলে ডাক্তারের কাছে না

গিয়ে সোজা দোকানে গিয়ে টনিক চাইলেই পাওয়া যাবে। ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে আমি পানওয়ালাদের ভিটামিন ট্যাবলেট বিক্রি করতে দেখেছি। দূর দূর গ্রামগঞ্জের মানুষেরা শাকসবজি বিক্রি করে যে পয়সা পায়, যাবার পথে তারই কিছু দিয়ে ভিটামিন বড়ি কিনে নিয়ে যায়—তাতে দৈনন্দিনের চাল-ডাল-তেলের পয়সায় টান পড়লেও—ভিটামিন খাওয়ার ম্যানিয়াটা এতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সাধারণ লোক যেমন 'মানসিক-ভাবে' ভিটামিনের অভাব বোধ করেন, ডাক্তারের মানসিক জগতে তেমনি ভিটামিন বা টনিক লিখবার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই কোনো ভাবনা-চিন্তা ব্যতিরেকেই তারা টনিক লেখেন। এমন কি নিজেরাও খান (অবশ্য পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয় না তাদের), বহু ডাক্তার তার ছেলেমেয়েদের নির্বিচারে টনিক খাওয়ান। এছাড়া ডাক্তারেরা তাদের ব্যবসার স্বার্থেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টনিক লেখেন। যেমন ধরুন আপনার উপসর্গগুলি কোনো বিশেষ রোগের সঙ্গে মেলানো গেল না, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও রোগ ধরা গেল না, মোদ্দা কথা রোগটা যখন বোঝা গেল না কিছুতেই, তখন একটা টনিক দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আবার অনেক ডাক্তারের ধারণা (তাদের প্রাকটিসের অভিজ্ঞতা থেকে) তাদের কাছে বহু রোগী আসেন, সত্যিই যারা কোনো শারীরিক রোগে ভুগছেন না, স্রেফ কম-বেশি মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছেন। তাদের সবাইকেই ডাক্তারদের পক্ষে বুঝিয়ে বলার সময় বা অবস্থা থাকে না। সেখানে একটা কিছু ওষুধ লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এসব ক্ষেত্রে টনিক লেখাটা সবথেকে সুবিধাজনক।

এই টনিকগুলির সুবিধা এইখানেই। টনিকগুলিতে সাধারণত যে সব বি গ্রুপের ভিটামিন থাকে ('এ' এবং 'ডি' ছাড়া) তা আপনি যতো পরিমাণেই খান না কেন, আপনার শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না। অবশ্য মিলিগ্রামের ডোজকে কিলোগ্রাম করলে অন্য কথা। কিন্তু প্রয়োজনের বিশ ত্রিশ গুণ ডোজে খেয়ে গেলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই অপ্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি প্রস্রাব এবং পায়খানার সঙ্গে গিয়ে জমা হবে। ক্ষতি আপনার হচ্ছে না, স্রেফ কিছু পয়সা পকেট থেকে বেরিয়ে গেল আর কি! কিন্তু ফ্যাট সল্যুবল (Fat Soluble) ভিটামিন বেশি পরিমাণে খেলে শরীরের নানান ক্ষতি হতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' খেলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে পারে, চুল উঠে যেতে পারে। গর্ভবতী

মেয়েদের ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, অন্ততপক্ষে প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত ভিটামিন-ডি কিডনী নষ্ট করে দিতে পারে, তাছাড়া কিডনীতে পাথর জমা, খিদে চলে যাওয়া, পেটে ব্যথা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত ভিটামিন-কে সেবনে বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লিভারের গোলমাল এমনকি জণ্ডিস্‌ও হতে পারে। তাই যারা টনিকে আসক্ত তারা একটু সমঝে চলবেন।

ভিটামিন টনিকে একটু-আধটু খিদে যে বাড়ে না বা একটা যে চনমনে ভাব আসে না এমনটা নয়। তার কারণ কিন্তু ভিটামিন নয়, কারণ হলো অ্যালকোহল। হিসেব করে দেখা গেছে, অধিকাংশ টনিকে মদের (অ্যালকোহল) পরিমাণ, 'বিয়ারে'র অ্যালকোহলের পরিমাণের ৫/৬ গুণ। কিছু কিছু টনিকে মদের পরিমাণ রাম-হুইস্কির অনুপাতে রয়েছে। যার ফলে হয়তো এইসব টনিক বার বার খেতে ইচ্ছে করে। খাওয়া বন্ধ করলে অস্বস্তি লাগে। কেউ কেউ আবার এইসব টনিকে এনজাইম মিশিয়ে থাকেন যেমন, বি জি ফস বা ডিজিপ্লেক্স। এগুলি খেলে বিশেষত যারা অম্বলে ভুগছেন তাদের পাকস্থলীতে আলসার হতে পারে। তাছাড়া একজন সাধারণ লোকের এনজাইমের অভাব কদাচিৎই হয়ে থাকে, এই অতিরিক্ত এনজাইম ক্ষতি বই কোনো লাভ দেয় না। কার্যত টনিক খাওয়ার ফলে সাময়িক-উত্তেজনা চনমনে ভাব বহু বিপজ্জনক রোগের উপসর্গকে ঢাকা দিয়ে দিতে পারে। ফলে যথাসময়ে ঐ রোগগুলি, যেমন অগ্ন্যাশয়ের কোনো অসুখ বা পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীর ক্যান্সার ধরা সম্ভব নাও হতে পারে। বহু কোম্পানি বেশ কায়দা করে, প্রচার করে তাদের টনিকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বা লিভার এক্সট্রাক্ট (Liver extract) রয়েছে। এগুলি স্রেফ ভাঁওতাবাজি। লিভারের এক্সট্রাক্ট ব্যবহারের কথা কোনো দেশের ফার্মা-কোপিয়াতে আজ আর নেই, তাছাড়া ঐ এক্সট্রাক্টের উপাদানগুলির স্থায়িত্ব এতো কম যে শেষপর্যন্ত ক্রেতার বোতলে ওটা থাকে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অ্যামাইনো অ্যাসিড চাল-ডাল তরি-তরকারি থেকেই অঢেল পাওয়া সম্ভব। কেউ কেউ আবার ঈস্ট মিশিয়ে টনিকে নতুনত্ব আনে যা আপনি সামান্য একটু দই থেকেই পেতে পারেন। এই ধরনের নানান কারচুপি চলে আসছে টনিকের ব্যবসায়।

আবার এইসব টনিকের ব্যবসায়ে বহুধরনের সুবিধাও রয়েছে। সরকার কর্তৃক যে মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি সমস্ত ওষুধগুলির জন্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে

সেখানে ভিটামিন টনিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে লাভের কোনো উর্ধ্বসীমা নেই। অর্থাৎ যে যতো খুশি দামে বিক্রি করতে পারেন। শুধু প্রয়োজন প্রচারের মাধ্যমে ঐ টনিকটিকে বাজারে দাঁড় করানো। আবার অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে যেমন নির্দিষ্ট ডোজের নির্দেশ রয়েছে, টনিকের বেলায় কিন্তু সে সবের বালাই নেই। যে যা খুশি মতো, যা খুশি মাত্রায় মিশিয়ে টনিক তৈরি করে বাজারে ছাড়ে এবং প্রচারের মাধ্যমে ডাক্তার এবং জনসাধারণ উভয়কেই প্রলুব্ধ করে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করে যে প্রায় সব রোগে বা সব উপসর্গে একে ব্যবহার করা যায়। এভাবেই ফুলে উঠছে টনিকের বাজার, ফুলেফেঁপে উঠছে তাদের লাভের অঙ্ক।

তাই সরকার যখন বারবার অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য জীবনদায়ী ওষুধগুলি তৈরি করার জন্য কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দেন তখন তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, অথচ টনিক তৈরি করার ক্ষেত্রে এদের উৎসাহ আকাশচুম্বী। প্রায় সমস্ত কোম্পানিগুলি আর কিছু তৈরি করুক না করুক কিছু না কিছু ভিটামিন টনিক তৈরি করেই যায়। তাই আমাদের দেশে সমস্ত রকমের যতো ওষুধ তৈরি হয়, তার ১৬·১ শতাংশ হলো এই টনিক বা ভিটামিন ওষুধ। এগুলিতে এদের লাভের পরিমাণ প্রায় কল্পনাতীত। এক বেসরকারি হিসেব মতে এই টনিকগুলিতে লাভের পরিমাণ ন্যূনতম হাজার থেকে কয়েক হাজার শতাংশ। আর তারজন্য কেবল প্রয়োজন রঙিন লিটারেচার, সুদৃশ্য মোড়ক, বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন আর প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে ভিটামিনের এই কৃত্রিম 'অভাব বোধ'টা তৈরি করা।

এ-নিয়ে আজ অবশ্য নানা দেশে সোরগোল উঠছে। এরকম ধান্ধাবাজি আর জোচ্চুরির বিরুদ্ধে আইন গড়ার দাবি উঠছে দেশে দেশে। যেমন, আমেরিকার মানুষদের সোচ্চার দাবিতে কান দিতে বাধ্য হয়ে সেখানকার এফ ডি এ-(Food & Drug Administration) কতকগুলি আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন, যা কি-না এই কোম্পানিগুলির ভিটামিন নিয়ে যথেষ্ট মুনাফালোটার কাজটা ব্যাহত করবে। তারা বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম খাদ্য ইত্যাদিতে ভিটামিনের পরিমাণ যেমন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, তেমনি ভিটামিন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে কী পরিমাণ মেশাতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। সেখানে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যে কেউ যাকে খুশি টনিক প্রেসক্রাইব করতে পারবে না। অর্থাৎ অন্যান্য ওষুধগুলির ক্ষেত্রে যে যে আইন প্রযোজ্য তা ভিটামিনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত

হবে। এরকম একটা আইন আমাদের দেশেও প্রণয়নের চেষ্টা চলেছিল সাতের দশকে এবং সেই অনুযায়ী মাল্‌টিভিটামিন প্রস্তুতকারকদের ওষুধ তালিকা ও মূল্যমান নির্দিষ্ট করতে আদেশ দিয়েছিলেন সরকার। ১৯৭৮ সালে সরকার এ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ঠিকও ছিল, কিন্তু সেটা পেছোতে পেছোতে জুলাই '৭৯ পরে ডিসেম্বর '৭৯ গড়িয়ে যায়। তারপর সব চুপচাপ। আসলে এ ব্যাপারটা ঘটলে কোম্পানিদের অবাধ লোটার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যেতো। ইকনমিক টাইমস্‌-এর এক হিসেব অনুযায়ী এটা

ভারতের একটি হাসপাতালের মহিলা ও প্রসূতি বিভাগের ৯০ জন রোগীর উপর সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই সব রোগীরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর এদের মধ্যে মাত্র ২৬ জন রোগী তাদের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের (হাসপাতালের ছাড়পত্র) ওষুধের তালিকার সবকটি ওষুধ কিনে খেতে পেরেছিলেন (যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজনকে এরজন্য ঋণ করতে হয়েছিল)। আর ৩৭ জন তালিকার প্রথম দু-তিনটে ওষুধ মাত্র কিনতে পেরেছিলেন। বাকিরা একদমই কোনো ওষুধ খান নি মূলত পয়সার অভাবে। এই ওষুধের তালিকাগুলি সবকটি ছিল প্রায় একই ধাঁচের—বেশ দীর্ঘ, যার প্রথম দু-তিনটি ওষুধ ছিল অবশ্যই টনিক কিংবা ভিটামিনের ক্যাপসুল। বহুক্ষেত্রেই মূল প্রয়োজনীয় ওষুধটিকে তালিকার ৪ বা ৫ নম্বর অবস্থানে লেখা হয়েছিল।

সূত্র: Health care which way to go ; M F C

ঘটলে ৬৮টি বড়ো ও মাঝারি মাপের ওষুধ কোম্পানি ঘা খেতো। এদের মধ্যে আবার ২৪টা ছিল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি, তাদের কব্‌জির জোর যে অনেক বেশি তা বলাই বাহুল্য। আজ তাই নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, ব্যাপক জনসাধারণ যদি এগিয়ে না আসেন, যদি বলিষ্ঠ জনমত না গড়ে ওঠে জালজুয়াচুরির বিরুদ্ধে তবে ওষুধ কোম্পানিগুলি একইধারায় মুনাফা লুটে যাবে, তাদের অন্যায়, অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের শিকার হতে হবে দরিদ্র জনসাধারণকে।

সূত্র :
1. Clinical Pharmacology ; D. R. Lawrence
2. In Search of Diagnosis ; M F C Publication
3. Davidson's Principles and Practice of Medicine ; John Macleo
4. British Journal of Preventive and Social Medicine (77,31)
5. Health and Society ; (2nd issue), 1980
6. সুস্বাস্থ্যের জন্য টনিক নয় খাদ্য চাই ; সবার জন্য স্বাস্থ্য সিরিজ (বাংলাদেশ)
7. CIMS ; May'86

□ স্মরজিৎ জানা

গ্লুকোজ—নিমেষে শক্তি

এক চামচ প্যাকেট থেকে তুলুন, দেখবেন মুক্তোর মতো সাদা। মুখে দিন দেখবেন কড়া নয় বরং অল্প অল্প মিঠে। মুখেই গলে যাচ্ছে আর রেখে যাচ্ছে অপূর্ব একটা ঠাণ্ডা আমেজ। বেশ খেতে।

মিষ্টি খাবারের প্রতি আমাদের সবারই কমবেশি আকর্ষণ রয়েছে। গ্লুকোজ তেমন একটি সামগ্রী। কিন্তু গ্লুকোজ যদি শুধু স্বাদের খাতিরেই ব্যবহৃত হতো, তাহলে হয়তো কিছু বলার থাকতো না। এমন বহু খাবারই তো রয়েছে বাজারে।

গ্লুকোজের আলাদা খাতির পথ্য হিসেবে, শক্তির আধার হিসেবে, কারো কারো কাছে আবার ওষুধ হিসেবেও। পুষ্টি সম্পর্কে আমাদের মতো শিক্ষিত লোকেরও জ্ঞান ভাসা ভাসা। টিনজাত আর প্যাকেটে ভর্তি খাবারগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে খবর কম। আসলে এসব সম্পর্কে ইচ্ছে করেই খবর প্রকাশ করাও হয় কম। এই সুযোগে পুষ্টি ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এ, সংবাদপত্রে এবং নানা পত্রিকায়, রেডিওতে টিভিতে এমনকি সিনেমাতেও ক্রমাগত প্রচার করে চলেছে—'চুমুকেই শক্তি' ...'নিমেষে আরাম'...'আরো শক্তি বেশি দেয়'...। প্রচারে সবচেয়ে টেক্কা

দিয়েছে গ্ল্যাক্সো কোম্পানি। সুচতুরা গৃহিণী, মেধাবী ছাত্র, সদ্য-প্রসবা মায়েরা, অসুস্থ সন্তানের অভিভাবক, রোগ থেকে সেরে ওঠা দাদু, সবাই তাদের শিকার।

গ্ল্যাক্‌সোজ-ডি এখন পাওয়া যাচ্ছে গ্লুকন-ডি নামে। প্যাকেটের মধ্যে যা আছে তা এক কথায় গ্লুকোজ-ডি। আরো ভেঙে বললে, চার-শ' গ্রামের প্যাকেটে আছে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (Dextrose monohydrate) ৩৯৭·৬০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬৮০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৪০০ মিলিগ্রাম, আর আছে ভিটামিন-ডি। দাম ১৩ টাকা ২৪ পয়সা, সঙ্গে লেজুড় স্থানীয় কর। এই মূল্যের বদলে পাওয়া যাচ্ছে মোটামুটি একজন খাটিয়ে মানুষের অর্ধেক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি—১,৪৪০ কিলো ক্যালরি।

যদিও আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে তবুও গ্লুকন-ডি-তে অনাবশ্যক ক্যালসিয়াম যোগ করা হয়েছে। আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রচুর সূর্যের আলো গায়ে পড়ছে সেখানে বাইরে থেকে ভিটামিন-ডি দেওয়া বোকামি না শঠতা? (সূর্যের আলো গায়ে পড়লে আমাদের চামড়াতেই ভিটামিন-ডি তৈরি হয়।) আমাদের রোজকার খাবারে যে ফসফরাসের যোগান পাওয়া যায় তা যথেষ্ট। ইদানীং 'গ্লুকন-সি'ও বাজারে এসে গেছে যাতে গ্লুকোজ-এর সঙ্গে ভিটামিন-সি যুক্ত হয়েছে। এটাও আর এক ধাপ্পাবাজি। সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য থেকেই যথেষ্ট ভিটামিন-সি পেয়ে থাকি। অতিরিক্ত ভিটামিন-সি খেলে শরীরে জমা হয় না বরং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। আর এই প্যাকেটের গ্লুকোজে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি থাকে সমান ওজনের টমাটো বা কমলালেবু বা আমলকিতেও তার থেকে বেশি থাকে।

*　　*　　*

যা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই গ্লুকোজ নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। আমাদের খাবারের অধিকাংশই শর্করাজাতীয় (কার্বোহাইড্রেট)। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা আলু, তরকারি ইত্যাদি যা-ই খাই না কেন তা হজম হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজে (Monosaccharide) পরিণত হয়। খাদ্য এই গ্লুকোজের অবস্থাতে পৌঁছে তবেই ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়াল থেকে দেহ একে রক্তে শুষে নিতে পারে। রক্ত এই গ্লুকোজের যোগান দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। সেই গ্লুকোজ বিপাক ক্রিয়ার (Metabolism) নানা ধাপের মধ্যে দিয়ে পুড়ে শক্তির উপাদান হয়। দেহের প্রতিটি কোষের

প্রতি মুহূর্তের কাজকর্মের জন্য প্রয়োজন এই শক্তির। এর দৌলতেই আমাদের দেহ-ইঞ্জিন কাজ করতে পারে। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা তো বটেই কাজের সময় গা যে গরম হয়ে ওঠে তাও ঐ গ্লুকোজ পুড়ে। সাধারণত সারাদিনের খাটুনিতে রক্তের গ্লুকোজ কমে যায়, তবে একেবারে শেষ হয় না। এখন, এই হারানো শক্তি পূরণ করতে গ্লুকোজ-ডি খাওয়ার যৌক্তিকতা কতোটুকু?

নিমেষে নয়, গ্লুকোজ খাবার পর তা রক্তে পৌঁছায় মিনিট পনেরো পরে। অন্যদিকে আমরা যে চিনি খাই তা রক্তে পৌঁছতে লাগে প্রায় আধঘণ্টা। চিনির রক্তে যেতে বেশি সময় লাগার কারণ চিনি (Sucrose) গ্লুকোজের থেকে গঠনের দিক দিয়ে একধাপ বেশি জটিল (অর্থাৎ হজমের সময় চিনি ভাঙার পরই গ্লুকোজ তৈরি হয়)। গ্লুকোজ যতোটা শক্তি উৎপাদন করতে পারে সমপরিমাণ চিনিও ততোটাই শক্তি দেবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে ৪০০ গ্রাম গ্লুকোজের দাম ১৩ টাকার কিছু বেশি, অন্যদিকে ৪০০ গ্রাম চিনির দাম মাত্র ২ টাকা। (১৯৮৩-এর বাজার দর অনুযায়ী) দেখা গেল শক্তি যোগানোর ক্ষমতার মাপকাঠিতে গ্লুকোজ এবং চিনি সমান। পড়ে থাকলো শুধু নিমেষে শক্তির প্রশ্নটা। মিনিট ১৫ আগে ক্লান্তি দূর করতে আমরা কি অতিরিক্ত ১১ টাকা খরচ করতে রাজি আছি?

কারখানায় গ্লুকোজ তৈরি হয় শর্করার (গুড়, আলু ইত্যাদি) সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে। বিক্রিয়ার পর বেরোয় কালো, দুর্গন্ধযুক্ত পোড়া একটা বস্তু। এরপর সেটাকে ছেঁকে, গন্ধমুক্ত করে, রঙ ব্লিচ্ (Bleach) করে রসায়নবিদ্‌রা উপহার দেন ওই সাদা ধপ্‌ধপে গুঁড়ো গ্লুকোজ। এভাবে তৈরি গ্লুকোজ স্রেফ একটি শর্করা। এতে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যগুণ কিছুই নেই (অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে এসব অল্পবিস্তর থাকে)। চিনির ভূমিকাও একই, কিন্তু চিনি গ্লুকোজের থেকে অনেক সস্তা।

'অসুস্থতায় বা অসুখ সেরে গেলে' গ্লুকোজ-ডি এর কি কোনো প্রয়োজন নেই? এ প্রশ্নের উত্তরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু রোগের অধ্যাপক হিউ জোলী লিখেছেন—"চিনি শক্তি যোগায় এবং সাধারণ চিনি গ্লুকোজেই পরিণত হবে। সুতরাং এতো পয়সা খরচ করে গ্লুকোজের সরবৎ কেনা অপ্রয়োজনীয়।"

তাই ক্লান্তিতে সামান্য লেবু, নুন দিয়ে চিনির সরবৎ সমান উপকারী তো বটেই উপরন্তু লেবুর রসে বাড়তি কিছু ভিটামিন পেতে পারেন আপনি।

অত্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তি যিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন অথবা কোনো কারণে মুখ দিয়ে খেতে পারছেন না সেইক্ষেত্রে সরাসরি শিরায় গ্লুকোজের দরকার রয়েছে। এছাড়া রোগ থেকে ওঠার পর অথবা প্রাত্যহিক ক্লান্তিতে গ্লুকোজ-ডি কিনে খাবার কোনোই যুক্তি নেই।

সরাসরি শিরায় গ্লুকোজ দেওয়াটা বেশ কিছু গ্রামের মানুষের কাছে অবশ্য দাওয়াই হিসেবে পরিণত। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন ধরনের রোগে (তা সে দুর্বলতা, গাঁটব্যথা, জ্বর এমন বহুবিধ কারণে) হাতের শিরা ফুটিয়ে ৫০ বা ১০০ সি সি গ্লুকোজের ইনজেকশন দেন, পরিবর্তে দক্ষিণা হিসাবে বেশ বড় দাঁও মারেন। মজার ব্যাপার হলো গ্লুকোজের কোনো রোগ সারাবার ক্ষমতা নেই। আর ঐ ১০০ সিসি বা এক বোতলে যে পরিমাণ গ্লুকোজ থাকে (২৭ গ্রাম) তা এক মুঠো চিনিতেই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা খবর দেওয়া দরকার মনে করছি। অনেকেই মনে করেন যে, চিনির থেকে মিছরি শরীরের পক্ষে বেশি ভাল। চিনি ও মিছরির মধ্যে দ্রব্যগুণের কোনো তফাৎ নেই। মিছরি একটা বড় আকারের চিনি। এর কেলাসের (Crystal) আকার বড় কারণ এর অণুতে জলের পরিমাণ বেশি। চিনির থেকেও মিষ্টি স্যাকারিন। কিন্তু স্যাকারিন গ্লুকোজ, চিনি-মিছরি জাতের কেউ নয় (কার্বোহাইডেট নয়), সম্পূর্ণ ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। স্যাকারিন না দেয় শক্তি, না দেয় পুষ্টি।

অন্যদিকে ফলের রসে গ্লুকোজের সঙ্গে আছে কিছু পরিমাণ খাদ্যগুণ। চিনি আর গুড়ের তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে গুড়ের খাদ্যগুণ অনেক বেশি।

এতো গেল গ্লুকোজের শুধু প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তার কথা। 'উজ্জ্বল স্বাস্থ্য' এবং 'চনমনে চাঙ্গা' হবার জন্য নিয়মিত গ্লুকোজ খাওয়ার বিপদও রয়েছে কিন্তু। শর্করা খাবার কিভাবে রক্তে পৌঁছায় তা আগেই

প্রতি ১০০ গ্রাম	শর্করা (গ্রা.)	প্রোটিন (গ্রা.)	চর্বি (গ্রা.)	খনিজ (গ্রা.)	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	লোহা (মি.গ্রা.)	ফসফরাস (মি.গ্রা.)	শক্তি (কিলো ক্যালরি)
আখের গুড়	৯৫	০ ৪	০.১	০.৬	৮০	১১.৪	৪০	৩৮৩
খেজুরের গুড়	৮৬.১	১.৫	০ ৩	২ ৬	৩৬৩	—	৬২	৩৫৩
গ্লুকোজ	১০০	—	—	—	—	—	—	৩৬০
চিনি (বিশুদ্ধ)	১০০	—	—	—	—	—	—	৩৬০

বলেছি। আমাদের রক্তে সব সময়ই কিছু গ্লুকোজ থাকে। রক্তে এই মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন (Insulin) নামে একটি হরমোন। (রক্তে এই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমরা তাকে'ডায়াবিটিস মেলাইটাস' বলি।) ইনসুলিন বেরোয় অগ্ন্যাশয় (Pancreas) থেকে। এখন যদি কোনো মানুষ যার হজম শক্তি ঠিক আছে, বেশ খানিকটা গ্লুকোজ খান তবে সরাসরি তা রক্তে ঢুকবে এবং হঠাৎই তার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাবে (অন্যান্য শর্করার বেলায় এ ঘটনা ঘটে না কারণ সেগুলি হজম হতে সময় নেবে এবং রক্তে গ্লুকোজ আসবে ধীরে ধীরে), ফলে ইনসুলিন দরকার হবে বেশি, অগ্ন্যাশয়ের কাজ যাবে বেড়ে। প্রায় আধ-ডজন অগ্ন্যাশয়ের কাজ একটা অগ্ন্যাশয়কে করতে হবে। ফল হবে মারাত্মক। বিড়ালের ওপর পরীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এই বাড়তি গ্লুকোজ ডায়াবিটিস তৈরি করে এবং অগ্ন্যাশয়ের কোষ ধ্বংস করে। মানুষের ক্ষেত্রেও অগ্ন্যাশয়ের ওপর বারংবার এরকম চাপ পড়লে তার ফলও ভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে। প্রাত্যহিক শর্করা জাতীয় (ভাত, রুটি, তরি-তরকারি ইত্যাদি) খাবারের সঙ্গে যদি আবার গ্লুকোজ খাওয়া যায় তবে রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সব থেকে আশঙ্কার কথাটাই এখনও বলা হয় নি, তা হলো বিজ্ঞাপন ও আমাদের রুচির পরিবর্তন—"কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছেন, কিম্বা বাচ্চারা খেলাধূলা করে ক্লান্ত···তখন আপনার প্রয়োজন গ্লুকোজ··· ।" অর্থাৎ আপনার ক্লান্তি বা পরিশ্রম আর কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এও যেন একটা রোগ যার চিকিৎসা প্রয়োজন। এবং ওষুধটা গ্লুকোজ। এমনি বহু স্বাভাবিক ব্যাপার আর স্বাভাবিক থাকছে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সমাজ-সংসারের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কাটে। সাধারণ-ভাবে দুঃখ-বেদনা-আনন্দ-উচ্ছাস-ক্লান্তি-বিরক্তি কিংবা আরাম ইত্যাদি হলো এগুলির সাধারণ প্রকাশ। সামাজিক একজন মানুষের জীবনে অল্প-বিস্তর এগুলি ঘটবেই। আবার সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমেই দুঃখ থেকে সুখ, ক্লান্তি-নৈরাশ্য থেকে আনন্দ বা আরামের সন্ধানে আমরা যাই। কিন্তু ক্রমশই দেখা যাচ্ছে এসমস্ত কিছুই আর সাধারণ, স্বাভাবিকের সীমানায় ধরা হচ্ছে না। আপনার মন অবসাদে ভারাক্রান্ত অতএব একটি মন ভাল করার (Mood Elevator) ট্যাবলেট খান। ঘুম আসছে না—ঘুমের বড়ি ; ক্লান্তি বোধ করছেন—টনিক ; খেলাধূলো বা কাজকর্মের

পরে পরিশ্রান্ত—রয়েছে গ্লুকোজ। মানুষের এমনি বহু অনুভূতি এবং তার প্রকাশকে ব্যবসার খাতিরে চিকিৎসার আঙ্গিনায় টেনে আনা হচ্ছে—অত্যন্ত সুচতুরভাবে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম তার বড় হাতিয়ার। জন্ম দেওয়া হচ্ছে এক নতুন সর্বনাশা স্বাস্থ্যচর্চার (Health culture)। সেই প্রক্রিয়ার মাত্র একটা উদাহরণ হলো এই গ্লুকোজ খাওয়ানো। সেদিন বোধ হয় বেশি দেরি নেই যখন দেখবো আমাদের চাওয়া, ভালোলাগা আর আমাদের নয়। যুক্তি বুদ্ধি পছন্দ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে বিজ্ঞাপন। তাই এখনই বোধ হয় সতর্ক হবার ঠিক সময়।

সূত্র :

1. Foods Drugs & Cosmetics ; Thakkamma Jacob
2. মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ), ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
3. Nutritive value of Indian Foods ; National Institute of Nutrition I C M R, Hydrabad
4. Review of Medical Physiology ; Ganong
5. Glucon D-র প্যাকেটে লেখা তথ্য

□ স্মরজিৎ জানা

হরলিকস কতো শক্তি বেশি দেয়

বাড়িতে ঢুকতেই দশ বছরের খুড়তুতো ভাই পিঙ্কা চেঁচিয়ে জানালো—"দাদা একটা T পেয়েছি, এবার একটা V পেলেই একটা TV।" প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। টুলটুল টেবিলে পড়ছিল। পাশে একটা তাকে হরলিকসের বোতল, চামচ, চিনি আর গ্লাস দেখে পিঙ্কার কথার মানেটা উদ্ধার করতে পারলাম। হরলিকস কোম্পানি বিক্রি বাড়াবার জন্য TV দেবার টাপ ফেলেছে। সেরকমই একটা হরলিকসের ঢাকনার তলায় ছাপার অক্ষরে T পেয়ে পিঙ্কা আনন্দে লাফাচ্ছে।

টুলটুল এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। টেস্ট হয়ে গেছে। এই চাপের সময় মেয়ের বাড়তি পুষ্টির জন্য একটা ৪৫০ গ্রামের হরলিকসের শিশি কিনে এনেছেন কাকু। কিনে এনেই ক্ষান্ত হন নি, পিঙ্কা আর বুলুন যাতে ওতে ভাগ না বসায় সেদিকে কড়া নজর রাখছেন। টুলটুলের এই সুসময়েও সময় মতো হরলিক্স না খাবার জন্য মৃদু বকুনিও জুটছে।

কাকিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। বললাম, "হরলিকস কোম্পানি কি 'শক্তি বেশি দেয়'-এর সঙ্গে 'বুদ্ধি'ও বেশি দিচ্ছে নাকি?" কাকিমা রেগে উঠে বললেন "দেখ্, ঠাট্টা করিস না। তোর কাকু বললেন, হরলিকসটা ভালো। টুলটুল রাত জেগে পড়ছে, এসময় ওর ওটা খাওয়া উচিত।"

"তার জন্য হরলিকস কেন? কি আছে ওতে?"

"অতোশতো জানি না বাপু, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ডাক্তাররাও তো দেয় দেখি।"

সেদিন এক ছোট ডাক্তার—হাউসস্টাফ দাদাকে চেপে ধরেছিলাম। সে তো গাঁই-গুঁই করে বলল, "ঐ যবের ছাতু, আটা আর কি সব যেন আছে। আহামরি তেমন কিছু নয়।"

"তাহলে ফিজীসিয়ানরা খেতে বলেন কেন?"

"যা রোজ খান তাই পেট ভরে খাবেন—বললে লোকে খুব একটা সন্তুষ্ট হয় না। কিছু একটা তো দিতে হবে। হাজার হোক পয়সা দিয়ে

পরামর্শ নিতে এসেছে তাই ওই হরলিকস, কমপ্লান, ওভালটিন•••প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে বসলেই বুঝবি ব্যাপারটা।"

এভাবেই চলছে, বুঝলেন। সেদিন এক মেডিকেল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দাদার কাছে ওটা পেয়ে গেলাম। তিন ভাঁজ করা একটা কার্ডবোর্ড হরলিকসের শিশির মাপে কাটা। প্রথম পাতায় শিশির ছবি, বাকি পাতা ধরে রয়েছে হরলিকসের গুণাগুণ, উপাদান, তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা।

বিজ্ঞাপনের ভাষায় হরলিকস তৈরি হয় মল্টেড বার্লি, দুধ আর সোনালী গমের দানা থেকে। আর্দ্র পরিবেশে যে কোনো শস্যের বীজের সীমিত অংকুরোদ্‌গমকে বলে 'মল্ট'। গ্যাঁজানো বার্লির দানাকে শুকিয়ে নিয়ে কলে গুঁড়ো করা হয়। এর সঙ্গে গমের আটা আর গরম জল মিশিয়ে এক মণ্ড বানানো হয়। এই মণ্ড ভাল করে ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে মেশানো হয় পরিমাণ মতো খনিজ লবণ আর দুধ। এই তরল আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিলেই পাওয়া যায় গুঁড়ো হরলিকস। এই ধরনের খাবারের বিশেষ কড়া গন্ধের কারণ ঐ 'মল্ট'।

এতো কিছু থাকতে বার্লি কেন? এদেশে বার্লির চাষ খুব বেশি হয়



না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ-ই এর প্রধান উৎপাদক। বার্লিতে গ্লুটেন কম পরিমাণে থাকে বলে বার্লি থেকে পাঁউরুটি বানানো যায় না। তাই মূল খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। বার্লি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় মদ তৈরিতে। বিকল্প পথ হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এই বোতলবন্দী তথাকথিত পুষ্টি—হরলিকস, ভিভা, ওভালটিন তৈরি করছে আর তৃতীয় বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলছে।

বহুজাতিক কোম্পানি বিচাম (Beecham) হরলিকস তৈরি করে। এদেশে 'হিন্দুস্থান মিল্কফুড ম্যানুফ্যাকচারাস''কে ৪০ ভাগ শেয়ার বেচে দিয়ে হরলিকসকে 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' করা হয়েছে।

মূলত দু-ভাবে হরলিকস-এর ব্যবহার হয়। এক, রোগীর পথ্য হিসেবে। দুই, স্বাস্থ্যবান হবার বাসনায় নিয়মিত পানীয় হিসেবে। শক্তির প্রতি আকর্ষণ আর সুন্দর দেহের অধিকারী হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। আমার সন্তান একটু মোটাসোটা হবে, আমার শরীরে একটু লাবণ্য ফিরবে—এ-চাওয়াতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু তার জন্য কারখানার তৈরি হরলিকস লাগবে কেন ? কি এমন যাদুকরী গুণ আছে এতে যা আর অন্য কোনো খাবারে নেই ?

১৭·৪০ টাকার সঙ্গে স্থানীয় কর দিয়ে কেনা (১৯৮৩ সালের বাজার দর হিসেবে) ৪৫০ গ্রাম হরলিকসের বোতলে আসলে আছে—

খাদ্যবস্তু	ওজন (গ্রাম)
আমিষ* (প্রোটিন)	৬৩·০০
চর্বি	৩৩·৭৫
শর্করা	৩২৫·৮০
খনিজ	১৬·২০
জলীয় অংশ	১১·২৫
মোট	৪৫০·০০

সব মিলিয়ে শক্তি পাওয়া যাবে ১৭৭৭·০৫ কিলো ক্যালরি।

* এই লেখায় আমিষ শব্দটি 'প্রোটিন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

একজন মাঝারি খাটা-খাটনি করেন এমন পুরুষের (ওজন ৫৫ কিলো গ্রাম) দিনে শক্তি দরকার ২৮০০ কিলো ক্যালরি। একজন মাঝারি খাটা-খাটনি করেন এমন মহিলার (ওজন ৪৫ কিলো গ্রাম) দরকার ২২০০ কিলো ক্যালরি। একজন কিশোরের (বয়স ১৩-১৫ বছর) দরকার ২৫০০ কিলো ক্যালরি, কিশোরীর ২২০০ কিলো ক্যালরি। একজন ৪-৬ বছরের বাচ্চার দিনে দরকার ১৫০০ কিলো ক্যালরি। দেখা যাচ্ছে ১৮ টাকা দিয়ে এক বোতল হরলিকসে আমরা একজন ৪-৬ বছরের শিশুর এক-দিনের শক্তি যোগাতে পারছি। অন্যদিকে ১৮ টাকা দিয়ে একজন জোয়ান মানুষকে আমরা দু-দিন পেট ভরে খাবার দিতে পারবো।

কিন্তু হরলিকস তো আমরা প্রধান খাবার হিসেবে খাই না। খাই প্রতিদিনের খাবারের সঙ্গে কিছু বাড়তি পুষ্টি যোগ করতে। সেই পুষ্টির হিসেবটাই নেওয়া যাক।

১০০ গ্রাম হরলিকসের সঙ্গে আমাদের অতি চেনা কয়েকটা খাবারের খাদ্যগুণের তুলনা করা যাক *।

খাবারের নাম	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	খনিজ	শক্তি
	(গ্রাম / ১০০ গ্রামে)				(কিলো ক্যালরি)
হরলিকস	১৪.০	৭.৫	৭২.৪	৩.৬	৩৯৫
চাল (সেদ্ধ)	৮.৫	০.৬	৭৭.৪	০.৯	৩৪৯
আটা (গমের)	১২.৭	১.৭	৬৯.৪	২.৭	৩৪১
মুসুরির ডাল	২৫.১	০.৭	৫৯.০	২.১	৩৪৩
মুগ ডাল	২৪.৫	১.২	৫৯.৯	৩.৫	৩৪৮
আলু	১.৬	০.১	২২.৬	০.৬	৯৭
দুধ	৩.২	৪.১	৪.৪	০.৮	৬৭
হাঁসের ডিম	১৩.৫	১৩.৭	০.৮	১.০	১৪১
মুরগীর ডিম	১৩.৩	১৩.৩	—	১.০	১৭৩
মাছ (পুঁটি)	১৮.১	২.৪	৩.১	১.৪	১০৬
কলা	১.২	০.৩	২৭.২	০.৮	১১৬
ছোলা	১৭.১	৫.৩	৬০.৯	৩.০	৩৬০
বাদাম	২৬.৭	৪০.১	২৬.১	২.৪	৫৬৭

* ১৯৮৩ সালের হিসেব অনুযায়ী

১০০ গ্রাম হরলিকসের দাম পড়ছে চার টাকার কিছু বেশি। ওপরের তালিকা থেকে এটা বলা যায় ৫০০ গ্রাম দুধ ১০০ গ্রাম হরলিকসের সমান প্রোটিন ও শক্তি যোগাচ্ছে, দাম পড়ছে প্রায় অর্ধেক। ১০০ গ্রাম আটার রুটি দিয়ে ১০০ গ্রাম আলুর তরকারি খেলে সমান প্রোটিন এবং অনেক বেশি শক্তি পাচ্ছি। জ্বালানি খরচ ধরে দাম পড়ছে ১০০ গ্রাম হরলিকসের তিন ভাগের এক ভাগ। ১০০ গ্রাম ডালের সঙ্গে ১০০ গ্রাম চালের ভাত দ্বিগুণ প্রোটিন ও শক্তি দেবে অর্ধেক দামে। দুটো ডিম আর দুটো কলাও ১০০ গ্রাম হরলিকসের থেকে সস্তা কিন্তু প্রায় সমান প্রোটিন ও শক্তি দেবে। অন্যদিকে ডিমের প্রোটিন হরলিকসের প্রোটিনের থেকে গুণগত মানে অনেক ভালো। ১০০ গ্রাম ছোলা বা বাদাম (ভাজা বা সেদ্ধ) ১০০ গ্রাম হরলিকসের থেকে বেশি প্রোটিন ও শক্তি দেয়। এইভাবে প্রতিদিনের খাবারের একটার সঙ্গে অন্যটা মিশিয়ে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায় যা খাদ্যগুণে হরলিকসের থেকে কম তো নয়ই বরং বেশি এবং দামে সস্তা। হিসেবটা হরলিকস ধরে করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভিভা, বোর্নভিটা ইত্যাদির বেলায়ও একইভাবে করা সম্ভব এবং সেখানেও একই চিত্র ধরা পড়বে।

প্রতিদিন আমরা যে-খাবার খাই তার মধ্যে বেশিরভাগটাই শর্করা, খানিকটা প্রোটিন আর চর্বিও রয়েছে। আর আছে সামান্য খনিজ লবণ, ভিটামিন এবং প্রচুর পরিমাণে জল। স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তির যোগান আসে শর্করা থেকে। প্রোটিন বা আমিষের কাজ শরীর তৈরি করা বা শরীরের ক্ষয় পূরণ করা। দেহ-কোষের প্রধান উপাদান প্রোটিন। দেহ গঠনের প্রধান উপাদান বলেই আমিষের এতো চাহিদা। অথচ দেহ কি কি খাবার থেকে আমিষ পাচ্ছে, কতোটুকু বা রোজ দরকার, সে-ব্যাপারে আমরা অন্ধকারেই পড়ে আছি। ধারণা করে বসে আছি, মাছ-মাংস ইত্যাদি না খেলে দেহের পুষ্টি হয় না। আর এসব না পেলে বা কম পেলে হরলিকস জাতীয় পুষ্টি কিনছি।

প্রোটিনের প্রধান উৎস মাংস নয়, সবজি। মাংসের প্রোটিনও গাছ-পালা—মূলত সবুজ পাতা ও ঘাস থেকে আসে। বিশ্বের প্রধান খাদ্য সমূহের প্রোটিনও প্রথমে পাতায় তৈরি হয়, পরে তা বীজে (ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, সীম প্রভৃতি) স্থানান্তরিত হয়। পেট ভরে খাবার খেলে চালের থেকে যে আমিষ পাওয়া যায়, তা আমাদের দেশের লোকদের জন্য পর্যাপ্ত। পুষ্টিবিদ্ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের গবেষণা-ব্যয়ের এক বিরাট

অংক বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করে থাকে। বহুজাতিক ব্যবসায়ী পুষ্টিবিজ্ঞানীরা অর্ধ-শতাব্দী ধরে মানুষের প্রয়োজন হিসেবে অতিরিক্ত প্রোটিনের পরিমাণ ধার্য করেছেন। তারাই এই আমিষ খাবার হিড়িক তুলেছিলেন।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোনাল্ড এস. ম্যাকলারেন, ভারতীয় পুষ্টিবিজ্ঞানী অধ্যাপক পি. ভি. সুকতম ও অন্যান্য পুষ্টিবিদ্‌দের অবিচল সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঘোষণা করেন যে, শিশুদের প্রতি কিলো গ্রাম ওজনের জন্য ১.২ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। বয়স্কদের প্রতি কিলো গ্রাম ওজনের জন্য দরকার ০.৬ গ্রাম। এদেশের পুরুষদের গড়পড়তা ওজন ৫৫-৬৫ কিলো গ্রাম। মহিলাদের ওজন আরও কম। ওজন অনুযায়ী দিনে ৩৫-৪৫ গ্রাম প্রোটিন যথেষ্ট। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের বাড়তি প্রোটিন খাওয়া দরকার। চাল, ডাল, রুটি ও সবজি-ই আমাদের পর্যাপ্ত প্রোটিন দিতে পারে। যেটা প্রয়োজন, সেটা হলো এই খাবারগুলিই পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পাওয়া।

বিজ্ঞাপনে হরলিকসের নানা দেশে নানা রূপ। আমাদের দেশে হরলিকস 'পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়'—'The Great Nourisher', কিন্তু ব্রিটেনে হরলিকস—'food drink of the night' অর্থাৎ ঘুমাতে যাবার আগে পানীয় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ওদেশে বলা হয়—'Horlicks helps you relax into the proper rhythm of sleep'—এরও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে হরলিকসের বোতলের গায়ে প্রচার করা হতো—'Twice as good as milk'—দুধের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল। ভারত সরকারের নির্দেশে হিন্দুস্থান মিল্কফুড ম্যানুফ্যাকচারার্স এ-জাতীয় মিথ্যা প্রচার এখন বন্ধ করেছে। কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান কায়দায় প্রচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বোর্নভিটা এই ক-দিন আগেও প্রচার করতো—সুস্থ, কর্মঠ আর চটপটে করে তুলতে নাকি এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের মতো দেশে যেখানে অপুষ্টি ও দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী সেখানে ছলে-বলে-কৌশলে পুষ্টি বা শক্তির কথাটা জুড়ে দিতে পারলে বাজার মাত্‌ করা সহজ হয়ে যায়। শুধু এই প্রচারের দৌলতে আমাদের দেশের শক্তি পানীয়ের ৫৩% বাজার দখলে রেখেছে হরলিকস আর ২৫% হলো বোর্নভিটা। আর এরা দু-জনে মিলে প্রচারের দরুন বছরে

খরচ করে ১ কোটি টাকা। এই প্রচারের কৌশলে এই ধরনের স্বাস্থ্য-পানীয়গুলি এদেশে 'প্রেস্টিজ ফুড' হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই কায়ক্লেশে যারা সংসার চালাচ্ছে তারাও প্রচুর পয়সা খরচ করে কিনে আনছে এই-সব পানীয়, তাদের বাচ্চাদের জন্য। কলকাতায় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মূলত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বেশি বেশি করে হরলিকস ও বোর্নভিটা কিনে থাকেন।

হরলিকস খাওয়ার আর একটা যুক্তি—'ডাক্তারবাবুরা হরলিকস খেতে বলেন।' সম্প্রতি সিনেমার পর্দায় দেখছি এক ডাক্তারবাবু বলছেন—"আমি খাব না !! আমি তো হরদম প্রেসক্রাইব করছি—দিনে দু-বার।" এবং আমরা জানি যে, যারা বিজ্ঞাপনে অংশ নেন তারা কোম্পানির তরফ থেকে যা বলতে বলেন তাই আউড়ে যান এবং তার বদলে মোটা পারিশ্রমিক পান। শুধু যে শিক্ষার অপূর্ণতা আর ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ডাক্তাররা হরলিকস খেতে বলেন তা নয়, অনেকেই ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখেন না। অনেকে ব্যবসায় নেমে, ব্যবসায়িক নিয়মের বাইরে যেতে চান না।

'হিন্দুস্থান মিল্কফুড ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড' কোম্পানির জাতীয় বিক্রয় অধিকর্তা (national sales director) এ. কে. সরকারের কাছ থেকে জানা যায় যে, কোম্পানি বড়ো বড়ো শহরের ডাক্তারদের একটা তালিকা রাখেন এবং তাদের পসার অনুযায়ী কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেণ্টে-টিভরা তাদের সঙ্গে বছরে চারবার পর্যন্তও দেখা করেন। বার বার কোম্পানির তরফ থেকে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করার কারণ নাকি—'ডাক্তাররা প্রায়ই ভুলে যান'।

ব্যক্তিগত চেম্বারে যাওয়া ছাড়াও, এই ধরনের কোম্পানিগুলি ডাক্তার এবং ডাক্তারী ছাত্রছাত্রীদের নানা সেমিনার, কনফারেন্স, বিচিত্রানুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করেন (sponsor)। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পূর্ব ভারতে হরলিকসের চল বেশি। এদিকে দুধের উৎপাদন কম। যেহেতু হরলিকস শুধু জলে গুলেই খাওয়া যায় তাই অনেকেই একে দুধের বিকল্প হিসেবে দেখেন।

এদেশে না খেতে পেয়ে মারা যায় অনেকে। তার থেকেও বেশি লোক আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে। অপুষ্টি আছে বলে খাবার নিয়ে আমাদের এতো ভাবনা। সেই সব 'নুন আনতে পান্তা ফুরানো' ঘরের তাকে হরলিকস প্রমাণ করে ঘরে অপুষ্টি রয়েছে। অন্তত অপুষ্টির ভয় রয়েছে। পেট ভরে খেতে না পাবার আসল কারণে না গিয়ে একটা বোতল দিয়ে তা

আড়াল করার চেষ্টা বোকামী এবং এর থেকে অসুস্থ চিন্তা আর কি হতে পারে ?

সূত্র :

1. মাসিক গণস্বাস্থ্য ; (বাংলাদেশ) ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৮
2. Hindustan Milkfood Manufacturers Ltd.-এর হরলিকস সম্পর্কে প্রচারপত্র
3. Insult or Injury ?—An Enquiry into the Marketing and Advertising of British Food and Drug Products in India & Malaysia by Charles Medawar, Indian Edition, 1981

☐ ১০৩ পাতার ছবি মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ)-র সৌজন্যে

☐ **জ্যোতির্ময় সমাজদার, স্মরজিৎ জানা**

কমপ্লিট ফুড

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—বাঙালী মায়ের এই আকুতি কখনো প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে-সাহিত্যে, কখনো দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, আক্ষেপ আর অনুযোগের ভাষায়—'এই পরীক্ষার কয়েকটা মাস যদি ছেলেটাকে অন্তত সকাল-বিকেল দুটো গ্লাস দুধ দিতে পারতাম…।'

দুধের প্রতি আমাদের অনুরাগ বড়ো প্রাচীন, বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য গড়ে না ওঠার পেছনে, অঙ্কে যথেষ্ট নম্বর না পাওয়ার পেছনে, দুধ না-খাওয়া বা না-খাওয়াতে পারাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত বাঙালী মা-বাবাদের কাছে। দুধের প্রতি আমাদের এই 'শ্রদ্ধা-ভক্তি' কি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ? দুধ কি এতোটাই জরুরী ? এটা কি অপরিহার্য একটি খাদ্য-সামগ্রী ?

আমাদের দেশে দুধের অভাবটা বহুদিনের, তাই হয়তো এর প্রতি আকর্ষণটা এতো বেশি। অবশ্য খাদ্য হিসেবে দুধের কিছু বাড়তি গুণাগুণ রয়েছে—তুলনায় অন্য যে কোনো খাবারের থেকে। যেমন দুধে মোটামুটি আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদানগুলি মজুত রয়েছে। দুধে রয়েছে প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) ; রয়েছে কিছু ভিটামিন ও খনিজ (মিনারেল)। দুধের প্রোটিনের একটি বাড়তি সুবিধা হলো শিশুদের হজমের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক। যেহেতু এতে মোটামুটি সব ধরনের প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে তাই একে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ খাবার বা কমপ্লিট ফুড। আর এই ধারণার জন্যই বোধহয় দুধের এতো সমাদর আমাদের সমাজে। কিন্তু প্রশ্ন হলো দুধ 'পূর্ণাঙ্গ' বা কমপ্লিট খাবার হওয়ায় কি এমন আসে যায়, 'কমপ্লিট' খাবার বলেই কি তা অপরিহার্য হয়ে যাবে ? শুধু দুধ খেয়েই কি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় বা শরীরের পরিপূর্ণ পুষ্টি শুধু দুধ খেলেই এসে যাবে ? এর উত্তর কিন্তু একটাই—না। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে পাঁচ-ছ মাসের পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের শক্ত খাবার দেওয়া শুরু করা হয়। এবং মোটামুটি এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে তাকে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যে-ধরনের খাবার খায় তাতে অভ্যস্ত করে তোলাটাই হলো বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। এটা না করে শুধু দুধ খাইয়ে গেলে বাচ্চাদের পুষ্টি এবং শরীর ও হাড়ের গঠন ঠিকমতো হয় না। মনে রাখা দরকার দুধে যথেষ্ট পরিমাণ লোহা (Iron) এবং ভিটামিন-সি নেই। আমি কিন্তু এসব বাদ দিয়ে পুরোনো প্রশ্নেই ফিরে আসছি। আমাদের শরীরের সঠিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন কতকগুলি উপাদানের। মূল উপাদানগুলি হলো—প্রোটিন (আমিষ), ফ্যাট (চর্বি) ও কার্বহাইড্রেট (শর্করা), যার থেকে আমাদের শরীর তার প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি গ্রহণ করে। এ-ছাড়া প্রয়োজন কিছু ভিটামিন ও খনিজের। এগুলি খুব অল্পমাত্রায়-ই প্রয়োজন হয়। আর আমাদের শরীর এর সমস্ত কিছুই আহরণ করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য থেকে। কোনো একটি বিশেষ খাদ্যে এই সবগুলি সঠিক অনুপাতে থাকে না, কিন্তু সক্ষম মানুষ সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের খাবারই খেয়ে থাকে, আর খাদ্যের এই সংমিশ্রণ থেকেই প্রয়োজনীয় সব উপাদান আমরা পেয়ে যাই। ভাত, ডাল, শাকসবজি খেলেও এর সবগুলি মিলে যাবে। ধরা যাক প্রোটিনের কথা ; প্রোটিন শুধু দুধে নয়, ডাল, গম, বাদাম, ডিম, মাছ-মাংসেও রয়েছে এবং উৎকর্ষের নিরিখে ডিম বা মাছের প্রোটিন দুধের

থেকে খারাপ নয় এবং পরিমাণে এগুলিতে অনেক বেশিই থাকে।

খাদ্যদ্রব্য	প্রোটিনের পরিমাণ (%)	জৈবিক মান (Biological value) (%)	প্রোটিন আত্মীকরণের হার (net protein utilisation) (%)
গরুর দুধ	৩.২	৮৫	৮১
ডিম	১৩.৩	৯৮	৯৬
মাছ	(১৮-২১.৫)	৮০	৭৭
মুগ ডাল	২৪.৫	৬২	৫২
চাল	৮.৫	৭০	৬৫
বাদাম	২৬.৭	৫৪	৫০

যদিও দুধের প্রোটিন চাল বা ডালের প্রোটিনের থেকে উৎকৃষ্ট, কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে এতে প্রোটিন অনেক কমই থাকে। তাছাড়া প্রোটিনের এই উৎকর্ষের ব্যাপারটাও অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিছু কিছু প্রোটিনে সব ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড (প্রোটিন ভেঙে এটা তৈরি হয়) থাকে না। কিন্তু ধরা যাক চাল ও ডালের কথা। দু-টোতেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু দু-টো যখন এক-সঙ্গে খাওয়া যায় তখন একের ঘাটতি অপরে পুষিয়ে দেয়।

এবার যদি ফ্যাট-এর কথায় আসা যায় তবে দেখা যাবে, দুধে রয়েছে মাত্র ৩%—৭%; আর বাদাম ইত্যাদিতে তো এর কয়েকগুণ বেশি রয়েছে। তাছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো দুধ থেকে তৈরি করা মাখন, ঘি ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (Essential Fatty Acid)-এর পরিমাণ অনেক কম, যা অনেক বেশি মাত্রায় উদ্ভিজ্জ তেলে পাওয়া সম্ভব (পাম তেল, বাদাম তেল, সর্ষের তেল ইত্যাদি)। তাই দুধের ফ্যাট-এর কার্যকারিতা কম।

ভিটামিন প্রায় সব খাদ্যদ্রব্যেই কিছু না কিছু ছড়িয়ে রয়েছে। এ

ব্যাপারে দুধের কোনো বিশেষত্ব নেই, আর খনিজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অনেকে অবশ্য দুধের 'ক্যালসিয়াম' নিয়ে গদগদ হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত বলে নিই চাল, ডালেও ক্যালসিয়াম রয়েছে, রয়েছে আরও বহু খাদ্যদ্রব্যে। সাধারণভাবে ক্যালসিয়ামের অভাবে ভুগছেন (কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া) এমন মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যদিও সাধারণের মনে এর 'অভাববোধ' হরেক কায়দায় সৃষ্টি করা হয় এবং ক্যালসিয়াম টনিক/ট্যাবলেটের বাজারেরও বেশ বাড়-বাড়ন্ত। আসলে খাদ্যাখাদ্য বিচারে তথা সুষম খাদ্যের চিন্তা-ভাবনায় একটি তথা-কথিত বৈজ্ঞানিকতা কাজ করে—যা আসলে একটি যান্ত্রিক চিন্তা-পদ্ধতির জন্ম দেয়। সুষম খাদ্য একজনের রুচি, মানসিকতা এবং বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যগুলি থেকেই গড়ে ওঠা উচিত। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকভাবেই তা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলে—যা সেখানকার কৃষি বা সংস্কৃতির অঙ্গ। কোনো খাদ্যের বিশেষ উৎকর্ষ প্রমাণ করে তা চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতাটাই অবৈজ্ঞানিক। এই মানসিকতাকে কাজে লাগিয়েই কখনো প্রোটিন, কখনো ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বা টনিকের ফলাও কারবার ফাঁদে ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা। কারো দুধ খেতে ভালো লাগলে সে অবশ্যই তা খাবে। কিন্তু এটি একটি 'পূর্ণাঙ্গ' খাদ্য, এই তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' যুক্তির জোরে কোনো ফরমান জারী করাটাকে আদৌ যৌক্তিক বলা চলে না। আমাদের চিন্তা-ভাবনায় এমন একটা ভাব কাজ করে যেন 'সুষম খাদ্যে'র ধারণার অনুপস্থিতিটাই এদেশের মানুষের অপুষ্টির একটি বিশেষ কারণ এবং তা দূর করার জন্য এই জ্ঞানটির গুরুত্ব সাড়ম্বরে প্রচার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে পড়েই মানুষ তার রুচি ও সেই অঞ্চলের প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সেটাই প্রধান এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে হরেক রকমের 'তত্ত্বে'-র আমদানী হচ্ছে বাজারে মূলত দু-টি কারণে। এক, মানুষের রুচি এবং ইচ্ছে অনুযায়ী খাবার না খেতে পারার ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে কিছুটা অন্য পথে চালিত করা। দুই, এই সুযোগে কিছু ব্যবসা ফেঁদে বসা। পূর্ণাঙ্গ বা কমপ্লিট খাবারের প্রতি এই মোহ সৃষ্টির পেছনেও কাজ করছে এই বিশেষ ব্যবসায়িক স্বার্থ। সৃষ্টি করা হচ্ছে আর এক কুহক।

আমাদের মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মে গেছে যে, শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানগুলি কোনো একটি বিশেষ খাদ্য থেকে নিতে হবে। তাই কোন্ খাদ্যটি তুলনামূলকভাবে অপরটি থেকে বেশি খাদ্যগুণের অধিকারী তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়। এই ধারণাকে মূলধন করে ধূর্ত ব্যবসায়িরা হাজির হয়ে পড়েন বাজারে—বড় বড় হরফে তারা বিজ্ঞাপন দেন—"দুধে আছে ১৭টি, আমাদের এই কৌটোতে রয়েছে ২৩টি খাদ্যগুণ ....."।

'কমপ্লান' এমন একটি খাদ্য—এর জনক হলেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি গ্লাক্সো। এইসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ব্যবসার রকমফেরে চমৎকারিত্ব রয়েছে। যখন দেখে ওষুধের ব্যাপারে লোকেরা একটু সজাগ হয়ে পড়েছে বা যখন ক্ষতিকারক বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে সোরগোল উঠেছে বিশ্বজুড়ে—তখন তারা তা আঁচ করে, শুরু করে হয়তো 'বেবিফুড' বা শিশুখাদ্য তৈরি করতে, ফলাও কারবার ফাঁদে মিথ্যে প্রচার চালিয়ে। বুকের দুধ বন্ধ করে মায়েরা তখন ছোটেন এই সব টিন কেনার জন্য। কেউ হয়তো নেমে পড়েন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার তৈরি করতে। বাজারে চলে আসে ফাইজারের (একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি) 'প্রোটিনেক্স'। 'প্রোটিন' খাওয়ানোর হিড়িক পড়ে যায় ঘরে ঘরে। গ্লাক্সোর (Glaxo) প্রচার অভিযানে আরো একটু বেশি অভিনবত্ব রয়েছে। তারা শুধু 'প্রোটিন'-ই যোগাচ্ছে না, শরীরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান প্যাক করে দিচ্ছে কৌটোয়—তুলনায় দেখাচ্ছে দুধের থেকেও তা কতো বেশি গুণে 'গুণী'। তাই আর দুধের প্রতি দুর্বলতা কেন, কমপ্লান ধরুন, কমপ্লানের ভক্ত হয়ে পড়ুন। আর একটি কথা বেশ বড় হরফে কৌটোর গায়ে লিখে থাকে তারা—"দুধে মেশানোর প্রয়োজন নেই"। দুধের প্রতি সাধারণের দুর্বলতাটুকু বেশ ভালোভাবে ভাঙিয়ে তারা দুধের জায়গায় আনতে চাইছে 'কমপ্লান'। এদেশের বিশেষত ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে, যেখানে দুধের ঘাটতি সর্বাধিক, সেখানে দুধের প্রতিস্থাপক কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রলোভন সবথেকে বেশি কার্যকর হয়, তা ইতিপূর্বেই দেখা গেছে। এ-কারণেই এ-অঞ্চলগুলিতে 'হরলিকস'-এর সবথেকে বড় বাজার। যেখানে দুধের প্রাচুর্য নেই, সেখানে দুধে মিশিয়ে খাওয়ার কোনো খাদ্য সহজে বাজার পাবে না, তা তারা ভালো করেই জানে—আর সঙ্গে যদি এ-ও বলা যায় যে, তা দুধের থেকেও বেশি গুণসম্পন্ন তবে তো কথাই নেই। তাদের বিজ্ঞাপনের আর দু-টি শব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য-

কমপ্লিট ফুট/১১৩

পানীয়'। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে 'বিজ্ঞানসম্মত' শব্দটি ভারে কাটে। আর ঐ 'পূর্ণাঙ্গ' খাদ্যের প্রতি আমাদের দুর্বলতার কথা তো আগেই বলেছি। দুধ 'পূর্ণাঙ্গ' খাদ্য অতএব কমপ্লানকেও যদি ঐ ছকে ফেলে দেওয়া যায় তবে বাজারমাতের আরও একটি স্বর্ণ সম্ভাবনা যে ফলপ্রসূ হতে পারে, তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে সেটা ঠিকই ধরা পড়েছে।

এবার দেখা যাক ঐ বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যটিতে কি কি রয়েছে। এতে রয়েছে প্রোটিন ২০%। বলা হয়েছে, 'প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন'। মিল্ক প্রোটিন যে সেরা প্রোটিন, এটি শুধু তাদের বিজ্ঞানেই লেখা রয়েছে। পুষ্টিবিজ্ঞানের কোথাও এটি লেখা নেই (আগেই দেখানো হয়েছে যে ডিমের প্রোটিন সবার সেরা)। তাদের ঐ ২৩টি উপাদানের মধ্যে রয়েছে 'চোখ



ধাঁধানো' মিনারেল ক্যালসিয়াম। এতে ভিটামিন-ই এবং 'কে' যে কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে মেশানো হলো তা জানতে গেলে তাদের তৈরি বিশেষ কোনো এক 'বিজ্ঞান' (?) ঘাঁটতে হবে। এতে আরো রয়েছে ভিটামিন-ডি। যে-দেশের মানুষেরা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পেয়ে থাকে (আমাদের চামড়ায় সূর্যালোক পড়লে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়) সেখানে আলাদাভাবে ভিটামিন-ডি খাওয়াটা শুধু অযৌক্তিকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। অতিরিক্ত ভিটামিন-ডি শরীরে নানান ধরনের ক্ষতি—যেমন কিডনীতে পাথর জমা, রক্তে কোলেস্টেরল বাড়া, ক্ষুধা নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটাতে পারে। এতে রয়েছে একটি ভিটামিন যৌগ যার নাম ক্যালসিয়াম পেন্টোথেনেট—এই

ভিটামিনের অভাবে ভুগতে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষকে, দেখা যায় নি। রয়েছে ভিটামিন বি$_{১২}$; এদেশে এর অভাবেও কেউ ভোগেন না। বিশেষ জেনেটিক কারণে সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যায় এই রোগ দেখা যায়। সেখানেও এই ভিটামিন মুখে খাইয়ে লাভ নেই, ইনজেকশনের মাধ্যমে দিতে হয়। এছাড়াও এতে রয়েছে 'কোলিন'। 'কোলিন' ব্যবহারের কোনো বাড়তি লাভ নেই। এতে মেশানো রয়েছে আয়োডিনও। আমরা আমাদের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় আয়োডিন পেয়ে থাকি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে (যেমন হিমালয়ের পাদদেশে) যেখানে মাটিতে এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ কম সেখানকার মানুষেরা আয়োডিনের অভাবে ভোগে এবং তাদের গলগণ্ড হয়ে থাকে। তাই সে-সব অঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাবার লবণের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়োডিন মেশানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষকে আয়োডিন খাওয়ানোর এই আজব তত্ত্ব কি করে গ্ল্যাক্সো কোম্পানির মাথায় এলো তা একমাত্র তারাই বলতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত আয়োডিন গ্রহণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা তো রয়েছেই, উল্টে গলগণ্ডও হতে পারে। এরপরও তারা দাবি করবেন এটি বিজ্ঞানসম্মত! শুধু বিজ্ঞানসম্মত নয় তারা বলছেন এটি একটি 'সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার'—পরিকল্পনার বলিহারী! আর 'সম্পূর্ণ আহার' বলতে কি তারা এই বোঝাতে চাইছেন যে, এটি খেলে আর কিছু খেতে হবে না? অথচ ১০০ গ্রাম কমপ্লান-এ তাদের দেওয়া হিসেব দেখাচ্ছে—আমিষ আছে—১০ গ্রাম, চর্বি—১৬ গ্রাম, শর্করা—৫৫ গ্রাম।

খাদ্যদ্রব্য	প্রোটিনের পরিমাণ %	জৈবিকমান	প্রতি কিলোর দাম (টাকা)	প্রতি ১০০ গ্রাম প্রোটিনের দাম পড়ছে (টাকা)	প্রতি ১০০ গ্রাম কিলো ক্যালরি যোগাচ্ছে
মুগের ডাল	২৪.৫	৬০	৬.০০	৩.০০	৩৪৩
ডিম	১৩.৩	৯৮	৮.৫০	৬.৫০	১৭৩
বাদাম	২৬.৭	৫৪	১২.০০	৪.৫০	৫৬৭
আটা	১২.৭	৫০	২.০০	১.৭০	৩৪৯
কমপ্লান	২০.০	৬০	৯২.০০	৪৬.০০	৪৫০

এই সারণিতে খাদ্যদ্রব্যগুলির ও কমপ্লান-এর দাম ১৯৮৪ সালের বাজার দর অনুযায়ী ধরা হয়েছে।

আর ঐ ১০০ গ্রাম কমপ্লান যোগায় ৪৫০ কিলো ক্যালরি, অর্থাৎ প্রতি দু-শো গ্রামের কৌটোয় পাওয়া যাচ্ছে ৯০০ কিলো ক্যালরি। আপনার ১৪ বছরের বাচ্চার দৈনিক প্রয়োজন প্রায় ২৫০০ কিলো ক্যালরি। তার মানে সকাল, বিকেল এবং রাত্রে দু'শ গ্রামের তিনখানি পুরো কৌটো উপুড় করে ঢেলে দিতে হবে আপনার ছেলের মুখে, আর এর জন্য খরচ পড়বে মাত্র ১৯ × ৩ = ৫৭ টাকা ; 'বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান' এই প্রচারে গলে গেলে আপনার ভাঁড়ারটিই কার্যত বাড়ন্ত হয়ে যাবে—বাড়ন্ত বাচ্চার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না।



আপনি হয়তো বলবেন—তা কেন, সকাল-বিকেল মাত্র ২৫ গ্রাম করে ৫০ গ্রাম খাওয়াবেন বাচ্চাকে। এতে অবশ্য একটা মানসিক পরিতৃপ্তি পাবেন এই ভেবে যে, বাচ্চাকে 'দামী কিছু' খাওয়াচ্ছেন। চাই কি এতে আপনার পরিবারের 'প্রেস্টিজ' কিছু বাড়বে, এটাও ধরে নিতে পারেন। এর বেশি কিচ্ছুটি হবে না। এতে সারাদিনে তারা যা পাবে তা হলো ৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৮ গ্রাম ফ্যাট এবং ২২৫ কিলো ক্যালরি। স্রেফ একটা ডিম থেকে প্রায় ঐ পরিমাণ প্রোটিন এবং এর প্রায় দেড়গুণ ফ্যাট পাবেন আপনি। উৎকর্ষের নিরিখে ডিমের প্রোটিন দুধেরও ওপরে তাতো আগেই বলেছি। ১০০ গ্রাম আটার রুটির থেকে এর চেয়েও বেশি প্রোটিন এবং এর প্রায়

দেড়গুণ ক্যালরি পেয়ে যাবেন। স্রেফ ৫০ গ্রাম বাদাম খাওয়ালে আপনার ছেলে এর থেকে বেশি প্রোটিন, অনেক বেশি ফ্যাট এবং অনেক বেশি ক্যালরি পেয়ে যাবে এবং তা পাবে অনেক অনেক বেশি সস্তায়।

আসলে পাঁচ এবং ছয়ের দশকে য়ুরোপে জমে ওঠা গুঁড়োদুধ তৃতীয়-বিশ্বে চালান করার তাগিদে শুরু হয়েছিল এই 'প্রোটিন' সমৃদ্ধ খাবার তৈরি করা। ইদানীং অবস্থাটা আবার ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এতো পরিমাণ দুধ য়ুরোপের দেশগুলিতে জমে যাচ্ছে যে, খুব সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানী সমস্যার সমাধান করতে ২০ লক্ষ দুগ্ধবতী গাই জবাই করেছে—তাতেও খুব একটা সুরাহা হবে না। এখন ঐ গুঁড়োদুধ কিছু হাবিজাবি এবং রঙচঙ মিশিয়ে যদি নতুন নামে এশিয়া আফ্রিকার বাজারে চালানো যায় তবেই কেল্লাফতে। তাই হয়তো নতুন উদ্যমে গ্ল্যাক্সো উঠেপড়ে লেগেছে। টিনে পুরে সেই গুঁড়ো দুধই তারা বেচতে চাইছে এক নতুন নামে আর কয়েকগুণ দামে—যার নাম কমপ্লান—আর এরজন্য কম প্ল্যান তারা আঁটে নি। আট-ঘাট বেঁধে এদেশের মানুষদের ধোঁকা দেবার সমস্ত রাস্তাই ব্যবহার করছে তারা—যাকে বলে তাদেরই ভাষায় 'সুপরিকল্পিত' ভাবে। মনে রাখবেন, এইসব বড় পকেটমারদের উদ্দেশ্যে কোনো সাবধানবাণী বাসে কিংবা ট্রামে কোথাও দেখতে পাবেন না—আপনিই একমাত্র লিখে দিতে পারেন ওদের এইসব কৌটোর গায়ে বেশ বড় বড় হরফে 'পকেটমার হইতে সাবধান'। নইলে ঠকবেন আপনি কিংবা আপনার কোনো বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী।

সূত্র :

1. Nutritive value of Indian foods ; I. C. M. R. Publication
2. Clinical Pharmacology ; D. R. Lawrence
3. Davidson's Principle and Practice of Medicine ; John Macleod
4. Insult or Injury ; Charles Medawar
5. মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ; ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

☐ স্মরজিৎ জানা

ম্যাগী নুডল্ এবং চটজলদি খাবার

আপনি নিশ্চয় সচেতন মা-বাবাদের একজন এবং হয়ত লক্ষ্য করছেন ইদানীং আপনার ছেলেমেয়েদের মেজাজটা ভীষণ তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে। এমন খিট্‌খিটে আর বদমেজাজী স্বভাবটা কোত্থেকে যে তৈরি হলো তা নিয়ে হয়ত চিন্তাও করছেন—আর দুটো মাস পরেই স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা অথচ পড়ায় একটুও মন নেই ছেলের, একটুতেই রেগে ওঠে। খুদে মেয়েটারও একই হাল। এ-নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছেন, কারণ খোঁজার চেষ্টাও করেছেন—কিন্তু কোনো হদিস পান নি ; শেষে হতাশ হয়ে, কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন ; হয়ত ভাবছেন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কি-না।

আচ্ছা ! আপনার ছেলেমেয়েদের প্রিয় খাদ্য কি ম্যাগী নুডল্‌স (Maggi noodles) ? তাহলে একটা 'ক্লু' পাওয়া গেল, কারণটা হয়ত এবার বার করা সম্ভব হতে পারে ; হতে পারে আপনার ছেলেমেয়েদের এই আচার-আচরণের পরিবর্তনের পেছনে শুধু ম্যাগী নয়, রয়েছে এই ধরনের খাদ্যগুলি। আর আজ যা শুরু হয়েছে আপনার ছেলেমেয়েদের ভেতর, তা হয়ত সি আর এস-এর পূর্বলক্ষণ ;—কথাগুলো বিজ্ঞাপনের মতো শোনালেও একদম সত্যি। প্রায় ১,৪০০ স্কুলের ছাত্রের ওপর পরীক্ষা করে জাপানে 'হিরোসী সাতোমী' (Hiroshi Satomi) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সি আর এস অর্থাৎ 'চাইনীজ রেস্তোরাঁ সিনড্রোম' (Chinese Restaurant Syndrome)—রোগটার নামের থেকে কার্যকারণ সম্পর্কের কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। চাইনীজ রান্নার কদর সারা বিশ্বে। বিগত কয়েকটা দশকে সে-বাজার হু-হু করে ছড়িয়ে গেছে য়ুরোপে, আমেরিকায়। ওইসব দেশে চাইনীজ খাদ্যের বহু অনুরাগী রয়েছেন, যারা সকাল বিকেল চাইনীজ খাবার খেয়ে থাকেন। আর আমেরিকাতেই প্রথম রোগটাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়,—সে-ও খুব বেশি দিনের কথা নয়—১৯৬৮ সালে ; শুরুর ঘটনা সেটা। নিউইয়র্কের রেস্তোরাঁয় ডাঃ রবার্ট ওয়াক্ (Robert Kwok) আর পাঁচদিনের মতোই

কাঁটায় করে জড়াচ্ছিলেন 'নুডল্'—হঠাৎ অনুভব করলেন হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে, আর এই অবশ অনুভূতিটা ক্রমশ হাত ছাড়িয়ে ঘাড়ে এবং সেখান থেকে শরীরের পেছনের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা অবসন্ন ভাব, কিন্তু বুকের কাছে হৃৎপিণ্ডের গতিটা যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন নিজের বুকের ধুকপুকানি—আতঙ্কিত ডাঃ ওয়াক্ উঠে দাঁড়ালেন কোনোক্রমে, ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। এমনি অবস্থাটা অবশ্য আরো ঘণ্টা দুয়েক বজায় ছিল, তারপর অস্বস্তি আর অবশ ভাবটা ধীরে ধীরে কমে আসে। পরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন, তার আর সব বন্ধুরা—যারা চাইনীজ খাবারের খুব ভক্ত, তাদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। এরপরই ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। এবং তখনই জানা যায় এর পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ রাসায়নিক, যাকে সংক্ষেপে বলে MSG অর্থাৎ মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (Monosodium glutamate)।

আজিনা মটো

MSG হলো কেতাদুরস্ত নাম, চালু ডাক নামটি হলো 'আজিনা মটো'। চীন জাপানের রান্নায় আজিনা মটোর ব্যবহার বহুশতাব্দী ধরে চলে আসছে। আগে এটা সংগ্রহ করা হতো সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে। ইদানীং অবশ্য বর্দ্ধিত চাহিদা মেটাতে, কারখানায় শর্করা জাতীয় বস্তু, বিশেষ পদ্ধতিতে গেঁজিয়ে (Fermented) তৈরি করা হয়। আজিনা মটো এখন দেশের মধ্যে তথা উচ্চবিত্তদের হেঁসেলঘরে ঢুকে পড়েছে। রান্নার কাজে ব্যবহৃত এই সাদারঙের গুঁড়োটির গুরুত্ব কতটুকু? এতাবৎকাল জুড়ে এবং এখনো চীনা ও জাপানী রাঁধুনীরা রান্নায় যে একে ব্যবহার করে এসেছে, তা খাদ্যে নতুন কোনো স্বাদ-গন্ধ জুড়ে দেবার জন্য নয় (সে-ক্ষমতা আজিনা মটোর নেই); বরং খাদ্যের যে নির্দিষ্ট স্বাদ বা গন্ধ রয়েছে সেটাকে বজায় রাখতে এবং কিছুটা শক্তিশালী করে দিতে। সেই হিসেবে আজিনা মটো মশলা হিসেবে প্রাথমিক গুরুত্ব পেতে পারে না। কিন্তু শরীরের ওপর আজিনার প্রভাব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৮ সালে CRS আবিষ্কার হওয়ার পর জীবজন্তুদের ওপর এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে কি-না তা যাচাই করার জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। ইঁদুর, গিনিপিগ এবং বাঁদরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, বিশেষত ওইসব জীবের

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মস্তিষ্কের চিরস্থায়ী ক্ষতি হচ্ছে এবং মানব শিশুদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। জাপানে মুরগীর বাচ্চাদের ২·৬ হারে MSG খাইয়ে দেখা যায়, তিনদিনের মধ্যে সেগুলি মারা গেছে এবং মৃত্যুর পর মুরগীগুলোর হৃদযন্ত্র, কিডনী এবং পেশীতে অনুসন্ধান করে সাদা রঙ-এর একটি আবরণী পড়তে দেখা গেছে। এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ১৯৭৩ সালে খাদ্যে MSG দেওয়ার সর্বোচ্চ-মাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয় FAO* এবং WHO-র** তরফ থেকে—যা হলো সাধারণের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু ১২০ মি. গ্রা. (দৈনিক) অর্থাৎ ৫০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা দাঁড়াবে ৬ গ্রাম। কিন্তু ওই সময় এবং পরবর্তীকালে আরো কিছু পরীক্ষায় শিশুদের ওপর এর ক্ষতিকারক প্রভাবের যে-চিত্র পাওয়া যায় তাতে এ-নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় সারাদিনে মাত্র ১·৫ গ্রাম আজিনা খেয়েও C R S হতে পারে। ১৯৭০ সালেই আমেরিকায় শিশুখাদ্যে আজিনার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আজিনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, শিশুদের ক্ষেত্রে C·R S শুরু হওয়ার আগেই মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে, যা সচরাচর বাবা-মা-র চোখে ধরা পড়ে না। সম্প্রতি আরো জানা যাচ্ছে, শিশুদের বৃদ্ধির হার MSG ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯৮৩ সালে জাপানের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ক্যান্সার সেণ্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—আজিনার ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে বলে। অন্ততপক্ষে, তাদের সমীক্ষার ফলাফল সে-দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। তাই তাইওয়ান থেকে শুরু করে ফিলিপিনস্, জাপান, মালয়েশিয়া সর্বত্রই আজিনা মটোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছেন বিভিন্ন ক্রেতা সমবায় সংস্থা ও ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা। সম্প্রতি এ-রকম ১৪টি সংস্থা মিলে শ্লোগান তুলেছেন 'No MSG Please' (দয়া করে আর এম এস জি নয়), যারা বিশ্বব্যাপী এক বিশাল প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

বাইরের দেশ ছেড়ে এবার আমাদের দেশের দিকে লক্ষ্য করা যাক। ম্যাগী নুডল্‌স-এ এম এস জি ব্যবহারের বিরুদ্ধে এদেশের ক্রেতা সমবায়

---

* FAO : Food & Agriculture Organisation

** WHO : World Health Organisation

সমিতি বিশেষত জামশেদপুরের কনসিউমার গাইডেন্স সোসাইটি (Consumer Guidance Society) এগিয়ে এসেছেন। তারা বিহারের ড্রাগ কণ্ট্রোলার, স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ও খাদ্য পরিদর্শকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসেছিলেন। এ-নিয়ে তারা আগামীদিনে এক বড়োসড়ো প্রচার আন্দোলনে নামছেন। অবশ্য MSG-র ব্যবহার কিন্তু শুধুমাত্র ম্যাগী নুডল্‌স-এই নেই। লঙ্কার সস্‌ (Chilli Sauce), টম্যাটোর আচার (Tomato Ketchup), ইত্যাদি বহু ধরনের সস্‌ ও আচার জাতীয় সামগ্রীতে এর বহুল প্রচলন রয়েছে—প্রচলন রয়েছে আরো বহু ধরনের টিন-ফুডে এবং এসব ক্ষেত্রে কোম্পানিরা আজিনার নাম না উল্লেখ করে, স্রেফ 'সিজনিং' (Seasoning) বলে লিখে থাকেন, কোনো কোনো কোম্পানি তা-ও লেখবার প্রয়োজন বোধ করে না। এসব ক্ষেত্রে প্রায়শই আজিনা খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ বজায় রাখা এবং স্বাদকে কিছুটা শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহৃত হয়। (সাধারণভাবে একেই সিজনিং বলে।) যত দিন যাচ্ছে ম্যাগী নুডল্‌স-এ ব্যবহৃত MSG সম্পর্কে নতুন সব তথ্য জানা যাচ্ছে। সিংগাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়াঙ হক্‌ বুন (Wong Hock Boon) লক্ষ্য করেছেন, 'আজিনা'র ফলে শিশুদের হাত-পায়ে কাঁপুনি (Tremor) দেখা দিতে ও আজিনা খাওয়া বন্ধ করে দিলে তা কমে যায়। তিনি আরো বলেছেন, আজিনা বা MSG মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মধ্যেকার পরিচালন ব্যবস্থার (Neurotransmitter) পরিবর্তন ঘটায়। এছাড়া, আজিনা সাধারণ লবণের সঙ্গে মিলে (যা সাধারণত আমরা একসঙ্গে বা অন্য কোনো খাবারের সঙ্গে নিয়ে থাকি) ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শিশুদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে বলে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের ধারণা। যার ফলে মালয়েশিয়া এবং জাপানে শিশুখাদ্যে একে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে ; দাবি উঠেছে এশিয়া-য়ুরোপের আরো বহু দেশ থেকে। মালয়েশিয়ায় অবশ্য MSG প্যাকেটের গায়ে 'শিশুদের জন্য নয়' বলে সতর্কবাণী লেখা থাকে। আমাদের দেশে এ-সবের কোনো বালাই নেই। সম্প্রতি এদেশের স্বল্প কিছু ক্রেতা সমবায় সমিতি-র প্রচারের চাপে পড়ে ম্যাগী প্রস্তুতকারকরা বলতে শুরু করেছেন যে, ওতে নাকি 'নিরাপদ মাত্রা'রও কম পরিমাণ রয়েছে—যদিও ঠিক কতগ্রাম MSG তারা ম্যাগীতে মেশান তার কোনো উল্লেখ প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে না—আর তাছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে 'নিরাপদ মাত্রা'র ব্যাপারটা আদৌ স্বচ্ছ নয়। ১৯৭৯

সালে ফিলিপিনসের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠন সে-দেশে MSG-র ব্যবহার শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছে, কারণ এটি শিশু-দের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে বলে তাদের অভিমত। 'ম্যাগী' ছাড়াও আরো বহু নুডল্ ইতিমধ্যে এদেশের বাজারে এসে গেছে—তারাই বা কতটা MSG মেশাচ্ছেন, তাদের প্যাকেটেও বহুক্ষেত্রে তার উল্লেখই থাকে না, সেক্ষেত্রেই বা কিভাবে তাদের ধরা যাবে? টম্যাটো, লঙ্কা ইত্যাদির সস্ বা আচারে আজিনাই বা কি করে চিহ্নিত করা যাবে সে-সম্পর্কে এদেশের ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলো বড়ো কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে নি। এবং এদেশের সরকার এ-ব্যাপারে এখনো নিরুত্তাপ।

ফাস্ট ফুড

শব্দটা মোটামুটি এখনো শহরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নুডল্ সহ আরো বহু 'ফাস্ট ফুড' আজ সুদূর গ্রামাঞ্চলে, দুর্গম পাহাড়ী গ্রামের গভীরে ঢুকে গেছে; শুধু ঢুকে পড়া নয় ইতিমধ্যে বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। ম্যাগী নুডল্‌স-এর কথাই ধরা যাক। ১৯৮২ সালে, 'দু-মিনিটের নুডল্‌' বাজারে ঢুকেছিল মাত্র ২ টনের কারবারকে সম্বল করে; ১৯৮৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪,৬২৯ টনে অর্থাৎ মাত্র ৪ বছরে ব্যবসা বেড়েছে দু-হাজার গুণেরও বেশি। টাকার অঙ্কে, দশকোটি টাকারও বেশি ব্যবসা চলছে এই ইনস্ট্যাণ্ট নুডল্‌-এর। শুধু নুডল্‌ নয়, নুডল্‌ ও নুডল্ জাতীয় সমস্ত ফাস্ট ফুডের চাহিদাই বাড়ছে তীব্র গতিতে। ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক অ্যাণ্ড মার্কেট রিসার্চ-এর বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমানের (১৯৮৫) ফাস্ট ফুডের ৫০,০০০ টনের চাহিদা, ১৯৯৫ সালে বেড়ে দাঁড়াবে ১·৭০ লাখ টনে; —বৃদ্ধির হার প্রায় আকাশচুম্বী। অন্য কোনো ধরনের ব্যবসায়ে বৃদ্ধির এই হার কল্পনাই করা যায় না। আর এদেশে ফাস্ট ফুডের প্রথম কারবারী 'ম্যাগী নুডল্‌'-এর জনক F S L বা ফুড স্পেশালিটিস লিমিটেড-এর (Food Specialities Limited সংক্ষেপে F S L) বৃদ্ধির হারটাও লক্ষণীয়। ২৫ বছর আগে তারা শুরু করেছিল, মিষ্টি গোলাদুধ 'মিল্কমেড' দিয়ে—বলতে গেলে সেটাই এদেশের প্রথম 'ফাস্ট ফুড (Fast Food)—অর্থাৎ যে-খাদ্য নতুন করে রান্না করা বা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। রান্না করার প্রয়োজন

থাকলেও সেটা খুব দ্রুত এবং খুব সহজে সেরে নেওয়া যায়। একে তাই ইনস্ট্যাণ্ট ফুড বা চট্‌জলদি খাদ্যও বলা হয়। এরপর তারা একে একে ইনস্ট্যাণ্ট কফি নেসক্যাফে, গুঁড়ো দুধ 'নেসপ্রে', ল্যাক্টোজেন, শিশুখাদ্য সেরিল্যাক্‌, ম্যাগী নুডল্‌, ম্যাগী সস্‌ ইত্যাদি নিয়ে বাজারে ঢুকে পড়ে। বিগত দশ বছরে F S L-এর বিক্রি বৃদ্ধির হার ৭৫২%, আর টাকার অঙ্কে শুধু লাভের পরিমাণ ১৯৭৬ সালের ৩৬·৩৫ লাখ থেকে লাফিয়ে ১৯৮৬-তে দশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। হিসেব করলে এই বৃদ্ধির হার দেখা যাবে ২,৮৫৬%। প্রায় অকল্পনীয় এই বৃদ্ধি। অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এত লাভের কথা ভাবাই যায় না। কাগজে-কলমে দেশি প্রতিষ্ঠান হলেও কার্যত এর ৪০% মালিকানা বহুজাতিক সংস্থা নেস্‌লে-র (Nestle) এবং নেস্‌ল বকলমে এর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এদেশে ফাস্ট ফুডের (Fast Food) আকাশছোঁয়া চাহিদাকে কাজে লাগাতে আর এক বহুজাতিক সংস্থা ব্রিটেনের বুথ্‌ এবং স্মিথ্‌ (M.S. Booth & Smith Associates) হাত মিলিয়েছে এদেশের অল সিজন ফুড লিমিটেড (All Seasons Food Limited)-এর সঙ্গে এবং ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের নাসিকে তাদের কারখানা উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে—যে-কারখানার বছরে উৎপাদন ক্ষমতা ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন। প্রথম বছরই তারা ২১ কোটি টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তা ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলেই তাদের বিশ্বাস। অবশ্য এদের অর্ধেক উৎপন্ন দ্রব্য বাইরের দেশে রপ্তানি হবে। তা সত্ত্বেও ধরে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, শুধু বর্তমান চাহিদার ওপর দাঁড়িয়ে তারা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে না, চাহিদা তৈরি করার ব্যাপারেও তারা অগ্রণী ভূমিকা নেবে। ইতিমধ্যে তা নিয়ে প্রচারও শুরু হয়ে গেছে। দেশি খাবার মটর পনীর, পাঞ্জাবী রজমা থেকে শুরু করে ফিস্‌-ষ্টিক সবকিছুই তাদের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া সস্‌ (Sauce) ও আচার জাতীয় জিনিস থেকে স্ন্যাক্‌স ইত্যাদি তো থাকছেই। অর্থাৎ এদেশের বাজার দেশি-বিদেশি সব ধরনের ফাস্ট ফুডে দ্রুত ছেয়ে ফেলবেন তারা। এরপর কলকাতা ছাড়িয়ে মফঃস্বল শহর কিংবা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে হট ডগ (Hot dog) কিংবা হ্যামবার্গার (Hamburger) পেতে কোনো অসুবিধা থাকবে না, নিঃসন্দেহে তা বলা যায়।

ভালো-মন্দ যাই ঘটুক না, কয়েক বছরের মধ্যেই ফাস্ট ফুডের বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়বে এদেশের সমাজে। তাতে এদেশের খাদ্যাভ্যাসে, রুচিতে

এবং স্বাস্থ্যে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে তা এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়—তবে এই ঢেউ যে আটকানো যাচ্ছে না, সেটা প্রায় নিশ্চিত। ভালো-মন্দ বিচার করার আগে, এদেশে ফাস্ট ফুডের উত্তুঙ্গ চাহিদার পেছনের কারণগুলো খুঁজতে গেলে বেশ কিছু মিথ্যে ধারণা এবং স্বল্প কিছু বাস্তব ও সত্যি ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমে সুবিধাগুলোর কথায় আসা যাক।—এটা ঠিকই, বর্তমান যুগের দ্রুত জীবনযাত্রার উপযোগী এই সব ফাস্ট ফুড কিছুটা সুবিধা ও সময়ের সাশ্রয় করে দেয়।

ফাস্ট ফুড ও নারী স্বাধীনতা

ফাস্ট ফুড রান্না করার সময় ও সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে দেয় ব্যস্ত এবং অফিস-আদালতে কর্মরত বাড়ির মেয়েদের। বিশেষত শহুরে-জীবনের সঙ্গে তাল রেখে স্বামী-স্ত্রী যখন অফিস-কাছারি করে কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনের প্রায় পুরোটা সময়, তখন দু-বেলার মূল খাবার, টিফিন ইত্যাদি করার অবকাশই বা কোথায়? তারপর ছেলেকে স্কুলে দেওয়া, স্কুল থেকে বাড়ি আনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বাড়ির মায়েদের। সঙ্গে স্কুলের ছেলে-মেয়ের টিফিন, কর্তার অফিসের টিফিন এসবও বানানোর ঝক্কি নিতে হয় সেই বাড়ির মেয়েদেরই। সেখানে 'ফাস্ট ফুড' তাদের কিছুটা স্বস্তি যে এনে দিচ্ছে বা দেবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। য়ুরোপের নারী স্বাধীনতার ঢেউ সে-সব দেশে ফাস্ট ফুডের বাজারকে শক্তিশালী করতে কিছুটা সাহায্য করেছে, এদেশের ক্ষেত্রেও সে-ব্যাপারটা ঘটতে পারে। নীতিগতভাবে কোনো নারীই চাইবে না, তার বেশির ভাগ সময়টা রান্না-ঘরে কাটাতে। এদেশের প্রগতিশীল স্বামীরা যতই মিটিং-এ, আলোচনাচক্রে নারী স্বাধীনতার পক্ষে জ্বলন্ত সব বক্তব্য রাখুন না কেন, এদের অধিকাংশই বাস্তব জীবনে প্রায় পূর্ব-প্রথারই অনুসরণ করে আসছেন। সেক্ষেত্রে একটু স্বাধীনচেতা মেয়েদের পরিবারে ফাস্ট ফুড 'মুশকিল আসান' হিসেবে দেখা দেবে—দিচ্ছেও। স্কুলের বাচ্চার টিফিন বাক্সে ঢুকে গেছে ম্যাগী নুডল্‌, প্যাস্ট্রি; স্বামীর কৌটোয় রেডিমেড পোলাও, বাচ্চার জন্য নেস্টাম, সেরিলাক, ইত্যাদি। সকাল-রাত্রের মূল খাবার এখনো তৈরি করে গেলেও শহুরে গৃহিণীরা আর কিন্তু জলখাবার কিংবা অতিথি আপ্যায়নের জন্য রান্নার ঝক্কি নিতে রাজি হচ্ছেন না এবং সেটাই স্বাভাবিক। এভাবেই কোল্ড ড্রিংক্‌স বা ম্যাগী নুডল্‌ জায়গা করে নিয়েছে আমাদের ঘরে। এবং

নুডল্-এর মতো বিদেশি খাবারও অত্যন্ত পরিচিত একটি সামগ্রী হয়ে গেছে—অতি অল্প সময়ের মধ্যে। বলতে গেলে, ফাস্ট ফুডের জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে দু-মিনিটের ম্যাগী নুডল্স। বহু প্রস্তুতকারকই আজ 'ফাস্ট ফুডে'র ব্যবসায়ে ঝুঁকছেন। প্রথমেই বিদেশি ধাঁচের খাবার তৈরি না করে, ক্রেতার অভিরুচি ও অভ্যস্ত খাদ্যগুলোই 'চট্‌জলদি' তুলে দিতে চাইছেন ক্রেতার কাছে। শুধু মাঝখানে রান্নার ঝামেলাটা থাকছে না। মটর পনীর থেকে মুরগী, জিলাপী সবই রয়েছে সে-তালিকায়। রুচির ব্যাপারে দক্ষিণীরা একটু বেশি গোঁড়া। তাই মহীশূরের 'ফুড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' ইডলি, দহি-বড়া ইত্যাদির রেডিমেড খাবারের প্যাকেট দিয়ে শুরু করে দিয়েছে তাদের ব্যবসা। আবির ইণ্টারন্যাশনাল 'রান্না করা চিংড়ি' আর 'পিঁয়াজের গুঁড়ো' থেকে শুরু করে হরেক-রকম ইনস্ট্যাণ্ট মশলার আসর জমিয়েছে। রান্নাঘরের দম আটকানো আবহাওয়ার বাইরে যে-সব মহিলারা থাকতে চাইবেন, তাদের ক্ষেত্রে এ-হাতছানিকে আশীর্বাদ বলেই মনে হবে। বিশেষত আমাদের দেশেও যখন রান্নাঘরে ৬/৮ ঘণ্টা কাটানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থার চিন্তা বা প্রয়োগ সেভাবে কোথাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কলকাতার মতো শহরে এইসব 'চটজলদি' খাবার ব্যবসার একমাত্র প্রতিযোগী বলতে গেলে ফুটপাথের স্ন্যাকস্-বারগুলো। যারা এগ্‌রোল থেকে শুরু করে 'চিকেন চাওমিন' সবই যোগান দিয়ে যাচ্ছে কিছু ধরনের ক্রেতাকে। কিন্তু সব শ্রেণীর ক্রেতার রুচি-মনন-স্ট্যাটাসের উপযোগী হতে পারে না এগুলি—হওয়া সম্ভবও নয়। তাই আরো বেশি বেশি করে এগিয়ে আসছে দেশি-বিদেশি নানান খাদ্য ব্যবসায়ী। [এ-ক্ষেত্রে 'কমিউনিটি কিচেন' (Community kitchen) ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে হয়ত কিছুটা দূর 'বিকল্প ব্যবস্থা' হিসেবে দাঁড়াতে পারতো। উপযুক্ত মানের খাবার চটজলদি তুলে হয়ত দেওয়া যেত, পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও কিছু সুযোগ ছিল অথচ কলকাতায় ইদানীংকালে গড়ে ওঠা বিশাল বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্সের (যেখানে ১০০ থেকে ৪০০/৫০০ পরিবার থাকছেন) কোথাও এমন ধরনের ব্যবস্থা চালু করার সামান্যতমও চেষ্টা হয়েছে বলে জানা নেই।] রাস্তার স্ন্যাকস্-বারগুলি যেমন সবার রুচি ও ইচ্ছে অনুযায়ী চাহিদা মেটাতে পারে না, তেমনি এগুলির গুণমান তথা তাদের তৈরি খাদ্যগুলো কতখানি স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়েও ক্রেতার সন্দেহ ও ভয়ের অবকাশ রয়েছে। সেখানে এইসব বৃহৎ কোম্পানিগুলো স্রেফ তাদের আগ্রাসী

প্রচারকৌশলে ক্রেতাকে মুগ্ধ এবং প্ররোচিত করে তাদের তৈরি প্যাকেটগুলির প্রতি। ফুড স্পেশালিটি্জ অব ইণ্ডিয়া (FSL) প্রচার এবং বিক্রি বাড়ানোর জন্য কি পরিমাণ খরচ করেছে তা লক্ষ্য করলে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হবেন। ১৯৮৪ সালে এ-বাবদ তারা খরচ করেছিল প্রায় ৫১৬ লাখ টাকা, ১৯৮৫-তে ৬৩৭ লাখ এবং ১৯৮৬-তে তা বেড়ে হয়েছে ৯০৮ লাখ টাকা।

ফাস্ট ফুডের অন্য সুবিধে

'বুথ এবং স্মিথ'-এর ভারতীয় সংস্করণ 'অল সিজন ফুড লিমিটেড'। এর নামকরণ থেকেই প্রচারকৌশলটা অনুধাবন করা সম্ভব। বছরের যে কোনো ঋতুতে যা খুশি খেতে পাবার সুযোগ এনে দিচ্ছে ফাস্ট ফুড। বিশাল বিলবোর্ড-এর ছবিতে থরে থরে সাজানো খাবার কিংবা টিভির পর্দায় যখন ক্রিকেটায় গাভাসকার সেই সব খাদ্য তুলে ধরেন—তখন চোখের তারা চক্‌চক করে ওঠে বৈকি। সারা বছর ধরে কোনো একটা প্রিয় খাবার খেতে পাবার সুযোগ যদি এনে দিতে পারে ফাস্ট ফুড তাতে অখুশি হওয়ারও কোনো কারণ নেই, হয়ত পুরোপুরি ঠিক সেই স্বাদের সেই গন্ধের প্রাকৃতিক খাবারটা মেলে না—কিন্তু যতটা মেলে সেটাও কম নয়। এ-ভিন্ন ফাস্ট ফুডের স্বপক্ষে যে-সব যুক্তিগুলো দেওয়া হয়, তা হলো খাদ্যের অপচয় রোধ করতে এগুলির কিছু ভূমিকা রয়েছে। কোনো ঋতুতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত খাদ্য-সামগ্রী সংরক্ষণ করে বহুদিন ধরে ব্যবহার করার সুযোগ এনে দিচ্ছে ফাস্ট ফুড। ফাস্ট ফুডের দৌলতে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এমন বহু দ্রব্য-সামগ্রীকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা পূর্বে ব্যবহার করার কথা ভাবা যেত না। যেমন সয়াবিনের থেকে তৈরি নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রী। কিছু ধরনের সামুদ্রিক মাছ যা সরাসরি রান্না করে খাওয়া যেত না—তা দিয়ে কেক্ বানিয়ে আজ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

ফাস্ট ফুড ও মিথ্যে প্রচার

চটজলদি খাবার বা ফাস্ট ফুডের ব্যবহার করে পরিবারের অর্থসাশ্রয় হবে ৩০%—দাবি করেছে অল সিজনস ফুড লিমিটেড। এমন নির্ভেজাল মিথ্যে আর হয় না। দাবি করা হয়, ফাস্ট ফুড ব্যবহার করে বাড়িতে জ্বালানীর

খরচ বাঁচবে। কথাটা আপাতভাবে ঠিক। কিন্তু ফাস্ট ফুড তৈরি করতে যে-পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে—তা এককথায় অপরিমিত। বাড়িতে জ্বালানীর খরচ বাঁচে বটে কিন্তু তার কয়েক গুণ থেকে কয়েকশত গুণ শক্তি ব্যয়িত হয় প্রাকৃতিক খাদ্যগুলিকে নানান ধরনের ফাস্ট ফুডে পরিণত করার প্রক্রিয়ায়। ফলত ফাস্ট ফুডের উৎপাদন খরচ বেশি পড়বেই। কিন্তু সেই হিসেবটাও যথেষ্ট নয়। কোম্পানি তার উপর কয়েকগুণ লাভের সুযোগ গড়ে নিতে পারে বলেই ফাস্ট ফুড তৈরি করার দিকে তাদের এত ঝোঁক। ফাস্ট ফুড তৈরি করার জন্য তারা যা খরচ করে প্রায় সমান টাকা তারা ব্যয় করে শুধু প্রচারের জন্য, আর প্রচার বাবদ খরচের সেই পয়সা যে ক্রেতাদের ঘাড় ভেঙেই তুলে নেয় তা বলাই বাহুল্য। এদেশের ছবি না পাওয়া গেলেও আমেরিকার ব্রেকফাস্ট ফুড ইনডাস্ট্রি (যারা সেদেশের ৮৫% ব্রেকফাস্ট-এর বাজার দখল করে রয়েছে) শুধু প্রচার ও প্যাকেজ বাবদ তাদের মোট খরচের ৪২ শতাংশ ব্যয় করেছে ১৯৬৪ সালে, আর মূল উপাদানের জন্য মাত্র ২০%। গত ২৩ বছরে প্রচার খরচ আরো বেড়েছে বিশালাকারে।

১০০ গ্রামের এক প্যাকেট ম্যাগীর বাজার দর হলো চার টাকা—যা তৈরি করতে বড়োজোর কয়েক পয়সা খরচ পড়ে। প্রচার, প্যাকেজিং আর লাগামছেঁড়া লাভ তুলে নিতে গিয়ে কোম্পানি এক অস্বাভাবিক দাম বেঁধে দিয়েছে বস্তুটির। এ-ব্যাপারটা শুধু ম্যাগী নয়—প্রায় সব ধরনের ফাস্ট ফুডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনেকে এই জায়গা থেকে উল্টে প্রশ্ন তোলেন—এমন 'দামী' জিনিসের প্রতি সাধারণ তথা গ্রামের দরিদ্র ক্রেতারা কি উৎসাহিত হবেন? তারা আরো বলে থাকেন, যেহেতু তাদের জীবন-যাত্রা দ্রুত নয় সেহেতু গরীব মানুষদের ফাস্ট ফুডের খপ্পরে পড়বারও কোনো সম্ভাবনা নেই। ধারণাটা বাস্তবের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। প্রথমত উঁচুতলার মানুষদের রুচি, অভিলাষ তথা তাদের 'সংস্কৃতি'কে সাধারণভাবে নিচুতলার মানুষরা অনুকরণ করে চলে। খাদ্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গরীব মানুষরা দু-বেলা ফাস্ট ফুড না খেলেও তাদের 'স্বপ্নে'র খাবার ফাস্ট ফুডের পেছনে যে যথাসাধ্য দৌড়োবার চেষ্টা করবেন তা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কোল্ড ড্রিংকস, হেলথ ফুড (হরলিকস, কমপ্লান) ম্যাগী নুডল্‌স তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাজারে আসা আরও নতুন নতুন চটজলদি খাবার তাদের শারীরিক পুষ্টি তথা পরিবারের অর্থনৈতিক

সংকট আরো একটু যে জটিল করে তুলবে তা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা চলে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা ফাস্ট ফুড সম্পর্কে উঠে আসে, তা হলো খাদ্যের গুণমান ও পুষ্টি সম্পর্কীয়। স্বাভাবিক খাদ্যের জায়গায় এইসব নতুন খাবার-গুলি শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কতখানি যোগান দিতে পারবে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। ফাস্ট ফুড তৈরির প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণ, খনিজপদার্থ, ভিটামিন নষ্ট করে দিতে পারে—অবশ্য এসব কিছু আবার বাইরের থেকে খাদ্যবস্তুগুলিতে জুড়ে দেওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ বিজ্ঞান-কারিগরীর চোখে ব্যাপারটা সেই হিসেবে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হবে না খাদ্যের রাফেজ বা তন্তুজাতীয় পদার্থের অভাব ঘটলে। ফাস্ট ফুড তৈরি করার প্রক্রিয়ায় খাদ্যের 'সেলুলোজ' সাধারণভাবে অপসারিত হয়ে থাকে। এই সেলুলোজ মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মনে করা হয় খাদ্যে এর অভাব ঘটলে পরিপাকতন্ত্রের নানান ধরনের বিপত্তি তথা, ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করলে ফাস্ট ফুডে এটা বাইরের থেকে নতুনভাবে জুড়ে দেওয়াও সম্ভব। তৃতীয়ত যে-ব্যাপারটা ফাস্ট ফুডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তা হলো এতে ব্যবহৃত নানান ধরনের সংরক্ষক রঞ্জক তথা স্বাদ-গন্ধ বজায় রাখার জন্য যে-সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো কতখানি নিরাপদ? MSG নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর থেকেও বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যাডিটিভ* (Additive) হিসেবে—বিশেষত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। তাছাড়া এসবে ব্যবহৃত আরো নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলি সম্পর্কে পুষ্টি ও

*** ফুড অ্যাডিটিভ**

অ্যাডিটিভ সেগুলোকেই বলা হয়, যার কোনো পুষ্টিমূল্য নেই কিন্তু খাদ্যের সঙ্গে এগুলি মেশানো হয় খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আকার-আকৃতি আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে। এছাড়া ফুড অ্যাডিটিভ খাদ্যের পচনশীলতা রোধ করে অর্থাৎ সংরক্ষক (Peservative) হিসেবে এগুলির গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এরকম তিনহাজার বিভিন্ন ধরনের ফুড অ্যাডিটিভ ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ভ্যানিলা—গন্ধের জন্য, সোডিয়াম বেনজোয়েট—সংরক্ষক হিসেবে, স্যাফ্রন—রঙ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফাস্ট ফুডে এগুলির ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। অধিকাংশ ফুড অ্যাডিটিভ শরীরের ওপর কি প্রভাব ফেলে তা এখনো অজ্ঞাত। তবে বেশ কিছু ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ১৯৬৯ সালে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা চলেছে ফুড অ্যাডিটিভের ওপর এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে পর্যাপ্ত ধারণা আজো গড়ে ওঠে নি—অথচ অন্যদিকে
সেগুলোর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-ভিন্ন ফাস্ট ফুড একটা
দেশের নিজস্ব রুচি, খাদ্যাভ্যাস তথা খাদ্য-সংস্কৃতিতে কিছু না কিছু
পরিবর্তন আনবেই। অতীত এবং বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্বব্যাপী খাদ্য
ব্যবসার যে কদর্য চিত্রটি তুলে ধরেছে, তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ
রয়েছে। বিশ্বের খাদ্য-ব্যবসা আজ ক্রমশই কয়েকটি বৃহৎ বহুজাতিক খাদ্য-
ব্যবসায়ীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং এক কথায় অসম্ভব ক্ষমতার
অধিকারী তারা। একচেটিয়া কারবারের সুযোগে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের
আস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ইচ্ছে ও সুবিধে মতো। প্রাকৃ-
তিক খাবার অর্থাৎ বিভিন্ন শস্যকণা তারা যে-দামে কেনে তার থেকে বিশ-
ত্রিশ গুণ বেশি দামে তারা বিক্রি করে—মাঝখানে যন্ত্রে গুঁড়িয়ে প্যাকেটে
কিংবা কৌটোয় পুরে দিতে পারে বলেই তাদের এতো বোলবোলাও।
আর স্বাভাবিকভাবেই তারা চেষ্টা করে, পৃথিবীর সর্বত্র এক ধরনের একটি
সাধারণ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে। তখন আফ্রিকা কিংবা ভারতের সব-
থেকে পেছিয়ে থাকা গ্রামটির অত্যন্ত গরীব মানুষটিও তাদের ক্রেতা বনে
যাবে। বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসা তখন সরলরেখায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
তাই সুনিপুণ কৌশলে ক্রেতার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, রুচি-অভিরুচি, ক্রেতার প্রয়ো-
জনীয়তা সমস্ত কিছুই তৈরি করে দিচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত করছে এই সব খাদ্য-
ব্যবসায়িরা। আর এই 'নতুন বাজার তৈরি করার অর্থ জীবনধারা পাল্টানো'
('Creating a new market means changing a way of life')
অর্থাৎ জীবনধারায় পরিবর্তনের জন্য খাদ্যাভ্যাস পাল্টানোর যেমন
প্রয়োজন ঘটছে—উল্টোদিকে নতুন খাদ্যাভ্যাস (বা অন্য যে কোনো
অভ্যাস) আবার সেই জনগোষ্ঠী বা সেই সমাজের আদলটাকেও ধীরে ধীরে
পাল্টে দিতে থাকে। তখন সেই অনুযায়ী শুধু সামাজিক রীতি-নীতি বা
এককথায় সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে না—তা সেই জায়গার বা সেই দেশের
উৎপাদন ব্যবস্থা প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে থাকে। আজ কোন্
দেশে কি শস্য উৎপাদিত হবে এবং কিভাবে তা বাজারজাত হবে তা
বকলমে নিয়ন্ত্রণ করে দেয় বা দিচ্ছে এইসব বৃহৎ বহুজাতিক খাদ্য-ব্যবসা-
দারেরা। নিজের দেশের উপযোগী শস্য তৈরি বন্ধ করে এশিয়া আফ্রিকার
বহু দেশ চা-কফি-চিনি বা অন্য যে-কোনো শস্যদানা তৈরি করতে বাধ্য
হচ্ছে, খাদ্য ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কৌশলের শিকার হয়ে। আফ্রিকা

ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের ক্ষেত্রে কথাটা অত্যন্ত নগ্নভাবে পরিস্ফুট। অসম্ভব রকম ক্ষমতার অধিকারী এই সমস্ত ব্যবসাদারেরা তাদের পণ্যের 'গুণাগুণ তৈরি করে' কাগজের পাতায়, রঙীন পর্দায়। শুধু তাই নয়, এসবের ওপর সমস্ত ধরনের তথ্য ও তত্ত্বকে তারা প্রায় পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে—ক্রেতা সেখানে নির্বাক, অসহায়। সাম্প্রতি বহুদেশের উজ্জীবিত ক্রেতা আন্দোলন তাদের তথ্য নিয়ন্ত্রণের নিরেট প্রাচীরে কিছু ফাটল ধরিয়েছে এবং তা চুঁইয়ে যে-সব তথ্য আমাদের হাতে এসে পড়ছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি সেগুলির চরিত্রও বেশ ভয়াবহ। ম্যাগীর প্রস্তুত-কারক F S L হলেও মূল নিয়ন্ত্রক নেসল (Nestle)—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য-ব্যবসায়ী। তাদের চরিত্র সম্পর্কে ক্রেতাদের কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক। এশিয়া এবং বিশেষত আফ্রিকায় অত্যন্ত পরিকল্পিত প্রচারের সাহায্যে তাদের তৈরি টিনের দুধকে বুকের দুধের বিকল্প হিসেবে তারা দাঁড় করিয়েছে। ফলশ্রুতিতে অপুষ্টি-ডায়রিয়ায় মারা গেছে শুধু একটা দশকেই কয়েক লাখ শিশু—যা সে দেশগুলিতে 'ল্যাক্টোজেন সিনড্রোম' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও ১৯৮১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা যখন বেবি ফুডের ওপর প্রচারবিধি বেঁধে দিলেন তখন অন্যসব কোম্পানি মেনে নিলেও নেসল তা মানে নি। প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রেতা সমবায় সমিতি নেসলের সমস্ত দ্রব্য বয়কটের ডাক দিলে ১৯৮৪ সালে তারা সেটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কার্যত সারা বছর নেসলে শুধু প্রচার বাবদ যা খরচ করে, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার সারা বছরের বাজেটের থেকে অনেক বেশি। গ্রীসের সামরিক শাসককে হাত করে সেদেশের দুধের ব্যবসাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে নেসল ১৯৭২ সাল থেকে—শোষণের সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাগুলোকে আইনানুগ করে রেখেছে অযৌক্তিক সব চুক্তির সাহায্যে। নেসলের নেসকাফে, আফ্রিকার মায়েরা তাদের দেড়-দু-বছরের বাচ্চাকে খেতে দেয়—কারণ নেসল প্রচার করে এটি পুরুষকে শক্তিশালী, মেয়েদের আনন্দ-মুখর এবং বাচ্চাদের বুদ্ধিমান করে তোলে (Nescafe makes men stronger, women more joyful and children more intelligent)। যারা এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক অন্যায় প্রচার করতে পিছপা হয় না, তাদের 'সততা' যে কত উচ্চমার্গের এবং তাদের বাজারজাত খাদ্যদ্রব্যগুলির গুণাগুণ কি ধরনের হতে পারে তা বুঝিয়ে বলার দরকার রয়েছে কি? এদেশে F S L ম্যাগী সস্ বাজারে চালু করার সময় সমস্ত ধরনের ব্যবসায়িক নিয়মনীতি ও

দেশের আইনকানুনকে নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করে যায়, শুধু তাই নয় তার জন্য তাদের কোনো খেসারৎও দিতে হয় না, ব্যাপারটা কখনোই প্রকাশিত হতো না—এদেশের ক্রেতাদের বকলমে ঠকিয়ে ওজনে কম দিয়ে তারা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারতো, যদি না এদের আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী কিষাণ প্রোডাক্টস লিমিটেড এ-নিয়ে বেশ হল্লা শুরু করতো। নেসল একই নামে নুডল্ আর সস্ বিক্রি করে মালয়েশিয়ায় এবং সেখানেও ম্যাগী নুডল্ ও সসে MSG মেশানো নিয়ে সরকারি ও ক্রেতা সমবায় সমিতিদের প্রতিবাদ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে নানান মিথ্যে বক্তব্য আর বুজরুকিকে মূলধন করে। নেসলের টম্যাটো কেচাপ থেকে শুরু করে ক্রিমমিল্ক-চকোলেট ইত্যাদিতে জিলাটিন মেশানো থাকে, যে-জিলাটিন তারা সংগ্রহ করে গরু-শুয়োরের চামড়া, টেণ্ডন ও লিগামেণ্ট থেকে, অথচ তা তারা বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেখেন না কারণ, নিরামিষাশী তথা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা তাহলে এগুলি আর ছোঁবেন না। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের কথা ভাবা বা তাদের কোনো ধরনের মর্যাদা দিতেই তারা নারাজ। সম্প্রতি তাদের আর এক কীর্তি হলো তৃতীয় বিশ্বে তেজস্ক্রিয় দুধের ব্যবসা চালানো। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ড থেকে শুরু করে এশিয়া উপমহাদেশের বহু দেশে যে-সব তেজস্ক্রিয় দুধ ধরা পড়েছে সেগুলোর একটা বড়ো অংশ দখল করে আছে নেসপ্রে, ল্যাক্টোজেন ইত্যাদি নামের নেসলের দুধ।

ম্যাগী নুডল্ নিয়ে এরপর আর বিশেষ কিছু বলার থাকে কি?

সূত্র:

1. How the other half Dies ; Susan George (1978)
2. Gentleman ; July '87
3. Utusan Konsumer ; Dec '76 & April '86
4. Science Today ; July '86
5. Insult or Injury ; Charles Medawar, 1979
6. Sunday ; 31st May to 6 June '87

□ স্মরজিৎ জানা

প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাঁচ

একটা বাচ্চামতো ছেলে দু-টো ঘুষি কিংবা কয়েকটা ক্যারাটের প্যাঁচে আপনার মতো একটা লোককে ধরাশায়ী করে দিল। কারণ তার শরীরে এবং হাতের মাংসপেশীতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এরপর বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবে এবং একগ্লাস শক্তিবর্ধক প্রোটিন সমৃদ্ধ পানীয় খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আর এ-ছবি দেখতে দেখতে আপনি একটু একটু করে ঝিমিয়ে যাবেন, আপনার গোল গোল চোখ দু-টো নেতিয়ে পড়বে হতাশায়—হায় রে আমার বাচ্চাটাকে যদি এমন একটা কিছু খাওয়াতে পারতাম।

ও বাড়ির গৃহিণীর খেদ সনাতনী—বাচ্চাটা কেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। যদি একটু মাছ-মাংস রোজ খাওয়াতে পারা যেত—কিন্তু বাজারে যা দাম! কারোর শরীর দুর্বল, কারোর অঙ্কে মাথা খোলে না, কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে পারে না, এ-সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে প্রোটিনের অভাব, মাছ, মাংস কিংবা কোনো বলকারক পানীয় না খেতে পারার দৈন্য—এমন ধারণা বলতে গেলে ধনী-গরীব ছোট-বড় প্রায় সব মানুষেরই। প্রোটিনের প্রতি রয়েছে আমাদের এক অপরিসীম মোহ, আর প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য বলতে ক্লাস ফাইভের ছেলেটাও গড়গড়িয়ে বলে দেবে—মাছ-মাংস-দুধ বা ডিমের কথা। শহরের তুখোড় ছেলেরা হয়তো এর সঙ্গে যোগ করবে প্রোটিনেক্স, নিউট্রামুল বা প্রোটিনিউলের নাম। আসলে এটাই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, শরীর ভালো রাখতে গেলে খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আর প্রোটিন বলতে মাছ-মাংস ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা যেতে পারে? আসলে স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা উচিৎ এমন ধারণাটা আমাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদশক ধরে বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রোটিনের প্রতি এই অহেতুক মোহ। কিন্তু কেন এবং কার স্বার্থে?

প্রথমে পুষ্টি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক। আমরা আমাদের

শরীরের জন্য যে সমস্ত খাবার খাই তা মূলত তিন শ্রেণীতে পড়ে—কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট। এছাড়া মিনারেল ও ভিটামিন রয়েছে। আমাদের শরীর টিঁকে থাকার জন্যে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্যে তার প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্যদ্রব্য থেকে আহরণ করে। শরীরের কোষগুলির কাজ-কর্মের জন্যে যে-শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে ক্যালরি-র মাপকাঠিতে প্রকাশ করা হয় (১ ক্যালরি = ১ গ্রাম জলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়)। খাওয়ার পর ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে ৪ কিলো ক্যালোরি, ১ গ্রাম ফ্যাট থেকে ৯ কিলো ক্যালোরি ও ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা ভালো ভিটামিন বা মিনারেল থেকে কোনো ক্যালোরির যোগান আসে না। মূল ঐ তিন ধরনের খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রয়োজনীয় শক্তির ৬০-৭০ শতাংশ এবং ফ্যাট থেকে বাকিটা অর্জন করা প্রয়োজন। আমাদের শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন মূলত তাপ উৎপাদনের জন্য নয়। শারীরবৃত্তীয় (কোষ গঠন, এনজাইম ইত্যাদি তৈরি করা) কতকগুলো বিশেষ কাজ সমাধা করার প্রয়োজনে প্রোটিনের গুরুত্ব। তাই আমাদের খাদ্যে কিছু প্রোটিনের প্রয়োজন। এটা হচ্ছে 'সুষম খাদ্যে'র মূল ভিত্তি। এখন প্রশ্ন, এই প্রোটিনের প্রয়োজনটা কতোটুকু ? প্রোটিন খরচ করার ব্যাপারে আমাদের শরীর কিন্তু ভীষণ রকমের কৃপণ। এক জিনিসই বার বার সে ব্যবহার করে এবং নষ্ট প্রায় হতে দেয় না বললেই চলে। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য এর দৈনিক প্রয়োজন হলো, ব্যক্তিটির ওজনের কিলো প্রতি ·৫২ থেকে ·৫৭ গ্রাম মাত্র (WHO/FAO), অর্থাৎ একজনের ওজন যদি ৫০ কিলো-গ্রাম হয় তবে তার দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন হবে ·৫৭ × ৫০ = ২৮·৫ গ্রাম মাত্র। এখানে মনে রাখা দরকার, হিসেবের সময় বাড়তি দিকটাই ধরা হয়। অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এটুকু প্রোটিন খেলে সামান্য বেশি হতে পারে কিন্তু কম যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে এ-হিসেব। অবশ্য বাড়ন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হিসেবটা একটু বেশি। কারণ নতুন দেহকোষ গঠনের জন্য প্রোটিনের কিন্তু বাড়তি প্রয়োজন হয়। কিছু সেটাই বা কতো-টুকু ? এ-ব্যাপারে সারাবিশ্বে কয়েকদশক ধরে ব্যাপক জালিয়াতি চলছে, যার শিকার হয়েছি আমরা, মূলত পেছিয়ে থাকা তৃতীয়-বিশ্বের দেশগুলি, যেখানে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ শিশুই হলো অপুষ্টির শিকার। আর এই অপুষ্টির কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল প্রোটিনের অভাব। সে

কথায় পরে আসছি। তার আগে এই প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ নির্ণয়ে কি রকম কারচুপি চলেছিল লক্ষ্য করুন। এটা বোধহয় সবারই জানা, পুষ্টিবিদ্ ও পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের গবেষণা ব্যয়ের একটা বড় অংশ আসে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছ থেকে। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল অফ আমেরিকা একবছর বয়সী বাচ্চাদের প্রোটিনের প্রয়োজন নির্ধারিত করলেন কিলো প্রতি ৩৩ গ্রাম। ১৯৫৭ সালে FAO তার বিভিন্ন গবেষণা থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে, এর প্রয়োজন মাত্র কিলো প্রতি ২ গ্রাম। ১৯৬৬ সালে ম্যাকলারেন সাহেব প্রোটিন নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যাপারটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। হাম-বুর্গের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেন তা কিন্তু ঐ সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত পুষ্টিবিদ্‌রাই মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, সম্মেলনে প্রকাশিত কাগজপত্রে তার পুরো বক্তব্যই চেপে যাওয়া হয়। যাই হোক, অবশেষে ১৯৭১ সালে WHO ও FAO যুগ্ম ঘোষণায় প্রকাশ করলেন আসলে এক বছর বয়েসী বাচ্চাদের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হবে কিলো প্রতি ১.২ গ্রাম মাত্র। এদিকে তৃতীয়-বিশ্বে ততোদিনে বাচ্চাদের অপুষ্টির কারণ হিসেবে প্রোটিনের অভাব জোরদার 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ তখন বড় বেশি প্রয়োজন হয়েছিল আমেরিকায় জমে থাকা পাহাড় প্রমাণ আমিষ দ্রব্যগুলি তৃতীয়-বিশ্বের বাজারে চালান করার। শুধু তাই নয় সেগুলি শেষ হলে ফ্যাক্টরিতে তৈরি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের একটি জোরদার বাজার তৈরি করে ফেলা গেল ততোদিনে। তাই ১৯৬৪ সালের পর, এ-সবের এক রমরমা বাজার হলো আমাদের মতো দেশগুলিতে, চলে এলো প্রোটিনেক্স, প্রোটিনিউলস, আরো কতো কি। সে-হিসেবেও পরে আসছি। এদিকে ম্যাকলারেন সাহেবও প্রচার শুরু করে দিয়েছেন—সুতরাং সত্তরের দশকে টনক নড়লো অনেকেরই। আমাদের দেশের পুষ্টিবিজ্ঞানীরাও পর্যাপ্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই 'প্রোটিন অপুষ্টি'র তত্ত্বটির ভাঁওতা ধরে ফেললেন। আসলে মূল সমস্যাটা ছিল প্রয়োজনীয় তাপশক্তি যোগান দিতে না পারাটা, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগান দিতে না পারা ; সুতরাং ঘাটতি খাদ্যের, প্রোটিনের নয়।

মজাটা কেমন হয় দেখুন। আমাদের শরীরে প্রাথমিক প্রয়োজন শক্তির। আমরা যাই খাই না কেন, শরীর তার প্রয়োজনীয় শক্তিটাই

পূরণ করতে চাইবে প্রথম, তা সে ফ্যাট, প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) যাই খাই না কেন। যদি প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য ফ্যাট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি থেকে যায় তাহলে শরীর তা প্রোটিন পুড়িয়েই জোগাড় করে নেবে। প্রোটিনের অন্য কোনো কাজ সেখানে গুরুত্বই পাবে না। কেউ যদি ভাবেন যে, অন্য কিছু না খেয়ে প্রচুর প্রোটিন খাবেন, সেখানেও একই ব্যাপার ঘটবে—শরীর প্রথম তার শক্তির প্রয়োজনটা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবে—তারপর কিছু অতিরিক্ত থাকলে তবেই প্রোটিনের অন্যান্য কাজগুলি হবে। একে তো এতে আপনার আর্থিক খরচ অনেক বেশি হবে, শুধু তাই নয়, অহেতুক প্রোটিন পুড়িয়ে শক্তি অর্জনের জন্য এই বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলির (Organs) ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হবে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পরবর্তী জীবনে।

আবার প্রোটিন খাওয়ার সঙ্গে শক্তি বা বুদ্ধি বাড়ার ব্যাপারটা কি করে যে এলো তা ভাবতে বেশ অবাকই লাগে। দেহকোষ গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে শক্তি বাড়া, বা বুদ্ধি বাড়ার কি যোগ রয়েছে ? সহজ কথায় 'শক্তি খরচ করলে শক্তি বাড়ে, যেমন বুদ্ধি খরচ করলে বুদ্ধি বাড়ে' অর্থাৎ শারীরিক শক্তি বা মাংসপেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় শারীরিক কাজকর্ম, ব্যায়াম, অর্থাৎ পেশী সঞ্চালনে ও তার পরিচর্যার মাধ্যমে। ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমেই পেশী শক্তিশালী ও সুগঠিত হয়ে ওঠে। তার জন্য প্রোটিন খাওয়ার দরকার হয় না। গাদা গাদা প্রোটিন খেয়ে পেশী সঞ্চালন না করলে আদৌ শক্তি বাড়বে না। তেমনি চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমেই বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ ঘটে—তার জন্য কোনো প্রোটিন সমৃদ্ধ পানীয়ের প্রয়োজন নেই। আরো মজার ব্যাপার হলো, অনেকের ধারণা এক সময় বেশি কিছু প্রোটিন খেয়ে শরীরে জমা করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজনে তা আবার কাজে লাগানো যাবে। ব্যাপারটা একদমই ভুল। শরীরে শক্তির প্রয়োজন এবং প্রোটিনের নির্ধারিত প্রয়োজনটুকু মেটার পর যে-অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য তা সে প্রোটিন বা শর্করা যাই হোক না কেন, পরিবর্তিত করবে চর্বিতে, শরীর সেই চর্বি জমিয়ে রাখে শক্তির আধার হিসেবে। বিশেষ অবস্থায় (অনশনে) শরীর এই চর্বি পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় শক্তিটুকু বার করে নেয়। বেশির ভাগ সময়ে শরীরের স্থূলতা অবশ্য ভালোর চেয়ে মন্দই করে বেশি।

স্রেফ ব্যবসার খাতিরে প্রোটিন খাওয়ানোর ফলাও কারবার শুরু হয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে। শুধু সত্তরের দশকেই ইউরোপে আমিষ খাওয়া বেড়েছে দ্বিগুণ, যদিও সেই তুলনায় জনসংখ্যা এক শতাংশ হারেও বাড়েনি। আর এই প্রোটিন গেলানোর গুনাগার দিতে হচ্ছে আমাদেরই। কথাটায় একটু অবাক লাগছে, তাইতো? আসলে এই মাংস তৈরি করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর উদ্ভিজ্জ সামগ্রীর। প্রকৃতিতে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীরা তাদের প্রোটিন সংগ্রহ করে, আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াটায় কি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয় দেখুন। মোটামুটি ৮ থেকে ১০ কিলোগ্রাম তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের রূপান্তরে পাওয়া যায় এক কিলোগ্রাম মাংস। যখন মূল খাদ্যের অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ভুগছে তখন এই মাংস খাওয়ার পেছনে ছোটা শুধু বাতুলতা নয়, এক ধরনের অপচয়ও বটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মোট হিসেব করলে দেখা যাবে—প্রতিটি আমেরিকান বছরে প্রায় ৮২০ কিলো গ্রাম শস্য পায়। তারমধ্যে মাত্র ৯০ কি. গ্রা. সে নিজে খায়, বাকি ৭৩০ কিলো পশুকে খাওয়ায়। মোট আবাদী জমির অর্ধেকেরও বেশি মানুষের খাদ্যের পরিবর্তে গবাদি-পশুর খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাবারের উপযোগী ২০ টন খাদ্যশস্য গরুকে খাইয়ে পাওয়া যায় মোট ২ টন প্রোটিন। এই হচ্ছে অবস্থা। ব্রিটেনে উৎপাদিত শস্যের ⅘ অংশ গবাদি পশুকে খাওয়ায়। রাশিয়া তার উৎপাদিত শস্যের ⅓ অংশ পশুকে খাওয়ায়। কেবলমাত্র ক্যালিফোর্নিয়ার দেড়গুণ জমিতে খাদ্য ফলালে সারা পৃথিবীর লোককে খাওয়ানো যেত। আজ ইউরোপ, আমেরিকার পশু-খাদ্যের জন্য এশিয়া, আফ্রিকার মনুষ্যখাদ্য উৎপাদনে অক্ষম জমিগুলি গবাদি-পশুর খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিংবা নিজের দেশে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের অহেতুক প্রোটিন প্রীতির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

আশকথা-পাশকথা তো অনেক হলো, তা এই প্রোটিন পাওয়া যায় কিসে? আগের আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার কিন্তু বেরিয়ে এসেছে যে, প্রোটিনের মূল আধার মাংস নয়, উদ্ভিজ্জ খাদ্যসামগ্রী। সেখান থেকেই প্রাণীজ প্রোটিন তৈরি হয়। তাই আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্য থেকে শুরু করে সবুজ শাকসবজি, সবেতেই পেতে পারি। এবং কার্যত সেখান থেকে যা পাওয়া যায়, তা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। কারো কারো ধারণা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন নিম্নমানের, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। প্রথম

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণাটা আজ বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য তুলনামূলকভাবে প্রাণীজ প্রোটিনে আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব অ্যামাইনো অ্যাসিড (প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড হয়) থাকলেও আমরা যদি শুধু-মাত্র কোনো একটি উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে প্রোটিন অর্জনের কথা না ভাবি, তবে এ প্রশ্ন বলতে গেলে গুরুত্বহীন। অর্থাৎ শুধু চাল বা ডাল নয়, চাল ডাল কিংবা কোনো সবজি সমন্বয়ে খাই (যা সাধারণত সবাই খাই) তাহলে পর্যাপ্ত গুণমানের প্রোটিন পেতে অসুবিধে নেই। আবার কোনো প্রোটিন যুক্ত খাদ্য থেকে শরীর কতোখানি নাইট্রোজেন গ্রহণ করলো তার ওপর সেই প্রোটিনের গুণমান নির্ধারিত হয়। একে বলে প্রোটিনের Biological value। এক্ষেত্রে ডিম সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে, পরে মাছ-মাংস এবং এরপরে ডাল, তারও পরে রয়েছে দুধ। এটা ঠিকই, মাছ, মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু ডালে বা সবজিতে এর পরিমাণটি আদৌ কম নয়।

প্রতি ১০০ গ্রামে প্রোটিনের পরিমাণ

গম	১২·৭	গ্রাম	দুধ (গরু)	৩·২	গ্রাম
চাল	৮·৫	”	” (মোষ)	৪·৩	”
ডাল (মুগ)	২৪·৫	”	ডিম	১৩·৩	”
কচু	৩	”	মাংস	২০·২৩	”
সীম	৭	”	মাছ	১৮·২২	”
বরবটি	৩·৩	”	বাদাম	২৬·৭	”
সবুজ শাকসবজিতে	৩·৭	”			

আগের হিসেব অনুযায়ী একজন ৫০ কিলো ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন দৈনিক ২৮·৫ গ্রাম প্রোটিন। সে যদি সারাদিনে স্রেফ ৪০০ গ্রাম চাল এবং ১০০ গ্রাম ডাল খায় তাহলেই পর্যাপ্ত গুণমানের যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন পেয়ে যাবেন।

৪০০ গ্রাম চালে প্রোটিনের পরিমাণ	৩৪ গ্রাম
১০০ ,, ডালে ”	২৪·৫ গ্রাম
১০০ ,, সবুজ শাকসবজিতে ”	৪ গ্রাম (গড়ে)
১০০ ,, আলু কচু ইত্যাদিতে ”	৪ ,, (গড়ে)
	মোট = ৬৬·৫ গ্রাম

অর্থাৎ এই সাধারণ খাবারে যে পরিমাণ প্রোটিন পাচ্ছি তা যে পর্যাপ্ত সেটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাতে তো আর ব্যবসা চলে না, তাই প্রয়োজন পড়ে হরেক-রকমের প্রচার আর নানান ধরনের তত্ত্বের। প্রোটিন অপুষ্টির তত্ত্বটির অসারত্ব শুধু আমাদের দেশে নয়, এশিয়া-আফ্রিকার বহুদেশে পরীক্ষাসহযোগে প্রমাণিত হলেও আমাদের মানসিকতায় 'প্রোটিনের অভাববোধ' মনে হয় পাকাপাকিভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে। তাই ঘরের বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের পর্যন্ত আজ প্রোটিন খাওয়ানোর হিড়িক পড়ে গেছে, আর তা ভাত-ডালের প্রোটিন নয়—এমন কি মাছ-মাংসও নয়। বাজার থেকে কিনে আনা হয় হরেক-রকমের প্রোটিন সমৃদ্ধ টিনের কৌটো—নিউট্রামুল, প্রোটিনিউল, কমপ্লান, প্রোটিনেক্স কতো তাদের নাম। কিন্তু কি থাকে এতে, কতো পরিমাণে? আর কতোই বা তাদের দাম পড়ে, জানেন? নিচের ছোট্ট হিসেবটায় মনে হয় অনেকেই সম্বিৎ ফিরে পাবেন।

খাদ্যদ্রব্য	প্রোটিনের পরিমাণ (%)	জৈবিক মান [Biological value] (%)	১৯৮৭ সালে প্রতি কি.গ্রা.-র দাম (টাকা)	'৮৭ সালে প্রতি ১০০ গ্রাম প্রোটিনের দাম (টাকা)
গম	১২.৭	৫০	৩.০০	২.৫৫
চাল	৮.৫	৭০	৪.০০	৫.৭৫
ডাল	২৪.৫	৬০	৮.০০	৪.০০
বাদাম	২৬.৭	৫৪	১৬.০০	৬.০০
মাছ	২১	৮০	৩০.০০	১৪.০০
ডিম*	১৩.৩	৯৮	১১.৫০	৮.৮০
প্রোটিনেক্স	৫৬	৬০	১০৬.০০	১৯.০০
প্রোটিনিউল	৪০	৬০	১৩২.০০	৩৩.০০
স্পার্ট (Spert)	২৩	৬০	১২৫.০০	৫৪.০০
কমপ্লান	২০	৬০	৯২.০০	৪৬.০০
স্যু (Syu)	৩৩	৬০	৯২.০০	২৮.০০
প্রভিটন	৫০	৬০	৯৫.০০	১৯.০০

* একটি ডিমের ওজন ৬০ গ্রাম

বর্তমান হিসেবটি থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কতো বেশি দাম দিতে হচ্ছে এই টিনের খাদ্যগুলির জন্য। আর এইগুলি তৈরি হয় মূলত গুঁড়ো দুধের সঙ্গে বাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে। শুধু তাই নয় প্রোটিনের গুণমানের কথা ভাবতে গেলে ডিম বা মাছের ধারেপাশেও এগুলি আসে না। অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, প্রোটিন ছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে এইসব খাবারে—তাই এর এতো দাম। এবার দেখা যাক অন্য কি রয়েছে এতে? কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পরিমাণ সাধারণ খাবার থেকে এইসব খাবারে আদৌ বেশি নয়। তাছাড়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রধান অংশটাইতো কার্বোহাইড্রেট (চাল, ডাল, আলু, চিনি ইত্যাদি)। আর ফ্যাটের পরিমাণ ধরলে দেখা যাবে ডিমে রয়েছে ১৩ শতাংশ, মাছে ২˙৫ শতাংশ, দুধে প্রায় ৭ শতাংশ (মোষের দুধ); সেখানে স্পার্ট-এ রয়েছে ১ শতাংশ মাত্র। অধিকাংশ এইসব টিনজাত খাদ্যে ফ্যাটের পরিমাণ এই রকমই। এরপর টিনজাত খাদ্যে অন্যান্য যে-সমস্ত খাদ্যবস্তুগুলির নামোল্লেখ রয়েছে তা হলো এক গুচ্ছ ভিটামিন এবং অসংখ্য মিনারেলের হিসেব। একজন মানুষ সাধারণভাবে ভাত ও শাকসবজি পেটপুরে খেতে পারলে এইসব ভিটামিনের কোনো অভাবই তার ঘটবে না—মিনারেলের ক্ষেত্রে তো নয়ই। উপরন্তু এতে এমন কিছু ভিটামিন রয়েছে (যেমন ভিটামিন-ডি—যা আমাদের দেহে সূর্যালোক পড়লে চামড়ার নিচে তৈরি হয়) যা অতিরিক্ত গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

আমরা এতোক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করেছি তাদের দেখানো পরিমাণগুলি নিয়ে, কিন্তু সত্যিই কি সেই পরিমাণ প্রোটিন এইসব টিনের খাদ্যে থাকে—যা অন্তত তারা দাবি করে? পরীক্ষার খবর কিন্তু অন্য কথা বলে। মনে রাখবেন এই সব প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারগুলি তৈরি করে বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলি। শুনলে অবাক হবেন, বৃহৎ কোম্পানি ফাইজার প্রোটিনেক্স তৈরি করে তার লাইসেন্সড কোটার তিন গুণ বেশি—কোনো সরকারি আইনের তোয়াক্কা না করেই। সেখানে টি বি রোগের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ তারা ইচ্ছে করে কম তৈরি করছে। কারণ প্রোটিনেক্স-এর আকাশ-ছোঁয়া লাভ আর কোথায় তারা পাবে?

সুস্থ মানুষজনের প্রোটিন খাওয়ার জন্য প্রোটিনেক্স বা ঐ ধরনের কোনো টিনজাত খাদ্য খাওয়ার যে আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই তা বোধহয় সবাই বুঝতে পারছেন। এমন কি, আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু

মাছ-মাংস ছাড়া শুধু ডাল ভাত থেকেই পাওয়া সম্ভব। তবে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, অসুস্থজনের ক্ষেত্রে কিংবা যারা খুব দুর্বল তাদের জন্য কি অধিক এবং সহজপাচ্য প্রোটিনের দরকার নেই? রোগদুর্বল শরীরে প্রোটিনের যোগান সামান্য একটু বেশি হলে ভালোই হয় কিন্তু সেটাও বিশাল কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়—সাধারণ খাদ্যদ্রব্য থেকেই (ডাল-তরকারি) তা পাওয়া সম্ভব। তবে যদি সহজপাচ্যতার কথা ওঠে তাহলেও প্রোটিনেক্স-এর ব্যবহার হালে পানি পায় না। গুণমান ও সহজপাচ্যতার নিরিখে ডিম এবং মাছই প্রথম আসে। নিরামিশাষীদের ক্ষেত্রে দুধ খাওয়ার কথা বলা যায়। সেক্ষেত্রে দামও অনেক কম পড়ে এবং তা অনেক বেশি সহজপাচ্য। প্রোটিনেক্স, নিউট্রামুল খাওয়ার যৌক্তিকতা তাই কোনো ক্ষেত্রেই খাটে না—কি সুস্থ কি অসুস্থ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই।

সূত্র:

1. The Nutritive Value of Indian Foods
2. মাসিক গণাস্বস্থ্য; ঢাকা, বাংলাদেশ; ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

☐ স্মরজিৎ জানা

বেবিফুড : বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাজত্ব

হাসপাতালের শিশুরোগ বহির্বিভাগ। দীর্ঘ লাইন আর ভিড় ঠাসা বারান্দার শেষে ততোধিক হৈ চৈ-এর ভিতর 'ডাক্তারবাবু' বসে। 'ডাক্তারবাবু'র সামনে একের পর এক মা, কোলে শিশু—

রেহানা, বয়স সাত মাস, হাড্ডিসার চেহারা, কুঁচকে যাওয়া চামড়া, মাথাটা শণের মতো চুলের অপভ্রংশে ভরা—উপসর্গ ঘনঘন পাতলা পায়খানা, গত চার মাস ধরে, অর্থাৎ জন্মের তিন মাস পর থেকেই। মায়ের হাতে ধরা মাথায় 'নিপল্' লাগানো একটা সাধারণ কাঁচের শিশি, তার মধ্যে রয়েছে টল্‌টলে সাদাটে পদার্থ। মেয়ের ঘ্যানঘ্যানে কান্নার ফাঁকে নিপল্‌টা তার মুখে গুঁজে কান্না সামলানোর চেষ্টা করে চলেছে। ডাক্তারবাবুর ধমক আর বিরক্ত প্রশ্নের উত্তরে মা বলে—বাচ্চাতো দামী 'কৌটোর দুধ'ও খায় ডাক্তারবাবু, তবু এমন রোগাই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ রোগটা হলো—'অপুষ্টি'। ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন—"কৌটোর দুধ কে দিতে বলেছে?" উত্তরে অবাক চোখে তাকায় মা, বুঝতে পারে না অমন সুন্দর বাচ্চার ছবিওয়ালা, অতো দামী কৌটোর দুধের মধ্যে দোষটা কি আছে?

আসলে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা আর অভাবের ফুটো দিয়ে কৌটোর দুধ, তথা বেবিফুড আজ ভারতের মতো দেশগুলির একটা বিরাট অংশের শিশুর জীবনে অপুষ্টি আর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির। বহুজাতিক (Multinational) বেবিফুড প্রস্তুতকারক আর দেশী একচেটিয়া প্রস্তুতকারকদের সর্বগ্রাসী মুনাফা-ক্ষুধার সামনে, অসহায় অবস্থায় আমাদের দেশের কোটি কোটি শিশু আজ রেহানার মতোই—ডাক্তারখানা, হাসপাতাল আর তেলপড়ার শরণাপন্ন হচ্ছে। আর ডাক্তারবাবুরা, স্বাস্থ্যকর্মীরা অবাক হচ্ছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, রেগে যাচ্ছেন—শিশুর মা-বাবার অজ্ঞানতায়। বেশি হলে, দরদী ডাক্তারবাবুটি হতাশ হচ্ছেন সমস্যার ভয়াবহ আকার দেখে। ইত্যবসরে মুনাফার ভারি থলিটাকে আরও ভারি করার কাজে, বাজার বাড়ানোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে বেবিফুড প্রস্তুতকারকের দল।

'বাচ্চার জন্য মাতৃস্তন্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ খাদ্য'—কথাটা শিশুচিকিৎসার বইয়ের পাতায় লেখা থাকলেও, প্রায় পনেরো বছর আগে থেকেই মায়ের দুধের প্রতিযোগী হিসাবে বেবিফুড ভারতীয় বাজারে সোচ্চার চেহারায় দেখা দেয়। বহুজাতিক ও পরে দেশী একচেটিয়া প্রস্তুতকারকেরা এই লাভজনক পণ্যটির বিক্রি বাড়ানোর জন্য ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ সুশিক্ষিত (প্রকৃত অর্থে কুশিক্ষিত) মানুষের মগজ ধোলাইয়ের এক ব্যাপক জোয়ার আনে। শিশু-বিভাগের দেওয়ালে পাশ ফেরা, হামা দেওয়া, আর দাঁড়িয়ে ওঠা 'গ্ল্যাক্সো বেবি' আর 'ফ্যারেক্স বেবি'র ছবিতে ভরে যায়। কাগজের পাতায়, সিনেমার পর্দায়, 'আমুল' খেতে থাকে নধর কান্তির সুন্দরতম বাচ্চাটি। আর ডাক্তারবাবুদের "চা খাবার জন্য" বিনামূল্যে বিতরিত হয় বিজয়স্প্রে, আমুলস্প্রে, ল্যাক্‌টোজেন।

ফলে যে কোনো সরকারি হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রসূতিকে ছুটির কাগজে (discharge certificate) বাচ্চার খাবার জন্য প্রথাগতভাবে ল্যাকটোডেক্স, ল্যাকটোজেন লেখা শুরু হয় প্রায় ১০ বছর আগে থেকে। পাশাপাশি যদিও লেখা থাকতো 'বুকের দুধ দিনে...' কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীদের অবৈজ্ঞানিক-অশিক্ষিত চেতনাও ক্রমশ বহুজাতিক মুনাফাখোরদের বিজ্ঞাপনের জোয়ারে ধুয়ে যাচ্ছে। আর কর্মরত মায়েদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত মায়েদের, বিশেষত যারা সিনেমার পর্দায় বিজ্ঞাপনে দেখা সুবেশা মহিলাটির মতো 'অভিজাত' হয়ে উঠতে চান, তাদের মধ্যে বেবিফুড-এর প্রতি নির্ভরতা ও বুকের দুধ না দেবার প্রবণতা বাড়ছেই। এদিকে বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য ও পাড়ার মুদিখানা অবধি পৌঁছে যাওয়ার দৌলতে নিম্নবিত্ত অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের কাছে বেবিফুডের টিন হয়ে ওঠে—টনিক-ওষুধের মতোই 'সর্বশক্তি-সর্বগুণসম্পন্ন জলপড়া'—যার প্রতি চামচে ভরা আছে টিনের গায়ে লাগানো ছবির বাচ্চাটির মতো স্বাস্থ্যবান হবার মন্ত্রগুপ্তি। অর্থাৎ বেবিফুড হয়ে ওঠে টনিক! অথচ, আমাদের মতো গরীব দেশে যেখানে প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ মাসিক মাথাপিছু খেয়ে বাঁচার মতো টাকাও আয় করেন না এবং মাতৃস্তন্যের বা মা-এর দুধ খাওয়ানোর সময়ে ঘাটতি নেই বললেই চলে, সেখানে এমনটা হবার কথা ছিল না। বিশেষত যখন একটা তিনমাসের বাচ্চাকে নিয়মিত পুরোমাত্রায় বেবিফুড খাওয়ানোর ন্যূনতম মাসিক খরচ অন্তত পক্ষে ১৫৯·০০ টাকা। যেহেতু খরচটা এতোটাই বেশি তাই আরও বেশি করে অক্ষরজ্ঞানহীন

মানুষ বিশ্বাস করতে পেরেছে—গ্ল্যাক্সো, আমুল, নেসলের রঙীন তুলতুলে বাচ্চার বিজ্ঞাপন। কেননা, সাধ্যের অতীত ব্যয়ে লব্ধ ঐ অমূল্য টনিক, আর ছবি, রেডিও, সিনেমা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উৎসাহকে অস্বীকার করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োজন, তা এই নিরক্ষরের দেশে দুর্লভ।

এরপর নিশ্চয়ই বলতে হয়, ঠিক কী কী-ভাবে বেবিফুড নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্য ও মধ্যবিত্ত শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করছে।

প্রথমত, বেবিফুড—তা যত উপাদান ও বহুল বিজ্ঞাপিত ভিটামিন ও জিঙ্ক, কপার, আয়রণ-সহ টিনজাত করা হোক না কেন, কখনই মায়ের দুধের মতো প্রতিরোধ শক্তি (resistance) শিশুতে সঞ্চারিত করতে পারে না। এর কারণে মায়ের দুধের Globuline, Large & Small Lymphocytes, Lactoferin, Carnitin ইত্যাদি পদার্থ, কৃত্রিমভাবে তৈরি করাও সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে বেবিফুডে নির্ভর করে যে শিশুরা, তারা দেহ-গঠন ও শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতায় বুকের দুধ খাওয়া শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকবেই।



দ্বিতীয়ত, এরপরই বলতে হয় মাতৃস্তন্যের সুসমতা (balance) ও সহজপাচ্যতার কথা—মায়ের দুধে প্রোটিন ঠিক যে পরিমাণে আছে তা শিশুর

হজম শক্তির জন্য আদর্শ। মাতৃদুগ্ধে স্নেহপদার্থ থাকে ছোট ছোট আণবিক আকারে (in small molecules) এবং স্নেহপদার্থের অধিকাংশই গঠিত থাকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে। ফলে স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য ও সহজ পাচন ক্রিয়ার জন্য স্তন্যদুগ্ধ অন্য যে কোনও দুধের থেকে বেশি উপকারী। এবং এই সুসমতা ও সহজপাচ্যতার গুণ অন্য কোনও দুধে পাওয়া সম্ভবই নয়।

এতো গেল গুণগত তফাৎ-এর কথা। এরপরই চলে আসে বেবিফুড এর সাথে সাথে যে সহযোগী ঘটনা তথা অভ্যাসগুলি প্রচলিত আছে—তার কুপ্রভাবের কথা। প্রথমেই বলতে হয় খাওয়ার বোতল ও নিপল্-এর ব্যবহারের কথা, যা বিশেষত নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে-সমাজে বেবিফুড এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত। ঐ বোতল ও নিপল্-এর অপরিচ্ছন্ন (unsterile) ব্যবহার যে কী পরিমাণ পেটের অসুখ ঘটায় তার ইয়ত্তা নেই। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোতল ও নিপল্ ব্যবহার করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ এবং সময় লাগে, তা ব্যয় করা এমনকি মধ্যবিত্ত সংসারের পক্ষেও অকল্পনীয়। (প্রতি দিনের ব্যবহারের জন্য লাগবে ৬/৮টি বোতল ও সমসংখ্যক নিপল্, ঐগুলিকে গরম জলে ফোটাবার জন্য জ্বালানী ও সময় ইত্যাদি।)

আর সবশেষে বলার হলো—অন্যতম বড় বিপদের কথা—তাহলো বাচ্চাকে অতিরিক্ত তরলীকৃত অবস্থায় 'টনিক'-রূপী বেবিফুড খাওয়ানো। এতে করে পেট ভরে কিন্তু পুষ্টি হয় না আর সাথে সাথে বাচ্চার কম পুষ্টি-জনিত ডায়েরিয়া (under-feeding diarrhoea) হয়। ফলে অপুষ্টি আরো বাড়তে থাকে।

ওপরে বলা প্রেক্ষাপট ও তার পৃথিবীব্যাপী (বিশেষত এশিয়া ও লাতিন আমেরিকাব্যাপী) কুপ্রভাবের কথা মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তার সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি ও শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতাসহ গত ১৯৮১-র মে মাসে গ্রহণ করে, 'স্তন্যদুগ্ধের পরিপূরক শিশুখাদ্য বাজারজাত করার' ব্যাপারে এক নিয়মবিধি। কথা ছিল—মুনাফালোটার এই সামগ্রীটির দ্বারা যাতে শিশুস্বাস্থ্যহানি ও শিশুমৃত্যুর হার আর না বাড়তে পারে তার জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নিজের নিজের মতো করে আইন প্রণয়ন করবে বা ব্যবস্থা নেবে। এই ঘটনার পর বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। আর আমাদের 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' ভারতে,

যেখানে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ১২০ জন, আর ঐ মৃত্যুহারের অন্যতম প্রধান কারণ—বুকের দুধ না খাওয়ানো বা খাওয়ানো বন্ধ করে বেবিফুড় বা অন্য পথ্য দেবার ফলে ডায়েরিয়াজনিত মৃত্যু ও অপুষ্টিজনিত মৃত্যু ; সেই দেশ ভারতের মাটিতে বেবিফুডের বিক্রি বেড়েছে ১৯৮২ সালেই শতকরা ২৯ ভাগ। মোট বিক্রি হয়েছে ৪০ হাজার টন বেবিফুড আর টাকার অঙ্কে বিক্রি বেড়েছে আরো বেশি, শতকরা ৪০ ভাগ—মাত্র এক বছরে।

এই ঘটনার মানে কিন্তু এই নয় যে, ভারত সরকার কিছুই করে নি। তারা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করেছে—সরকারি অফিসার, বেবিফুড প্রস্তুতকারক, WHO, UNICEF ও নানান বেসরকারি স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর ঐ কমিটি চোদ্দ মাস কথাবার্তা বলে, আলোচনা করে রায়ও দিয়েছিল—বলেছিল আইন করে সমস্তরকম বেবিফুডের সব ধরনের প্রচার ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে। এবং আরও বলেছিল সমস্ত রকম বোতল আর নিপল্‌-এর ওপরই একই রকম আইন জারি করতে। পাশাপাশি এ-ও ছিল যে, WHO যে নিয়মবিধি তৈরি করে দিয়েছে তার ফাঁক-ফোকর প্রচুর, তাই তার থেকে কড়াভাবে বেবিফুডের অশালীন মুনাফামুখী বিক্রি ও প্রচার বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে বেবিফুডের টিনের গায়ে ফুট্‌ফুটে বাচ্চার ছবি দেওয়া। কেননা ওই ছবি এই অক্ষরজ্ঞানহীন দেশের মানুষের কাছে টিনের দুধ সম্বন্ধে অদ্ভুত মোহ ও অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

কিন্তু কার্যত ঘটেছে কি ?—বেবিফুড তৈরি বন্ধ করা বা কমানোতো দূরের কথা, নতুন করে আরও বত্রিশটি বেবিফুড প্রস্তুতকরার লাইসেন্স দিয়েছেন সরকার। আর তারও মধ্যে সাতটি উদ্যোগ আধা-সরকারি। আরও দশটি হলো সমবায় উদ্যোগ ; যা সরকারি সাহায্য ছাড়া চলতেই পারে না।

এশিয়া-আফ্রিকারই অন্য অনেক গরীব দেশে কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার চেহারাটা এরকম দু-মুখো নয়। আলজিরিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া এই তিন দেশ তাদের খোলাবাজার থেকে বেবিফুড বিতাড়ন করেছে, যা এখন শুধুমাত্র হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় তবেই। আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কাতেও বেবিফুডের সমস্ত রকম বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর পাশাপাশি শিশুদের স্তন্যদানের জন্য এক ব্যাপক প্রচার-অভিযান শুরু হয়েছে।

এদিকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে, সরকারি ক্লীবত্বের পাশেই—বেবিফুড

প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি তাদের মুনাফালোটার প্রক্রিয়াকে নব নব অস্ত্রে সাজিয়ে বাজার-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদিও বেবিফুড সম্বন্ধে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন যে কমিটি হয়েছিল তার অংশীদার বেবিফুড প্রস্তুতকারকরাও ছিল, অর্থাৎ ঐ কমিটির বক্তব্যে তাদেরও সম্মতি থাকার কথা, তবু কার্যত ঘটছে উল্টোটা।

কমিটিতে বসে ঠিক হয়েছিল যে 'আমুল' প্রস্তুতকর্তারা তাদের টিনের গা থেকে হাস্যোজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান বাচ্চাটির ছবি তুলে দেবে, কিন্তু কিছুদিন আগে বাজারে যে নতুন টিনটি এসেছে তার গায়ে আগের থেকেও বড় মাপের একটি বাচ্চার ছবি শোভা পাচ্ছে। এতো গেল পুরানো কায়দার বিজ্ঞাপন। এখন নতুন করে (WHO এর Draft Code of Marketing Breast Milk Substitute তৈরি হবার পর), নতুন হাওয়ায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক নতুন কায়দার বিজ্ঞাপন বাজারে ছাড়ছে আমুল, গ্ল্যাক্সো প্রভৃতি একচেটিয়া ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি। যেমন গ্ল্যাক্সো বিজ্ঞাপন দিয়ে (অবশ্যই ইংরাজীতে) মায়েদের জানাচ্ছে যে—'মায়ের দুধই শিশুর জন্য সেরা দুধ।' কিন্তু বিজ্ঞাপনটা চোখে দেখলে সবচেয়ে বড় যে-জিনিসটা দৃষ্টি কাড়ে, তাহলো মায়ের কোলে একটি স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ছবি। বাচ্চাটি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে একটা গ্ল্যাক্সোর টিনের দিকে। আর সমস্ত বিজ্ঞাপনটার ক্ষুদে ক্ষুদে লেখার তলায়, বড় বড় হরফে লেখা—(গ্ল্যাক্সোতে আস্থা রাখুন, মায়েরা গ্ল্যাক্সোতে বিশ্বাসী) অর্থাৎ গ্ল্যাক্সো আর আমুলের বিড়ালতপস্বী মুনাফাখোরেরা যতই চেঁচিয়ে বলুক—তারাও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একমত, আসলে এই নতুন বিজ্ঞাপনগুলিও বাজার দখলের নতুন কায়দার যুদ্ধই। আর তাই সবকটি বিজ্ঞাপনেরই তিনটি সাধারণ চরিত্র—এক, বিরাট করে স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ছবি ; দুই, বিশেষ কোনো একটি বেবিফুড-এর টিনের ছবি ; তিন, বড় বড় হরফে উৎপাদকের নামাঙ্কিত কোনও শ্লোগান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলীর একমাত্র যে-কথাটি আপাতত মেনে চলছে বেবিফুড প্রস্তুতকারকরা তা হলো—নাম কা ওয়াস্তে 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ' মার্কা একটা শ্লোগান "মায়ের দুধই শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ"—এই ক-টি কথা তারা ছাপছে টিনের গায়ে। কিন্তু কথা হলো, যেখানে অক্ষর-জ্ঞান দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে ঐ লেখাটুকুর চেয়ে নিশ্চয়ই ফুটফুটে বাচ্চার ছবিটার ভাষা অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও

আকর্ষণীয়। আর অক্ষরজ্ঞান যাদের আছে, তাদের বিভ্রান্ত করতেও বন্দোবস্ত নিয়েছে গ্ল্যাক্সো। তারা টিনের হলুদ বর্ডারের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেপেছে—"It is ideal to breast feed the baby *initially, if possible*" (সম্ভব হলে বাচ্চাকে প্রথমদিকে বুকের দুধ দেওয়া ভালো)। প্রথমদিকে, পরে আর নয়, সম্ভব হলেই কেবলমাত্র স্তন্যপান করানো ভাল, নচেৎ নয়। নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনের চমৎকার উদাহরণ।

অবশ্য শুধুমাত্র প্রথাগত রাস্তাতেই নয়, নতুন নতুন রাস্তায়ও চরম বুভুক্ষা নিয়ে নেসল (Nestle Food Specialities of India) মার্কা বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাজার বাড়ানোর জন্য, মুনাফা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আর পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলী ঘোষিত হবার ফলে উদ্ভূত যে কোনও ধরনের প্রতিরোধকে পাশ কাটানোর ব্যবস্থাও তারা করেছে। ওই সংস্থা এবার সব সৌজন্য ও শালীনতা ছেড়ে সরাসরি রাস্তায় ডাক্তারদের মাধ্যম করে প্রসূতিদের মধ্যে চিঠি লেখার প্যাড (pad) ছড়াচ্ছেন। ঐ প্যাড-এর প্রতিটি পাতায় থাকছে বেবিফুডের বিজ্ঞাপন, আর মায়েদের বিভ্রান্ত করার জন্য লেখা থাকছে—"বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো ভালো—অবশ্য যদি আপনার যথেষ্ট দুধ থাকে।" পাশাপাশি মায়েদের উপদেশ দিচ্ছে দিনে ছ-বার অর্থাৎ চার ঘণ্টা অন্তর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে। কিন্তু ঘটনা হলো তিনমাস অবধি একটি বাচ্চা একবার ভরপেট খেলে—সাধারণত পেট খালি হলে কাঁদতে শুরু করে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা বাদেই। এর ফলে মায়ের মনে করাটা স্বাভাবিক হবে যে, তার যথেষ্ট দুধ নেই—ফলে Lactogen ইত্যাদি খাওয়ানোর রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অসাধারণ, তাই না?

এছাড়াও আছে আরও অদ্ভুত রাস্তা। নেসল 'Medical deligate' নামে একদল মহিলা নিয়োগও করে থাকে, যারা বোম্বের নানান চিকিৎসা-কেন্দ্র ও প্রসূতি-সদনে নার্সদের মতো পোষাক পরে প্রসূতিদের বাচ্চা সামলানো শেখানোর নাম করে 'ল্যাক্টোজেন' ও 'সেরিলাক'-এর নমুনা বিনামূল্যে বিতরণ করে আর এদের গুণাগুণ বুঝিয়ে দেয়। এমনকি কোথাও কোথাও মায়েদের নখ কেটে দিতে দিতেও এই কাজটা সেরে ফেলে ঐসব সংস্থার প্রতিনিধিরা।

এরা ডাক্তারদের মগজ-ধোলাই করারও নতুন ব্যবস্থা করে চলেছে—যাতে বিক্রি বাড়ানো যায়। তারই একটি নমুনা সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

নেসল-এর প্রতিনিধিরা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করেছে—যার দাবি হলো, তারা নাকি **মায়ের দুধের মতোই** একটি শিশুখাদ্য তৈরি করেছে। এই ধরনের দাবি বা প্রচার করাটা চরম মিথ্যাচার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত আচরণবিধির অবমাননা। কিন্তু এ সবই চলছে প্রকাশ্যে। আর বিক্রি ও মুনাফাও তাই বেড়েই চলেছে বেবিফুড এর। আমুল নামের বেবিফুডই গত বছর বিক্রি হয়েছে ৫৯ কোটি টাকা। গ্ল্যাক্সো কোম্পানি প্রায় ১৬ কোটি টাকার বেবিফুড বিক্রি করেছে ঐ একই সময়ে। নেসল করেছে ১৫ কোটি টাকা।

জেনিভা, ১৮ ডিসেম্বর: ফিলিপিনস-এর এক হাসপাতালে ডাক্তাররা শিশুদের বোতলে করে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ করে, স্তন্যপান করানোর নির্দেশ দেওয়াতে, শিশুমৃত্যুর হার ৯৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। এখবর দিয়েছে ইউনিসেফ। উত্তর ফিলিপনস-এর বাগুইয়ো হাসপাতালে ৫২ মাস সময়ের মধ্যে জন্মেছে এমন দশ হাজার শিশুর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই ফল পাওয়া গেছে। সমীক্ষার সময়ে প্রথম ২৬ মাসে বোতলে করে দুগ্ধপানের রেওয়াজ তুলে দিয়ে স্তন্যপান করানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। এই ৫২ মাসে মোট ৬৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র তিনটি শিশুর স্তন্যপানের অভ্যেস ছিল। এছাড়া শিশুখাদ্য বারে বারে বদলানোর অভ্যেস যদি ত্যাগ করা যায় তবে শিশুটির দেহে কোনো রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা ৮৮ শতাংশ কমে যায়। ইউনিসেফ জানিয়েছে, এই প্রথম ব্যাপকভাবে শিশুদের বোতলে দুগ্ধপান করানোর মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালানো হলো।

সূত্র: আজকাল; ১৯.১২.৮৩

এই টাকাগুলি এসেছে কোন্ মানুষদের পকেট থেকে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না হলেও কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া যাবে নিচের তথ্যগুলি থেকে। আগে বেবিফুড প্রস্তুতকারকরা আগ্রাসী প্রচারের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতো যে, বেবিফুড মূলত উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সংসারগুলিতেই ব্যবহৃত হয়। আর শিক্ষাগত মানে এগিয়ে থাকার দরুন এরা বিচার-বিবেচনা করে যথাযথ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই এর প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করবেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে পাওয়া গেছে নিচের তথ্যগুলি। সমীক্ষাটি চালানো হয়েছিল বোম্বাই এর নায়ার হাসপাতালে ভর্তি ২০০ জন শিশু ও তার মায়েদের ওপর—

এক, ২০০ জন বাচ্চার শতকরা ৫৫.৫ অর্থাৎ ১১১ জনই বেবিফুড খেয়ে থাকে।

দুই, শতকরা ৪৯.৫৫ অর্থাৎ ৯৯ জনের মাথাপিছু গড় মাসিক রোজগার ১০০ টাকার কম।

তিন, বেবিফুড খাওয়ান এমন ১১১ জন মায়েদের ভিতর ৫২ জনই অক্ষরজ্ঞানহীন।

চার, বেবিফুড শতকরা ৪২ জনকেই অত্যন্ত পাতলা করে খাওয়ানো হয়।

পাঁচ, বেবিফুড ব্যবহারকারীদের শতকরা ৯৩.৭ জন দুধের বোতল ও নিপল জীবাণুমুক্ত করার কোনোই ব্যবস্থা নেন না।

ছয়, যারা বেবিফুড খাওয়ায় সেই ১১১ জন মায়ের মধ্যে ১৬ জন চাকরি করে। অর্থাৎ মাত্র ঐ ১৬ জনেরই বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর জন্য মায়ের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে।

সাত, ঐ ২০০ জনের মধ্যে যে ১৩ জন শিশু মারা যায় তারা সবাই বেবিফুড খেত।

এবার দেখা যাক, যেখানে অবস্থা এতোটাই আশঙ্কা-উদ্রেককারী, সেখানে সরকার কি করছে। যদিও আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিব বহু ভারি ভারি কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোচনাসভায় ও লোকসভায় বলেছে, এবং যদিও ভারতীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকরী কমিটি বেবিফুড সম্বন্ধে তাদের রিপোর্টে পরিষ্কার ভাষায় বিজ্ঞাপন বেআইনী করা সহ বহু সরাসরি ও জোরদার ব্যবস্থার কথা বলেছে, তবু সরকার এখনও কোনও স্থির ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। আর কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে যে—বেবিফুড-এর বিজ্ঞাপন বেআইনী করার ব্যাপারে নাকি তথ্য ও বেতার দপ্তর আপত্তি জানাচ্ছে—তাদের বক্তব্য, এর ফলে ওই দপ্তরের বিজ্ঞাপন বাবদ আয় কমে যাবে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, দপ্তরটা চলে কাদের অর্থে? কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য? এদিকে আইনমন্ত্রক নাকি বলেছে যে, এই ধরনের আইন ধোপে টিকবে না। কিন্তু মাদক ও মদ্য জাতীয় পানীয়ের

ব্যাপারে বিজ্ঞাপন বন্ধের আইন কি প্রচলিত হয় নি।

যাই হোক, অজ্ঞাত কারণে সরকার বাহাদুর যখন জনস্বার্থরক্ষা ভুলে ঘুমোচ্ছে, ঠিক তখনই বহুজাতিক সংস্থারা মুনাফা ও বিক্রি বাড়ানোর জন্য ডাক্তারদের মতো (এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়) লোকদের পকেটস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে। গ্ল্যাক্সো বোম্বাইয়ের ৫০ জন শিশু-চিকিৎসককে মাথা পিছু ৫০টা করে শেয়ার সস্তায় দিয়ে যাচ্ছে। যার অন্য অর্থ হলো টাকার অঙ্কে প্রত্যেককে ৫৫০ টাকা ঘুষ দেওয়া। আর ঐ ডাক্তাররা হয়ে যাচ্ছে গ্ল্যাক্সো-র ব্যবসায়িক শরিক। অর্থাৎ আরও সরাসরি ওদের মাধ্যমে গ্ল্যাক্সোর স্বার্থসিদ্ধি করানোর রাস্তা খুলে যাচ্ছে। সাবাস বুদ্ধি!

সূত্র :
1. India Today ; March 15, 1983, 'Code of Misconduct'
2. International Code for Marketing Breast Milk Substitute ; WHO
3. Paediatric Medicine ; O. P. Ghai
কার্টুন ; 'Documenation', Holland এর সৌজন্যে

☐ **কুণাল দত্ত**

আয়োডাইজড সল্ট

আমাদের গলার সামনের দিকে প্রজাপতি আকারের থায়রয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। থায়রয়েড গ্রন্থি থেকে যে-সব হরমোন নির্গত হয় তাদের মধ্যে থায়রক্সিন হলো প্রধান। থায়রক্সিন আমাদের শরীরে নানা বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। থায়রয়েড গ্রন্থি যদি বেশি পরিমাণে থায়রক্সিন তৈরি করে তবে রক্তে ঐ হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় শরীরে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়—যাকে থায়রোটক্সিকোসিস বলা যায়। আবার

যদি থায়রক্সিন কম তৈরি হয় তাহলেও অনেক উপসর্গ দেখা দেয়—তাকে হাইপোথায়রয়ডিসম বলে।

থায়রক্সিন তৈরি করতে প্রয়োজন আয়োডিনের। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কেরল ইত্যাদি) বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ করে শাকসবজি, ফলমূল এবং পানীয় জলে আয়োডিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তারজন্য এই এলাকার লোকেদের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি প্রায় হয়ই না বলা চলে। অন্যদিকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী এলাকায় (যেমন হিমালয় অঞ্চল, উত্তর ভারত ইত্যাদি) খাদ্যে এবং পানীয় জলে এই আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে। এই এলাকার বেশকিছু লোকেদের মধ্যে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দেয়। বেশ কিছুদিন ধরে শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে থায়রক্সিন হরমোন তৈরির কাজ কমে যায়, ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির থায়রয়েড গ্রন্থিস্ফীতি ও গলগণ্ড (Endemic Goitre) রোগ দেখা দেয়। এই অবস্থায় হাইপোথায়রয়ডিসমের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই আয়োডিনের ঘাটতির ফলে দৈহিক বা মানসিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না। শিশুটি বেঁটেখাটো, পেট মোটা এক মূর্খ (Idiot) হিসেবে বেড়ে ওঠে।

স্বাস্থ্যজ্ঞানের প্রসারের ফলে আমরা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ-লবণ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছি। অনেকের মধ্যে সম্যক জ্ঞানের অভাবে এই সচেতনতা আবার অতিসচেতনতার সৃষ্টি করে, ফলে উল্টো বিপদ দেখা দেয়। ব্যবসায়ীরা সংগঠিত প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে এই অতিসচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এর ফলে জন্ম হয় কৃত্রিম অভাববোধ বা চাহিদার। দৈনন্দিন কাজকর্মে বাড়তি শক্তির যোগান দিতে তাই বাজারে হাজির করা হয় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য (যেমন প্রোটিনেক্স, প্রোটিনিউল ইত্যাদি), শক্তিবর্ধক পানীয় (যেমন হরলিকস, ভিভা, কমপ্লান, মলটোভা ইত্যাদি), অথবা নানা ধরনের ভিটামিনসমৃদ্ধ বাহারি টনিকের। এইসব 'বলবর্ধক' খাদ্যদ্রব্যের ধাপ্পাবাজির আসল কারিকুরি নিয়ে উৎস মানুষ-এ বিভিন্ন নিবন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। আয়োডিনঘটিত লবণ (Iodised Salt) নিয়েও এ-ধরনেরই এক ব্যবসায়িক ধাপ্পা চালু হয়েছে। কলকাতায় বিভিন্ন বাজারে পাওয়া যায় সুদৃশ্য পলিপ্যাকে এই আয়োডাইজড লবণ।

ওপরের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, থায়রক্সিন হরমোন তৈরি করতে প্রয়োজন আয়োডিনের, যা কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকার মানুষ বাদে বাকি সবাই স্বাভাবিক খাদ্য এবং পানীয় জল থেকেই পেয়ে থাকি। বাইরে থেকে আলাদা করে যোগান দেবার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে লবণের সাথে আয়োডিন যদি অহেতুক রোজ খেয়ে চলি তবে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে থাকলে মারাত্মক ধরনের চর্মরোগ, পেটের অসুখ, সর্দির লক্ষণসমূহ, মুখে বেশি লালাক্ষরণ, লালাগ্রন্থি সমূহের স্ফীতি, গলা জ্বালা করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণ লবণে (Common salt) অশুদ্ধি (impurity) হিসেবে সবসময়ই সামান্য পরিমাণে আয়োডিন উপস্থিত থাকে। অন্যদিকে বাজারে চালু আয়োডিনযুক্ত লবণে (Iodised Salt) কী পরিমাণ আয়োডিন আছে প্যাকেটে তার উল্লেখ থাকেনা। কাজেই লবণ প্রস্তুতকারক কোম্পানি লবণে হয়তো কোনো বাড়তি আয়োডিন না মিশিয়েই সেটা আয়োডিনযুক্ত লবণ হিসেবে তিন ডবল দামে (এক কেজি সাধারণ লবণের দাম ষাট পয়সা, সেখানে 'আয়োডাইজড সল্ট'-এর দাম এক টাকা আশি পয়সা*) মুনাফা লুটে চলেছে। কারণ সাধারণ লবণেও তো সামান্য আয়োডিন প্রায় সবসময় থাকে ; পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, লবণে আয়োডিন আছে। কাজেই প্রস্তুতকারক ধাপ্পা দিচ্ছে এটা প্রমাণ করা যাবে না। সাদা ধপ্‌ধপে সুদৃশ্য মোড়কে 'আয়োডাইজড সল্ট' বাজারে ইতিমধ্যেই বেশ সমাদর পেয়ে গেছে। বাহারি প্যাকেটে এ ধরনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুটি কিনবার আগে আমরা একবারও ভেবে দেখব না, তিনগুণ দামে যে-বস্তুটি বাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আসলে সেটা আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় না ক্ষতিকর, না সবটাই ছেড়ে দেব ব্যবসায়ীদের সুপরিকল্পিত প্রচার আর বিজ্ঞাপনের ওপর।

এছাড়াও আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রির সাথে আইনের প্রশ্নও জড়িত। ভারত সরকারের এক সমীক্ষার ভিত্তিতে কতকগুলি এলাকাকে আয়োডিন-ঘাটতি এলাকা বলে চিহ্নিত করে ঐসব এলাকায় আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রি বাধ্যতামূলক করেছে এবং ওইসব এলাকায় সাধারণ লবণ বিক্রি নিষিদ্ধ। বিপরীতক্রমে যে-সব এলাকায় আয়োডিনের ঘাটতি নেই (যেমন পশ্চিমবঙ্গের

* ১৯৮৫ সালের বাজার দর অনুযায়ী

সমতল অঞ্চল) সেখানে আয়োডিন-যুক্ত লবণ বিক্রি বেআইনী। আয়োডিন ঘাটতি এলাকার জন্যে ভারতে বছরে মোট সাত লক্ষ টন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রয়োজন। সেখানে দেশে মোট উৎপাদন হয় দুই থেকে আড়াই লক্ষ টন। তাই ঘাটতি এলাকায় যোগান সুনিশ্চিত করতে এবং সাধারণের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে আয়োডিন ঘাটতি এলাকায় কেবলমাত্র আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রি করার আইন চালু করা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা তিনগুণ দামে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর আয়োডাইজড লবণ (Iodised salt) কিনে যাদের একান্ত প্রয়োজন তাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এক আইনবিরুদ্ধ কাজেরও মদত যোগাচ্ছি।

☐ পীযূষকান্তি সরকার

আকুপ্রেসার চটির চাঁটি

'৮৫-র ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় কয়েকটা সংবাদপত্রে 'আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল' নামে একটি সর্বরোগহর চটির বিজ্ঞাপন বেরোয়। কলকাতা ময়দানে লেক্সপো বাণিজ্য মেলায় বিক্রি হচ্ছিল এটি। দাম ৮৯.৯৫ পয়সা। তৈরি করেছে পার্ক স্ট্রিটের আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেণ্টার। শ্রী সতীশ লাখোটিয়া নামে এক ব্যক্তির ব্যবসায়িক মস্তিষ্ক রয়েছে এর পেছনে। বেশ কয়েক হাজার টাকার চটি নাকি ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল-এর সচিত্র একটি প্রচারপত্র থেকে জানা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় এই চটি পরে অন্তত এক মাস ৭-৮ মিনিট হাঁটলে অনেক রোগ ভালো হয়, বিশেষত রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়, হজমের ব্যাপারগুলো সক্রিয় হয়, আর সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত

হয়। সাথে ছিল কিছু আকর্ষণীয় কথাবার্তা : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আকুপ্রেসার চিকিৎসাকে অনুমোদন করেছে, আমেরিকার ড. উইলিয়াম ফ্রিৎসজেরাল্ড প্রমুখ এর ওপর গবেষণা করেছেন—পায়ের তলায় রয়েছে ৩৮টি বিন্দু, যেগুলি শরীরের নানা অংশের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলিতে চাপ দিলে এই-সব অংশের কাজ ঠিক হয়। চটিটি নাকি কিছু রাসায়নিক ও ধাতব পদার্থ দিয়ে শক্তিশালী করা রবার যোগ দিয়ে তৈরি। চটির ওপর রয়েছে ছোট ছোট রবারের নরম কাঁটা—এগুলিই পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে রোগ সারায়।

এত সহজে, শুধু চটি পরে, হজমের গণ্ডগোল সারানো আর সুস্বাস্থ্য অর্জন করার এমন সুযোগ কে হারাতে চায়! ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে না, শুধু সামান্য কিছু অর্থ ব্যয়। কিন্তু সত্যিই এসব রোগ এই চটির জোরে সারানো সম্ভব কি?

তার আগে আকুপ্রেসার সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতির কথা অনেকেই জানেন। কয়েক শত বছরের পুরনো, এই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর চীনে তো বটেই, অন্যান্য কিছু দেশেও ব্যাপক গবেষণা চলছে। এই চিকিৎসায় গায়ের চামড়ায় কিছু বিশেষ বিন্দুর কথা বলা হয়েছে, যেগুলিতে চাপ বা উত্তেজনা প্রয়োগ করলে শারীরবৃত্তীয় নানা কাজ প্রভাবিত হয়ে রোগকষ্ট লাঘব হয় বা রোগ সারে। শত শত বছরের প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও এর প্রমাণ যাওয়া যাচ্ছে, এবং পাশাপাশি এটিও দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতির অনেক খুঁটিনাটির মধ্যে অসঙ্গতি-অবৈজ্ঞানিক কিছু দিকও রয়েছে, কিছুক্ষেত্রে বিতর্ক রয়েছে। আর সব মিলিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতিটিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিমার্জিত করা হচ্ছে। আকুপাং-চারের বিন্দুগুলিতে নানাভাবে উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, যেমন—১. সূচ ফুটিয়ে (এই পদ্ধতিরই নাম আকুপাংচার; ল্যাটিন শব্দ 'অ্যাকাস' এর অর্থ সূচ); ২. তাপ দিয়ে (বিশেষভাবে তাপ প্রয়োগ করার এই পদ্ধতির নাম মক্সিবাশ্চান); ৩. চাপ দিয়ে (একেই সাধারণ-ভাবে আকুপ্রেসার বলা হয়; তবে কথাটি ভুল কারণ অ্যাকাস কথার অর্থ সূচ আর এই চাপ দেওয়ার মধ্যে সুচের কোনো ভূমিকা নেই। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, চাপ দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও কষ্ট কমানোর ব্যাপারটি অনেকেরই জানা। মাথার যন্ত্রণায় রগে চাপ দেওয়া, চোখের জ্বালা বা ব্যথায় চোখের কোণ চেপে ধরা, নাক বন্ধ হওয়ায় পাতার ঠিক বাইরে চাপ দেওয়া

হয়। ঠিক ঐখানে আকুপাংচারের বিন্দুও রয়েছে।); ৪. লেসার রশ্মি দিয়ে (সাধারণভাবে একে ফটো-আকুপাংচার বলা হয়, যদিও এক্ষেত্রেও সূচের বদলে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে) ইত্যাদি।



যাই হোক, তথাকথিত আকুপ্রেসার-এর কথা আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা অনেক সীমিত। আর আমাদের আলোচ্য 'আকুপ্রেসার স্যাণ্ডেল' প্রসঙ্গে বলা যায়—পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে রোগ সারানোর ব্যাপারটা আধুনিক আকুপাংচারেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আকুপাংচারের প্রাচীন বইতে হাতের পাতায়, পায়ের পাতায়, নাকে ইত্যাদি নানা স্থানে বিশেষ কিছু বিন্দুর কথা বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে দু-একটা বইও পাওয়া যায় যেমন হংকং থেকে প্রকাশিত How to apply Face, Nose, Hand and Foot Acupuncture (1981); আমেরিকা থেকে প্রকাশিত এফ. এস. হৌস্টন-এর The Healing Benefits of Acupressure; বোম্বাই-এর একজন এ-ব্যাপারে একটি বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মূল চীনে—যেখানে আকুপাংচারের বিকাশ ঘটেছে এবং আকুপাংচারের ওপর ব্যাপক গবেষণা চলছে, সেখানকার স্বীকৃত বইতে একে আর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন চীন থেকে প্রকাশিত, An Outline

of Chinese Acupuncture (1975), Essentials of Chinese Acupuncture (1980) ইত্যাদি স্বীকৃত বইতে পায়ের পাতার তথাকথিত ঐ কেন্দ্রগুলির কোনো উল্লেখ নেই। ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ সালে আকুপাংচারের ওপর গবেষণার ফলাফলকে কেন্দ্রীভূত ও বিনিময় করার জন্য চীনের বেইজিং-এ দু-টি আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়। এর ফলশ্রুতিতে প্রায় ১,২০০ গবেষণাপত্রে আকুপাংচারের নানাদিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও পায়ের পাতায় তথাকথিত ঐ প্রেসার পয়েণ্ট বা শরীরের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণকারী স্থানের ওপর কোনো গবেষণা নেই।

আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেণ্টার প্রচারিত আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল-এর প্রচারপত্রে বলা হয়েছে পায়ের পাতার বিভিন্ন অংশ—মস্তিষ্ক, মনের নার্ভ, মাথার নার্ভ, এনার্জি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ব্যাপারটি যে কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানীর পক্ষে হাস্যকর—বিশেষত মাথার নার্ভ, মনের নার্ভ, এনার্জি ইত্যাদি জাতীয় 'ভেগ' কথাগুলি। গবেষণালব্ধ ফলাফলে যখন বলা হয় যে, শরীরের একটি বিন্দুতে সূচ ফোটালে ঐ উত্তেজনা স্থানীয় প্রদাহ বিরোধী ভূমিকা রাখে, স্নায়ুতন্ত্রকে ও শারীরবৃত্তীয় নানা প্রক্রিয়াকে কাজে লাগায়, জৈব রাসায়নিক নানা পদার্থের ক্ষরণ ঘটায় বা নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা বিশেষ কিছু রোগে কাজ করে তখন সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করা যায়, কারণ এগুলি একাধিকবার পরীক্ষিত এবং ব্যাপক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পেশ করা। অন্যদিকে পায়ের পাতায় ঐ তথাকথিত প্রেসার পয়েণ্টগুলো মানুষ ও জীবজন্তুর ওপর করা গবেষণার ফলে নয়, অনেকটাই পুরনো কিছু ধারণা ও প্রকল্পের ওপর গড়ে উঠেছে। কোন্ ধরনের রোগীর কত সংখ্যকের ওপর আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল-এর প্রভাব পরীক্ষিত হয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি, তা সত্ত্বেও প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আকুপ্রেসার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে পূর্ণ সন্তোষজনক ফল পেয়েছেন। এটি স্পষ্টতই একটি অতিশয়োক্তি ও অবৈজ্ঞানিক কথা। আর, বলা হচ্ছে আকুপ্রেসারের কথা কিন্তু তাকে মেলান হচ্ছে ঐ স্যাণ্ডালের সঙ্গে। আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালটি কতজন মানুষ ব্যবহার করেছেন আর কতজনের ক্ষেত্রে রোগকষ্ট লাঘব হয়েছে তার একটা বিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যান অবশ্যই প্রয়োজন। আর রোগকষ্ট লাঘব শুধু নয়, কিভাবে সুনির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় নানা পরিবর্তন ঘটছে, এবং আদৌ ঘটছে কি-না তা মানুষ ও জীবজন্তুর ওপর করা পরীক্ষার, তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। তা না

করে শুধু প্রচারের জোরে বিক্রি বাড়ানো, আর কেউ প্রশ্ন করলে আকুপ্রেসারের বই দেখানো (তাও আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের ওপর নয়) শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকেই স্পষ্ট করে।

চটিটির প্রস্তুতকারক শ্রী সতীশ লাখোটিয়া 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিককেও এই বই-ই দেখিয়েছিলেন। গত ২১. ২. ৮৫ তারিখের 'দ্য টেলিগ্রাফে' শ্রী অসিত উকিলের একটি প্রতিবেদন বেরোয়। এতে আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের কার্যকারিতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। প্রতিবেদক আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ডা. বিজয়কুমার বসু-র মতামতও জানান। ডা. বসু স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, "আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের সাহায্যে রোগ সারা শুধু নয়, এনার্জি, স্ট্যামিনা ইত্যাদি অর্জন করার দাবির পেছনেও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।" পায়ের পাতায় আকুপাংচারের একটিই বিন্দু রয়েছে—সেটি হলো ইয়ং ছুয়ান (K1)। এটির সাহায্যে স্থানীয় ব্যথা ইত্যাদি কমান যায়, তাছাড়া আকুপাংচারের প্রাচীন বর্ণনা অনুযায়ী অন্যান্য দু-চারটি রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আকুপাংচারের স্বীকৃত বইতে অন্যকোনো বিন্দুর কথা বলা হয় না, আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের প্রচারপত্রে লেখা ৩৮টি প্রেসারপয়েন্ট-এর কথা তো নয়ই। দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদক শ্রী সতীশ লাখোটিয়াকে ব্যাপারটি জানালে লাখোটিয়াজি জানান, তিনি আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশানের নামই শোনেন নি এবং তার মতে পূর্বোক্ত মতামত ক্রোধ এবং আক্রোশবশত করা হয়েছে।

তিনি অবশ্য এর পরেই থেমে যান নি। দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনকে নস্যাৎ করতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের ওপর একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। আর অনেক সংবাদপত্র কোনো অনুসন্ধান না করেই শ্রী লাখোটিয়ার বক্তব্য প্রকাশ করলেন। যেমন ২৮শে ফেব্রুয়ারির আজকাল-এ 'চটির ঘায়ে রোগ বিদায়' শিরোনামায় সচিত্র প্রতিবেদন বেরোল, আর লেখার শেষে শ্রীলাখোটিয়ার দাবি অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে আকুপ্রেসারকে অনুমোদন করেছে তাও লেখা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঐতিহ্যময় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির গবেষণা ও প্রয়োগের কথা বলেছে, এ প্রসঙ্গে আকুপাংচার আর তার সাথে যুক্ত সীমিতভাবে কার্যকর আকুপ্রেসারের কথা বলেছে। কিন্তু কোথাও আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল তথা পায়ের তলাকার ঐ ৩৮টি তথাকথিত প্রেসার পয়েন্টের কথা বলে নি, কিন্তু খদ্দের তথা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে চটির বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কি সুকৌশলে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নাম ঢোকান হলো। অনেকটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র-মতো ব্যাপার।

মাদুলি, তাবিজ বা আধুনিক মেট্যাল ট্যাবলেটের মতো আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের বিক্রি বাড়বে প্রচারের জোরে। সর্টকাট পদ্ধতিতে কম পরিশ্রমে দীর্ঘস্থায়ী পেটের রোগ সারানোর আশায় বা স্ট্যামিনা-এনার্জি বাড়ানোর আশায় অনেকে কিনেছেও। কিন্তু তাদের কোনো উপকার হয়েছে কি ? হ্যাঁ, হতেই পারে। মাদুলি-গ্রহরত্ন ইত্যাদি ধারণ করেও কেউ কেউ জানায় তারা উপকার পেয়েছে। ব্যাপারটি সত্যিই ঘটে থাকলে প্রায়শই সেটি মানসিক বা কাকতালীয় অথবা অনুসন্ধানে দেখা যাবে পাশাপাশি অন্য-কোনো চিকিৎসা বা অন্যকিছুর কারণে তা ঘটেছে। সকালে-বিকেলে নিয়মিত চটি পরে হাঁটার অভ্যাসটিও কারোর কারোর ক্ষেত্রে এক্‌সারসাইজ করার সুফল দিতে পারে। সাথে সাথে অন্ধবিশ্বাসের মতো—এত টাকা দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত চটি কিনেছি, তা কি কাজ করবে না, যখন এত লোক ব্যবহার করছে—ধরনের বিশ্বাস। আর এ-বিশ্বাস আনানোর জন্য আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেণ্টারের আয়োজনও কম নেই—দু-জন এম বি বি এস ডাক্তারের মতামত, 'এটি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি'—এ-রকম প্রচারে জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্য সচেতনতায় সুড়সুড়ি, নার্ভপয়েণ্ট, প্রেসারপয়েণ্ট, বায়ো-ইলেকট্রিসিটি জাতীয় গালভরা কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

চটির প্রচার-পত্রে যে দু-জন চিকিৎসক চটিটি শরীরকে বহু রোগ থেকে মুক্ত রাখবে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগের আশায় ১৪ই মার্চ '৮৫ গেলাম পার্ক স্ট্রীটে আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেণ্টারের ঠিকানায়। বাইরে বড় সাইনবোর্ড। সুইং ডোর ঠেলে ঢুকতেই দেখা গেল একজন ভদ্রলোক কয়েকটি পায়ের মাপের সাথে মিলিয়ে চটি বাছ্‌ছেন। ভেতরে রীতিমত অফিস। এখানে চটিটিও খুব কাছ থেকে ভালো করে দেখার সুযোগ হলো। চটিতে রয়েছে রবারের অজস্র (কয়েক-শ' তো বটেই) ছোট-বড় স্পাইকের মতো জিনিস। অর্থাৎ ৩৮টি প্রেসার পয়েণ্টের কথা বলা হলেও পুরো পায়ের পাতাতেই প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ রোগের জন্য সুনির্দিষ্ট বিশেষ প্রেসার পয়েণ্টে নয়। যাই হোক, ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা গেল আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে মার্চ মাসের শেষে আসবেন। শুনে আঁতকে উঠলাম—ঐ সময় সব কাগজে

আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানান হবে। কথা বলতে বলতেই দু-জন আধুনিকা অবাঙালী সুন্দরী ঢুকলেন—তাদের হাতে একজোড়া করে ঐ চটি। লেক্সপো থেকে কিনেছেন—এতদিন ব্যবহারও করেছেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মাপে ঠিক হচ্ছে না, তাই পাল্টাতে এসেছেন। একজন তরুণী। তাকে জিগ্যেস করে জানা গেল, তার ছিল বাঁ কাঁধে ব্যথা—অবশ্য 'ক্রনিক' নয়, হঠাৎই কোনো কারণে হয়েছিল, চটি পরে তার এ-ব্যথা চলে গেছে (অবশ্য এখনো চটি পরছেন—সেটি নেশায় নাকি এনার্জি-স্ট্যামিনা ইত্যাদি বাড়ানোর চেষ্টায় তা বোঝা গেল না)। তাকে বললাম, "মাসখানেকের মধ্যে হঠাৎ হওয়া মাস্‌ল্‌পেইন তো এমনিতেই সেরে যেতে পারে। কোনো ওষুধ খান নি? তিনি বললেন, "নো, নো। এই চটির জন্যই সেরেছে। প্রথম দিকে তিন-চারটে ট্যাবলেট খেয়েছিলাম। তাতে খুব একটা কমে নি, তখনি চটি পরাও শুরু করি। তাছাড়া শরীরটাও ভালো লাগছে।" বিশ্বাস এমনই জিনিস! আরেক মহিলা—৩৫/৪০ বছর বয়স, বিবাহিতা। তার ছিল হজমের গণ্ডগোল (digestive trouble), চটি পরে তিনি ভালো মনে করছেন। এ-ধরনের হজমের গণ্ডগোল বিভিন্ন কারণে কখনো কমে কখনো বাড়ে, কিন্তু বিশ্বাসের জোরে সুফলের কৃতিত্বটা গেছে চটির পদতলে, খারাপ হলে তার দায়ভাগটা নিশ্চয়ই যেত না। যাই হোক, আমি ঐ ভদ্রলোককে বললাম প্রচারপত্রের আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে কথা বলে আপাতত ২/৩ জোড়া কিনতে পারি। ভদ্রলোক জানালেন একজন তো এই পাশেই থাকেন—৭৬ পার্ক স্ট্রীটে—ডা. এস. কে. সফিউদ্দিন, এম বি বি এস (ক্যাল), ডি টি এম অ্যাণ্ড এইচ (ক্যাল)।

হ্যাঁ, বলতে গেলে পাশের বাড়িটিই। ডা. সফিউদ্দিন সাজানো-গোছানো চেম্বারেই ছিলেন। অমায়িক ভদ্রলোক। তাকে আমার ডাক্তার পরিচয় দিয়ে আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম! মিনিট কুড়ি কথা বলার মধ্যে তিনি মোট ৪ বার বললেন, "ব্যাপারটা যে psychologically হতে পারে তা ঠিক।" চটি সম্পর্কে কোনো রোগে বিজ্ঞানসম্মত কিছু পরিসংখ্যান বা গবেষণাপত্রের কথা যে তিনি জানেন না তাও জানালেন। অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক জার্নাল তাকে দেওয়া হয়েছিল (ঐটি তখন তার কাছে ছিল না), তাতে তিনি আকুপ্রেসার সম্পর্কে পড়েন (চটি সম্পর্কে নয়, গবেষণা তো নয়ই)। তারপর জানান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে এই চটি ব্যবহারের কথাও শুনেছেন। তিনিই জানালেন আকুপ্রেসার থেরাপি

হেলথ সেণ্টার জাপানের একটি সংস্থার এজেন্সি নিয়ে এখানে চটি বানাচ্ছে ও বিক্রি করছে। তাকে বেশ কয়েক চটি ফ্রি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঐ চটি কয়েকজনকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এরমধ্যে তার বাড়ির লোকও রয়েছে। বাড়ির একজনের কোমরে ব্যথা। "ব্যথা কি সম্পূর্ণ সেরে গেছে?" "না, তবে বলে তো কিছু কম।" তিনি বললেন ব্যাপারটি মানসিক কারণেও হতে পারে। কয়েক জোড়া চটি ফ্রি স্যাম্পল হিসেবে পাওয়া আর হাজার হাজার প্রচারপত্রে তার নাম ছড়ানোর মধ্যে থেকে তিনি কেন আকুপ্রেসার চটির গুণগান গেয়েছেন তা বোঝা গেল। বড় ওষুধ কোম্পানিগুলিও এইভাবে অজস্র উপহার স্যাম্পল দিয়ে ডাক্তার কেনে। তবু জিগ্যেস করলাম, "চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত নয় জেনেও আপনি কেন বিবৃতি দিলেন?" তিনি জানালেন যে, "ডাক্তারের কথা শুনে কি কেউ আসে বা কিনছে? এ দেশে তো বিজ্ঞাপনের জোরেই সব চলছে। দূর দূর গ্রাম থেকে, অন্য রাজ্য থেকে অর্ডার আসছে। আপনিই প্রথম আমার সাথে দেখা করলেন। আমার সাথে আরেক যে ডাক্তার বিবৃতি দিয়েছেন [ডা. অশোককুমার চ্যাটার্জি, এম বি বি এস (ক্যাল) এফ আর এস টি এস অ্যাণ্ড এইচ (লণ্ডন)] তিনি থাকেন বেহালায়, তার নার্সিং হোম রয়েছে কাছেই। তার কাছেও কেউ খোঁজ নিতে এসেছে বলে শুনি নি। আমার মনে হয়েছে, কম খরচ করে (চটির দাম ৯০ টাকা) কেউ যদি দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্ত হয় তবে তো ভালোই।"

শুধু এই মনে হওয়ার জন্যই একজন চিকিৎসক হয়েও তিনি বিবৃতি দিলেন, কোনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার কথা জানা নেই, অনুসন্ধান বা ব্যাপক রোগীর ওপর পরিসংখ্যান নেই, আদৌ এভাবে রোগ সারান যায় কি-না সে সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন নেই। আর এই যেখানে অবস্থা সেখানে হাজার হাজার সাধারণ মানুষও কেন বিজ্ঞাপনে ভুলে মাদুলি বা অবতারের পেছনে ছোটার মতো চটির পায়ে ছুটবেন না? ডা. সফিউদ্দিন না মনে করলেও ব্যাপক মানুষ ডাক্তারের মন্তব্য পড়ে প্রভাবিত হবেই, কারণ সেই অর্থে খোঁজ-খবর করে চটি কেনার উদ্যোগ সাধারণভাবে কারোরই থাকার কথা নয়।

আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের মাহাত্ম্য কীর্তন করে 'আজকাল'-এ লেখা প্রকাশিত হলেও ঐ আজকালেই (১৪.৩.৮৫) ডা. বিষ্ণু মুখার্জি এক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেছেন, '...কখন কখন বা, যে রোগের সাধারণত আপনা আপনিই কিছুটা উত্থান-পতন হয় (যেমন গেঁটে বাত বা অর্শ) সেই

সবক্ষেত্রে যা হোক কিছু আংটি, বালা, মালা, মাদুলি, তাবিজ বা জলপড়া দিত এবং রোগটির আপনার নিয়মেই প্রকোপ কম হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ওটি ব্যবহারের পরই সাময়িকভাবে কষ্ট কম হলে ঐ ওষুধের জয়জয়কার পড়ে যেত (বা যায়)। ইদানীং আবার কায়দা করে অং বং চং মন্ত্রের বদলে কিছু তথাকথিত চার্ট সহযোগে এবং 'বিজ্ঞান সম্পর্কিত' শব্দ যোগ করে, ঐ মূলত পুরনো নিয়মেই লোক ঠকান হচ্ছে।...

'ঐ চটি কিনে মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করবেন না। আর ঐ চটিতে যদি কাজ হয়—তবে একটা এঁচোড়ের খোসা সুকতলার আকারে কেটে বাড়িতে অপর চটিতে লেই দিয়ে সেঁটে হাঁটাহাঁটি করলেও কাজ পাওয়া উচিত।...

'বস্তুত, ফিনান্সিয়ার পেলে আমি একটি অলৌকিক ঝুমঝুমি এবং স্বাদ্য চুষিকাঠি পেটেন্ট করে বাজারে ছাড়ব বলে সিরিয়াসলি ভাবছি। এবং যেগুলি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একশ' আটবার নাড়লে বা চকচক করে চুষলে সর্দি, জ্বর, হিস্টিরিয়া, অ্যামেবিয়াসিস, টি বি, ক্যান্সার ইত্যাদি সব নির্ঘাত সেরে যাবে।'

ঠিকই, যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাসযোগ্য প্রচারের মাধ্যমে এধরনের মাল বাজারে ছেড়ে, লোক-ঠকিয়ে অল্প ক-দিনেই বড়লোক হয়ে উঠতে পারে। অবতার-বাবাজি বা গ্রহরত্ন-মেটাল ট্যাবলেটের মতো, আধুনিক যে সব সংস্কার, বিভ্রান্তিকর মিথ্যা বা অর্ধসত্য ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারমধ্যে টনিক-হরলিকস-বেবিফুডের মতো জিনিসও যেমন পড়ে, তেমনি সৃষ্টি হলো এই আকুপ্রেসার চটি—যার চাঁটির ঘায়ে আপনার পকেটের মুদ্রা ফাঁক করবার সব আয়োজন পাকা।

☐ ভবানীপ্রসাদ সাহু

আকুপ্রেসার চটির মিথ্যা বিজ্ঞাপন

'৮৫-র গোড়ার দিক থেকেই আকুপ্রেসার চটির ব্যাপক প্রচার আর বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিজ্ঞানের নামে কিছু ভুয়া তথ্য, মিথ্যা তত্ত্ব আর ভিত্তিহীন অবৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে নানা কৌশলে আকর্ষণীয় কায়দায় হাজির করে আকুপ্রেসার চটির ভালো ব্যবসা ফেঁদেছিলেন সতীস লাখোটিয়া নামে জনৈক দুঁদে ব্যবসায়ী, সঙ্গী

আকুপ্রেসার চটির মিথ্যা বিজ্ঞাপন বন্ধের নির্দেশ

নয়াদিল্লী, ৪ আগস্ট : আকুপ্রেসার চটি সম্পর্কে ভুল মিথ্যা অবৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মনোপলিস অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্রাকটিসেস কমিশনের (এম আর টি পি সি) একটি বেঞ্চ একতরফা এক অন্তর্বর্তী আদেশে কলকাতার আকুপ্রেসার হেলথ থেরাপি সেন্টারকে তাদের তৈরি আকুপ্রেসার চটি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার বন্ধ করতে বলেছেন। বিচারপতি জি আর লুথরা এবং বিচারপতি এস ডি মানচন্দাকে নিয়ে গঠিত ওই বেঞ্চ তাঁদের রায়ে বলেছেন, কলকাতার ওই কোম্পানি এমন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা জনসাধরণের সামনে বিজ্ঞাপিত করছিল যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, যার পিছনে স্বীকৃত চিকিৎসাভিত্তিক কোনও পরামর্শও নেই। সুতরাং এটা লোকঠকানো হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিচারকরা আরও বলেছেন, আকুপ্রেসার চটি বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও) অনুমোদিত বলে ওই কোম্পানি যে দাবি করেছে তাও মিথ্যা।

পি টি আই / আনন্দবাজার পত্রিকা ; ৫.৮.৮৬

হয়েছিলেন নীতিবোধহীন অর্থলোভী কিছু ডাক্তার। বহু মানুষ প্রতারিত হচ্ছিলেন দিন-দুপুরে। তবু বিজ্ঞানের নামে এই জালিয়াতি বন্ধ করার সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি। উৎস মানুষ '৮৫-র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহুর 'আকুপ্রেসার চটির চাটি' নামে লেখা, যাতে ওই 'সর্বরোগহর' চটির ধাপ্পা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো। এরপর স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসক মহলে কিছু নড়াচড়া দেখা গিয়েছিল ; একটি জনপ্রিয় দৈনিকে আকুপ্রেসার চটির ধাপ্পাকে গালমন্দ করে চিঠি লেখেন দু-জন ডাক্তার ; ভুয়া বিজ্ঞানকে শিখণ্ডী রেখে শ্রী লাখোটিয়ার অসৎ ব্যবসায়িক অভিসন্ধির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তারা। স্বভাবতই বিব্রত ও ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন আকু-চটির মালিক। ঝটিতি পাল্টা চিঠিতে তিনি প্রতিবাদী দুই ডাক্তারের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন এবং নিজের চটি-মাহাত্ম্য প্রচার করার তাগিদে আবারো কিছু স্ববিরোধী যুক্তি ও চমক-লাগালো ইংরিজি বই-এর অবান্তর ছবি হাজির করেন। লাখোটিয়াজির সে চিঠি ছাপা হয় প্রথম শ্রেণীর দৈনিকটিতেই ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখে।···এই বিভ্রান্তিকর মিথ্যায় ভরা চিঠির জবাব পাঠিয়েছিলেন ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু, সেই দৈনিক পত্রিকায়, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সে-চিঠি তারা ছাপে নি। তবে ছাপা হয়েছিল ওই চিঠি জানুয়ারি '৮৬ সংখ্যার উৎস মানুষ-এ। আরেকবার আমরা মানুষকে পণ্য করে লোক-ঠকানো ব্যবসার প্রতি আমাদের ধিক্কার ঘোষণা করেছিলাম, কেন না আমরা সভয়ে লক্ষ্য করেছিলাম যে, শহরের ওষুধের দোকানগুলিতেও আকু-চটি বিক্রির বিজ্ঞাপন ঝুলছে।···এরপর বেরোয় বিজ্ঞাপন বন্ধের খবর ৫.৮.৮৬ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়।

কোর্টের আদেশ বেরিয়েছে। জালিয়াতি ধরা পড়েছে। বিজ্ঞাপন বন্ধের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কার্যত বন্ধ হয়েছে কি? এখনো কেন দোকানে আকু-চটি বিক্রির বোর্ড ঝলছে? কেন রাজপথের মাথায় শোভা পাচ্ছে আকু-স্যাণ্ডেলের বিশাল সচিত্র হোর্ডিং? এখানো কি মানুষ নির্লিপ্তই থাকবে? নীরবে মেনে নেবে নির্লজ্জ প্রতারণা?

☐ অ. ব.

মানুষ কি পণ্যের দাস

"কখন সে সেঁধিয়ে গেছে আপনার মনের গভীরে তা আপনিও জানেন না। শুধু সেঁধিয়ে যাওয়া নয়, সে-আজ বাসা বেঁধেছে আপনার হৃদয়ের গোপন অন্তস্তলে, আপনার দেহে-মনে সমগ্র সত্তায় তার তীব্র উপস্থিতি। আজ আপনার প্রতিটি ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার হুকুমদারী, আপনার বুচিতে-মননে প্রতিটি ভালোলাগা-মন্দলাগায় তার সাড়ম্বর উপস্থিতি। আপনার আপন সত্তা আজ নিয়ন্ত্রিত হয় তারই সুচতুর কৌশলে। এখন তাকে প্রশ্ন করতে গেলে প্রশ্ন করতে হয় নিজেকে, অথচ আপনার এই নিজস্বতার দম্ভ, সে-ও তো আজ অনেকখানিই গড়ে উঠেছে তারই আনুকূল্যে।"—এমন একটা বিজ্ঞাপন যদি লটকে দেওয়া হতো শহরের রাস্তায় রাস্তায়, বাড়িতে বা রান্না-ঘরের দেওয়ালে তাহলে অনেকেই হয়তো চোখ তুলতেন কপালে—এ-আবার কেমন ধরনের রসিকতা! এমন ধাঁধার অর্থটাই বা কি দাঁড়ায়?

ওপরের কথাগুলি অনেকটা ধাঁধার মতো শোনালেও এর ভাবার্থ কিন্তু খুব সহজ-সরল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য এবং তার ওপর আমাদের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতাকেই তো প্রশ্ন করা হয়েছে। এ-প্রশ্ন উৎস মানুষ-এ 'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়' সিরিজে সামান্য কিছু ব্যবহৃত পণ্যকে ঘিরে তোলা হয়েছিল। সেই সামান্য কিছু পণ্যকে মাত্র উদাহরণ হিসেবে তুলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ছবিটি, এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের 'মানসিক গঠনে'র বিশেষ অবস্থাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল ঐ বিশেষ সিরিজটিতে। বর্তমানের আলোচনা ঐ ভঙ্গুর ও অত্যন্ত নির্ভরশীল 'ক্রেতা মানসিকতা' ও তা গড়ে ওঠার পরি-প্রেক্ষিতকে ঘিরে। ঐ কয়েকটি উদাহরণের বাইরেও আরো হাজারো দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, যেগুলি ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট অথচ পাশাপাশি যেগুলির অভাবে আমরা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগি। এসব পণ্যের অভাববোধ আমাদের চেতনায় আজ গভীরভাবে প্রোথিত। কিন্তু কেন, এবং কিভাবেই বা তা গড়ে উঠলো?

বহু পাঠক-পাঠিকা ক্ষিপ্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন, বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীকে নাকি আমরা বরবাদ ঘোষণা করেছি। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন সবকিছুতে বাতিল স্ট্যাম্প বসানোর বেয়াড়াপনায় মেতে উঠেছে 'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়' কলামটি ; পৃথিবীর সমস্ত ধরনের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ আর মাধুর্যের অস্তিত্বকে নাকি অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে এর মাধ্যমে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, 'না, অস্বীকার করার উপায় নেই—সত্যিই লেখাগুলি যথেষ্ট তথ্যনির্ভর এবং যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু এগুলিকে বাদ দিলে জীবনের আর কি-ই বা থাকে বলুন। যেটুকু নিয়ে আমাদের সুখ ছিল তার গোড়াতেও এমন নির্মম কোদাল চালানোর কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়েছিল আপনাদের ?

এটা আদৌ কোনো নতুন কথা নয় যে, আমাদের সমাজে পণ্য উৎপাদনের মালিক বা নিয়ন্ত্রকরা পণ্য উৎপাদন করে লাভের জন্য, সাধারণের কতোটুকু কাজে লাগবে সেকথা ভেবে নয়। তাদের উদ্দেশ্য মুনাফা। কথাটা সত্যি, কিন্তু আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। অর্থাৎ কিছু ফাঁক রয়েছে বক্তব্যটার মধ্যে। যদি সাধারণের প্রয়োজনে সে-পণ্যের গুরুত্ব না-ই থাকে তো মানুষ তা কিনবে কেন ? আর লোকে না কিনলে সে-বস্তু তৈরি করার কোনো মানেই হয় না, তাতে ব্যবসাই চলবে না। একারণেই পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারের 'গুরুত্ব'টিকেও 'উৎপাদন' করা হয়—তৈরি করা হয় ক্রেতার মানসিকতা। পণ্যটির প্রয়োজনীয়তা ক্রেতার মনে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অর্থাৎ কি-না পণ্যের গড়নে মানুষের রুচি ও ইচ্ছে গড়ে দেওয়া হয়। আরো সহজ করে বলতে গেলে, এমনি নানাবিধ পণ্যের প্রয়োজনে বা পণ্যের বাজারের প্রয়োজনে মানুষটিকে অর্থাৎ তার মনন-রুচি-ভালোলাগা-মন্দলাগা সমস্ত কিছুই অত্যন্ত কৌশলে গড়ে দেওয়া হয়। কার্যত এইভাবেই পণ্য বাজারের জন্য মানুষ অর্থাৎ মানুষ পণ্যের নিমিত্তমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষের জন্য পণ্য নয়, পণ্যের জন্য মানুষটি তৈরি হয়ে যায়। এবার ঐ সব পণ্যগুলির অভাবে ক্রেতা অস্বস্তি বোধ করবে, অসুখী হবে, হয়তো কোনো একটি বস্তুর জন্য বোধ করবে নিরাপত্তার অভাব, অসহায় বোধ করবে ভীষণভাবে ; এভাবেই ক্রেতার মনে অসন্তুষ্টি বা অসুখীভাব সৃষ্টি করে তা বিশেষ পণ্যটি দিয়ে মিটিয়ে দেবার খেলা চলে পণ্যের বাজারে, কার্যত ক্রেতা এখানে পণ্য উৎপাদকের ক্রীড়নক মাত্র। মনে পড়ছে কি সিগারেটের সেই বিজ্ঞাপনটি…"আপনার মত লোককে খুশি

রাখা—হ্যাঁ, সে কেবল চারমিনারই পারে।" খেয়াল করুন কী কায়দায় সিগারেটের ওপর একটি গুণ আরোপিত হলো।

অর্থাৎ পণ্য তৈরি এবং পণ্যের জন্য বাজার তৈরি, যে-বাজারে ক্রেতারা হুমড়ি খেয়ে পড়বেন—তার ব্যবস্থা চলে পাশাপাশি। আর এই বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকদের সব থেকে বড় হাতিয়ার হলো বিভিন্ন ধরনের প্রচারমাধ্যমগুলি। কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করতে এগুলির ক্ষমতা অসীম। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, প্রাজ্ঞ-জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের ওপরেও এর প্রভাব প্রচণ্ড। হয় কে নয় করতে, জলজ্যান্ত সত্যকে মিথ্যে বলে, মিথ্যেকে সত্যি বলে, ক্রেতা-সাধারণের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে এর ব্যবহার দিন-দিনই বাড়ছে। এমন ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেওয়া যায় যে, বিজ্ঞাপনের বক্তব্য শুধু মিথ্যে নয়, যা শুনলে প্রত্যেক সুস্থ মানুষের হাসি পাওয়া উচিত। যেমন ভিটামিন ট্যাবলেটের এক বিজ্ঞাপনে বহুজাতিক কোম্পানি রোশ (**Roche**) এর ব্যবহারের প্রয়োজনীতা দর্শাতে গিয়ে বলেছে, "যে-সব বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না, যারা অন্য বাচ্চাদের সম্বন্ধে অভিযোগ আনে বা যে-সব বাচ্চারা স্কুলে খাতা-পেন্সিল ফেলে আসে তাদের জন্যে এই ভিটামিনেটস ফোর্ট ট্যাবলেট" ; কিংবা দাড়ি কামানোর পর গালে লাগানোর সুগন্ধি 'অ্যান্টিসেপটিক' লোশন ওল্ড স্পাইস (Old Spice) যখন বিজ্ঞাপন দেয়—"উত্তেজক, রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী···আফটার সেভ···" তখন মুখ টিপে নয়, হো-হো করেই হাসা উচিত (অবশ্য কেউ যদি ওল্ড স্পাইস পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে তো অন্য কথা, কারণ ওতে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল রয়েছে, তাতে রক্তে উন্মাদনা আনতেই পারে, কিন্তু দাড়িতে !)। অধিকাংশ চুলের তেলের বিজ্ঞাপনে চুল গজিয়ে ওঠার যে-সব লম্বা ফিরিস্তি থাকে, তা দেখলে মৃত-ব্যক্তির মাথার চুলও খাড়া হয়ে ওঠা উচিত। অথচ এই অত্যন্ত সহজ-সরল মিথ্যেগুলিও কালক্রমে 'প্রায় সত্যি' বা 'মিথ্যে না-ও তো হতে পারে' কিংবা 'দেখিই না একটু পরীক্ষা করে' এই আশ্বাসের ফাঁক দিয়ে লাখ লাখ মানুষের মনে আস্তানা গেড়ে বসে। কি সহজে ভুলিয়ে দেওয়া যায় ক্রেতাকে রঙিন কথার ফানুসে। তার দুর্বলতাকে ভাঙিয়ে বাজারে ছাড়া হয় 'ব্রেনোলিয়া—স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক'। কিংবা 'আপনার ত্বকে এনে দেবে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য—কেয়োকার্পিন ম্যাসাজ অয়েল', 'শক্ত এবং সুস্থ সবল মাড়ির জন্য একটি প্রাকৃতিক উপায়—নিম টুথপেস্ট', কিংবা 'গলার পক্ষে উপকারী, স্বাদে অনন্য

—ভিকস্ হার্বাল বড়ি', অথবা 'আজকের পরিবারের জন্য অতি স্বাস্থ্যকর পানীয় নেস্‌টোমল্ট'—ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ধরনের মিথ্যে প্রচারের বিরুদ্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্বসহকারে কিছু রচনা কিছু কিছু পণ্যকে ধরে উৎস মানুষ পত্রিকার পাতায় লেখা হয়েছে। কিন্তু তাতে কি ক্রেতারা, অন্তত যারা এই পত্রিকাটি পড়েন, তাদের পুরোনো অভ্যেস তারা ছেড়ে দিয়েছেন ? এমনটা মনে হয় না। এর পেছনে হয়তো বহুবিধ কারণ দর্শানো হবে। তবে অনেকের জীবনে অভ্যেসের নিয়মে বা তার সংস্কৃতিতে এই সব পণ্যের অস্তিত্ব এতো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে টান পড়লেও তা গ্রহণ করতে সমর্থ হন নি। এক অসহায়ত্বের কবলে পড়ছেন কেউ কেউ। অনেকেই স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় যুক্তির প্যাঁচ কষেছেন, 'আমি তো ভিকস্ বড়ি বহুদিন ধরে ব্যবহার করছি', কিংবা 'মারকিউরো-ক্রোম অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ব্যবহার করে কাজ পেয়েছি'—অনেকটা সেই ব্রিটানিয়া বিস্কুটের বিজ্ঞাপনের মতো, 'আমি তো ৫০ বছর ধরে খেয়ে আসছি···ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট'—এভাবেই বিশ্বাস মাথার গভীরে গেড়ে বসে, কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেও সাহস পায় না। কেউ হয়তো একটু মাথা নাড়িয়ে বলবেন, 'না মশাই যা-ই বলুন না কেন, সাধারণ ভেসলীন থেকে বোরোলীন একটু বেশিই কাজ করে,—আমি তো ব্যবহার করে দেখেছি।' যদি বলা হয় সাঁইবাবার ছাইপাঁশ খেয়ে কিংবা শিবের মাথায় জল ঢেলে নানান জনে যে নানান কিছু দেখেন তা কি আপনি স্বীকার করেন ? তখন অবশ্য তাদের বিজ্ঞান-চেতনা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। আরো মজার ব্যাপার হলো, দেখা এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাঝে ফাঁকটুকু তারা বেমালুম ভুলে যান। অথচ দেখার থেকে সিদ্ধান্তে আসার রাস্তাটি একটি যৌক্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার অনুগামী হবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়—এটা আজকের ঘটনা নয়—মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই তা দেখে আসছে। অথচ এই দেখার থেকে গ্যালিলিও-পূর্ব মানুষেরা এক ধারণায় বদ্ধমূল ছিল—যদিও এই দেখার ব্যাপারটা গ্যালিলিওর পরেও পাল্টায় নি, এখনও সূর্য সেই পুব দিকে ওঠে কিন্তু বর্তমানের মানুষেরা অন্য এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত যুক্তি ও তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে। গ্যালিলিও-র দুর্ভাগ্য, বর্তমানের এই সব 'যুক্তিবিদ্ দেখনেওয়ালারা' কথায় কথায় তাকেই স্মরণ করেন বেশি বেশি করে।

যারা বলে থাকেন, ধরে নিলাম ঐ সব প্রসাধনসামগ্রী, কোল্ড-ড্রিঙ্কস বা ঐ ধরনের সব পণ্যগুলির সত্যিই কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই—কিন্তু সব কিছুই কি ঐ মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে—রুচি, অনুভূতি, সংস্কৃতি এসবের কোনো মূল্য নেই? তাদের কাছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন রাখছি—যে রুচি-সংস্কৃতির দোহাই দিচ্ছেন সেগুলিই বা কি করে গড়ে ওঠে? কে-ই বা গড়ে দেয়? মানুষ জন্মেই নিশ্চয় এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় না! একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পণ্যের মালিকেরা পণ্যের গুণাগুণ (তা সে সত্যি-মিথ্যা যাই হোক না কেন) বলতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচারে আনেন-ই না, বরং এমন কিছু ছবি বা বক্তব্য রাখেন যার সঙ্গে পণ্যটির গুণাগুণের কোনো সম্পর্কই নেই। ক্রেতার মানসিক দুর্বলতা, নিরাপত্তাহীনতা, অসুস্থতার বিভিন্ন দিকগুলি সরাসরি ব্যবহার করে পণ্যটি ঠেলে দেওয়া হয় ক্রেতার দিকে। কখনো ক্রেতার অহংবোধে খোঁচা দিয়ে, কখনও পণ্যটিকে দেখানো হয় ক্রেতার 'স্ট্যাটাস-সিম্বল' হিসেবে। তখন ঐ পণ্যটি ব্যবহার না করলে যেন পরিবারে বা সমাজে তার আর মান থাকবে না। কখনো ক্রেতার না পাওয়া জগতের বেশ কিছু স্বপ্নকে জড়ো করা হয় পণ্যটির সঙ্গে।...ভাবুন দেখি, এক সাবানের বিজ্ঞাপন কেমন হতে পারে! 'ওয়েসিস সাবান জীবনে বিশ্বাস এনে দেয়...', কিংবা 'এক উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা—রিজেণ্ট'। বড় বড় বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যাবে কোনো এক সম্ভ্রান্ত পুরুষের দিকে এগিয়ে আসছেন কোনো এক সুন্দরী মহিলা, প্রেক্ষাপটে হয়তো কোনো এক বিমান বন্দর বা সুদৃশ্য নাট্যশালা বা কোনো এক উচ্চবিত্তের প্রাসাদ বা বাগানবাড়ি। আর্থিক সচ্ছলতা আর প্রাচুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক জোড়া মানব-মানবীর মোহময় আলাপন মুহূর্ত গেঁথে দেওয়া হয় কোনো এক কোম্পানির সার্টিং-সুটিং-এর সঙ্গে—এখানে পণ্যটির গুণাগুণ নিয়ে কিন্তু কোনো কথাই বলা হয় নি। কখনো দেখা যাবে একগুচ্ছ মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন কিছু ঘড়ির ওপর, কিংবা কোনো ব্লেডের চাকচিক্য পরখ করছেন কোনো সুন্দরী মহিলা। কখনো দেখা যাবে এক পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা পড়েছেন একাধিক রূপসী—কোনো মহিলার দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছেন এক উজ্জ্বল পুরুষ—এসবের উদ্দেশ্য হলো ক্রেতার স্বপ্নলোকের জগতে ঢুকে পড়ে, পণ্যটিকে বাড়িয়ে দেওয়া ক্রেতার দিকে। ক্রেতার না পাওয়ার জগতটিকে উসকে দিয়ে তার অসুখী মনের কোণে সুখের চাবি-কাঠি হিসেবে হাজির করানো হয় বিশেষ পণ্যটি। এক কথায় তার

সেই রূপকথার জগতে পৌঁছে দেওয়ার যেন রাস্তা করে দেয় সেই দ্রব্যটি তা সে কোল্ড-ড্রিঙ্কস, সুটিং সার্টিং কিংবা আফটার সেভ লোশন থেকে শুরু করে সামান্য ব্লেড বা নেল-পালিশ—সব কিছুই হতে পারে। এভাবেই আসলে গড়ে ওঠে তথাকথিত ক্রেতার রুচি, এভাবেই আলোড়িত হয় তার অনুভূতি এবং ক্রমে ক্রমে সেই পণ্যটি তার সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। দেখুন কি অসামান্য চাতুর্যে আপনার দারিদ্রপীড়িত জীবনে রাজার স্বাদ তুলে দেওয়ার কুহেলী সৃষ্টি করা হয়—'live life king size' অর্থাৎ রাজার মতো জীবন চাইলে অমুক সিগারেট টানুন। 'Royal view' বা রাজকীয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন আপনি, যদি পরেন অমুক সার্টিং ; কখনো বা এ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ব্যস্ত এবং সফলতম মানুষগুলির প্রতিকৃতি তুলে ধরা হয় পণ্যটির পাশাপাশি—দেখানোর চেষ্টা করা হয় ঐ সব মানুষগুলির রুচি বা ইচ্ছা অনুসরণ করলে আপনিও ঐ জগতে পৌঁছাতে পারবেন ; যেমন, 'অফিসপাড়ার সাথী—বোরোলীন', গতিশীল ও বহুমুখী মানুষের অঙ্গে শোভা পায় মডার্ণ সুটিং…'জীবনসংগ্রামে জয়ী মানুষ এবং ডি সি এম সুটিং।' আবার বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অফিস-আদালতের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সপ্রসংশ বক্তব্য জুড়ে দেওয়া হয় টয়লেট সাবানে কোল্ড-ড্রিঙ্কস বা হেলথ-ফুডের সঙ্গে। এখানেও পণ্যের গুণাগুণ নয়—পণ্যটি কোন্ গুণাগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যবহার করছেন সেটাই পণ্যের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। বহুক্ষেত্রে বিক্রেতারা পণ্যটির সঙ্গে সমাজের কোনো নামী ব্যক্তিত্বকে জুড়ে দেন ; কখনো তারা সিনেমার চিত্রতারকা, নামী ক্রিকেটার বা দামী টেনিস খেলোয়াড় হয়ে থাকেন। রূপালী পর্দার নায়িকা যখন বলেন 'হাম তুম আউর থ্রিল' তখন ক্রেতা ঐ নামের কোল্ড-ড্রিঙ্কস-এ প্রলুব্ধ হবেন—পানীয়টি যে-রকমই, যে-স্বাদেরই হোক না কেন। লাক্স সাবানের প্রচারে চিত্রতারকারা থাকবেন না এটা ভাবাই দুষ্কর। ঠাণ্ডা পানীয় বা টি-শার্টের বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছন্দে চলে আসে গাওস্কর বা রবি শাস্ত্রীর মতো ক্রিকেটাররা ; আর সে-নামের পণ্যটির বাজারে কাটতি হু-হু করে বেড়ে যায়। ঐ পোশাক তৈরি কোম্পানির চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'এই বিজ্ঞাপনে দর্শকরা দেখেন, খুব ঠাণ্ডা মাথায় অবলীলায় জয়ের প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন রবি শাস্ত্রী—তখন ক্রেতারাও এই শার্ট গায়ে দিয়ে নিজে-দেরকে ঐ জায়গায় বসিয়ে নিয়ে ভাবতে চান, ঐ জয়ের অনুভূতিটা পেতে চান।' অর্থাৎ এখানেও পণ্যের মাধ্যমে একটা অপূর্ণ ইচ্ছা একটা মেকি

অনুভূতির মোহাঞ্জন বুলিয়ে দেওয়া হয় ক্রেতার চোখে।…কিন্তু শুধু কি তাই ?

আসলে এ-সবের মাধ্যমে একটা বিশেষ জীবনযাত্রাকে মহিমান্বিত করা হয় বা সেই জীবনের ছবিটিকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ক্রেতার কাছে। লিনটাস ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরের ভাষায়, 'আসলে আমরা যা বিক্রি হতে দেখি, তা হলো একটা বিশেষ life-style বা জীবনযাত্রার ছবি।' এমনি নানান প্রক্রিয়ায় বাজার গড়ে তোলা হয়, তৈরি হয়ে যায় ক্রেতার মানসিকতা, এবং এক অর্থে তার রুচি। এরপর ঐ বিশেষ পণ্যটির অভাবে ক্রেতা মানসিক অস্বস্তি বোধ করবে, অসহায় বোধ করবে—কখনো বা শারীরিক বা মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধ তাকে কুরে কুরে খাবে। উৎস মানুষ পত্রিকার পাতায় হরলিকস সম্পর্কে প্রচারিত গুণাগুণগুলির ধাপ্পাবাজি সবিস্তারে বর্ণিত হলে দেখা যায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ক্রেতা শেষ পর্যন্ত ওরই মতো আর এক হেলথ ফুড 'ভিভা' কিনে সান্ত্বনা খুজে পান। আসলে এতো গভীরভাবে ক্রেতার মননে এর অভাববোধ গড়ে তোলা হয়েছে এবং অভ্যাসে তা এতোই রপ্ত হয়ে গেছে যে, তথ্য বা তত্ত্বসমৃদ্ধ বিরুদ্ধ বক্তব্য তার চিন্তার জগতে ঝড় তুললেও ব্যবহারিক জীবনে তা ব্যতিরেকে ক্রেতা প্রচণ্ড অসহায় বোধ করবে। টনিক খেয়ে স্বাস্থ্য বজায় রাখার মানসিকতা বা মাথা ঠাণ্ডা বা চুলের স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখতে তেলের ব্যবহারের কথা ভয়ঙ্করভাবে সমালোচিত হলেও ক্রেতার পক্ষে তা ছাড়া দুষ্কর, কারণ তা এখন তার জীবনযাত্রার অঙ্গ। টনিক ব্যতিরেকে তিনি স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় জর্জরিত হবেন—তেল ব্যতিরেকে তার 'মাথা গরম' হবেই, ভিটামিন টনিকের বিরুদ্ধ সমালোচনায় পর্যুদস্ত 'বিচক্ষণ ক্রেতাই' আবার আয়ুর্বেদিক টনিক 'চ্যবন-প্রাশ' খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'টনিক' ব্যাপারটা তার চেতনার কতো গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েহে, ভাবতে অবাক লাগে ; একেই হয়তো সঠিক অর্থে বলা যেতে পারে মগজ-ধোলাই। না, কোনো রাজনৈতিক পার্টিরও এতো তুখোড় ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে হয় না। পণ্যের বাজার তৈরি কি নিপুণভাবেই না করা হয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ ক্রাঞ্চ (Cranch) খুব ছোট্ট কথায় ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'নতুন বাজার তৈরি করার অর্থ জীবন ধারা পাল্টানো (Creating a new market means changing a way of life)।'

শুধু তাই নয়, বাজার তৈরির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধেও রূপান্তর ঘটে। ছেলেরা ছোটাছুটি করলে পরিশ্রান্ত হবে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু কালক্রমেএটাই শারীরিক অসুস্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে বা হচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন 'গ্লুকন ড়ি'। স্কুলে বাচ্চাদের যেতে না-চাওয়ার কারণ হিসেবে চলে আসছে ভিটামিনের অভাব, ছেলের পড়াশুনায় মন বসছে না—অতএব ওর দরকার 'মলটোভা', নারীত্বের স্বীকৃতি 'হেয়ার রিমুভারে'র সাহায্যে শরীরের চুল উপড়ে ফেলার মাধ্যমে। এভাবেই নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা অর্থাৎ আরো কিছু ধরনের পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা হয়। আর এই বাজার তৈরি করার মূল চাবিকাঠি কি? এর উত্তরে এক কৃতী ম্যানেজার খুব সরল ভাষায় বলেছেন এ-ভাবে—যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'আমরা কি বিক্রি করি', তার উত্তর 'না, কখনোই কোনো পণ্য নয়— সব সময়ই একটি বিশেষ ধারণা (Never a product, always an idea)'। আর এই ধারণা বিক্রি চলে সমস্ত ধরনের প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে, যা অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ে ক্রেতার ওপর। নাজী জার্মানীর প্রচার সচিব গোয়েব্‌লস বলেছিলেন, একটি মিথ্যেকে হাজারবার সত্য বলে প্রচার করলে, সত্য হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ অনবরত, অবিশ্রান্ত ধারায় রাস্তা-ঘাটে-বাটে, মোড়ে মোড়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলা হবে বোরোপ্লাস ; ঘরে এসে পত্রিকা খুলে দেখবেন বোরোপ্লাসের ছবি ; রেডিওতে শুনবেন তার গুণপনা ; টিভিতে দেখবেন তার চমৎকারিত্ব—তারপর আর আপনার বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না যে, ওটা একটা 'অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম'—ওটা ছাড়া জীবন চলাই অসম্ভব মনে হতে থাকবে আপনার। ডিটারজেন্টের ক্ষেত্রে ব্রিটেনে এক সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে, বাজারে ডিটারজেন্টের বিক্রি সরাসরি নির্ভর করে কোম্পানিটির প্রচার বাবদ কতোখানি খরচ করছেন তার ওপর। দেখা গেছে, কোনো এক কোম্পানি তার সমগ্র খরচের ৬০% বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করে সে-দেশের প্রায় ৬০% বাজার নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছেন, আবার তারাই যখন প্রচারের মোট খরচের ২০% নামিয়ে আনছেন তখন বাজারে তাদের বিক্রি হু হু করে কমে গিয়ে ১০%-এ এসে দাঁড়াচ্ছে। এই বিজ্ঞাপনের দৌলতেই মারমাইটের (Marmite)-এর বিক্রি ৫০% বেড়ে যায়, বেবিফুডে মায়েরা 'আসক্ত' হয়ে পড়েন, ৫০০ ধরনের লিপস্টিক বেরিয়ে পড়ে বাজারে, ঠাণ্ডা পানীয় বা বিয়ার ছাড়া আনন্দ অনুষ্ঠান ভাবা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর এই প্রচারের দৌরাত্মে বস্তুর নামটি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়কোম্পানিদের দেওয়া 'ব্র্যাণ্ড' নামের চাপে। কারণ সেই বিশেষ 'ব্র্যাণ্ড'টিকে বাজারে

প্রতিষ্ঠিত করার ভেতরই নির্ভর করছে কোম্পানির ব্যবসা ও লাভ। কেনিয়ায় চারটি অতি সাধারণ পণ্য নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, এগুলি টুথপেস্ট, সিগারেট, অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট (মাথাধরার বড়ি) ও দাড়ি কামানোর ব্লেড। দেখা গেছে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেক কেনিয়ান এগুলিকে কোম্পানিদের দেওয়া 'ব্র্যাণ্ড' নামে চিহ্নিত করছে, এদের আসল বা সাধারণ নাম তাদের মাথা থেকে মুছে গেছে। প্রচারের ক্ষমতা কতো বিরাট ও শক্তিশালী তা বুঝতে এই একটি ঘটনাই বোধহয় যথেষ্ট। আর এই ব্র্যাণ্ড নাম প্রচার করার কৌশলে সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুত্বের কর্তব্য কি হবে বকলমে সেটারও নির্দেশ চলে আসে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে '···রাজুর মা জানে তার ছেলের পুষ্টি কিসে'। এর-পর হরলিকস না খাওয়ানোর অর্থ দাঁড়াবে, মায়ের কর্তব্যে গাফিলতি। স্বামী যদি প্রেস্টিজ প্রেসারকুকার স্ত্রীর হাতে না তুলে দেন তো তার দায়িত্বে ঘাটতি থেকে যাবে,স্ত্রীর ভালোবাসা প্রকাশ পাবে হয়তো এলপারসুটিং-এ স্বামীকে সাজানোর মাধ্যমে। এককথায় আমাদের জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের রাস্তা কিছু পণ্যের আদলে গড়ে উঠবে। এভাবেই ধীরে ধীরে একটি সুখী সমাজ বা জীবনের ছবি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আপনার মাথার মধ্যে। ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে আমুল চকলেটে ; ক্যাডবেরিতে অপরের ভাগ না বসাতে দেওয়ার স্বার্থপরতায় বা ওনিডা (Onida) টিভির সৌন্দর্যে ঈর্ষান্বিত হতে হবে আপনাকে ; তারপর হয়তো এমন দিন আসবে যখন আপনি 'হরলিকস জননী' বা 'নিকিতাসা গৃহিণী' কিংবা 'কেবলই ভিমল' (Only Vimal)-এর ছাপে স্বামীত্বের আদল খুঁজে বেড়াবেন।

প্রচারের ভেল্কিবাজি তাই শুধু পণ্যতেই নয়, পণ্যের জন্য ক্রেতাকে গড়ে তোলা হয়। আর এ-ব্যাপারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ক্ষমতা সর্বাধিক, কারণ তারা প্রচারের জন্য অনেক বেশি খরচ করতে পারে—ফলত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে মাত্র সামান্য কিছু কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থের মাপকাঠিতে কি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এই কোম্পানিগুলি, ভাবতেও অবাক লাগবে। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির এক বছরের লেন-দেন মালয়েশিয়ার জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি। ইউনিলিভার (Uniliver) সেই অর্থে ঈজিপ্টের থেকেও বড়। আবার আমেরিকার ১৫টি বহুজাতিক সংস্থার আয় ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি। এই প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারি কোম্পানিগুলি শুধু পণ্যের উৎপাদনকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার

বার্ষিক ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের বল্গাহীন প্রচার কোনো পণ্য সম্বন্ধে যে-খবর দেয়, তা মূলত তাদেরই সৃষ্টি। তারা ক্রেতাকে তাদের মতো করে শিক্ষিত করে ; তার রুচিকে, তার চিন্তাধারাকে সর্বোপরি তার জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের ব্যবসার স্বার্থে। আর তাই পণ্যের বাজারে চলছে এক চূড়ান্ত নৈরাজ্য। যদি শুধু ওষুধের বাজারের কথা ধরেন, তাহলে দেখা যাবে এদেশে যেখানে ১১৭টা ওষুধে চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল সেখানে বাজার জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের প্রায় ১ লাখ ওষুধ। ওষুধের বাজারের ৬০%-এরও বেশি ওষুধ অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক বা ক্ষতিকারক। চিত্রটি অনুরূপ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বাজারেও পরিলক্ষিত হবে। বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির (Marketing economy) এ এক অবশ্যম্ভাবী ফল বোধহয়। কারণ পণ্যের মালিকের উদ্দেশ্য লাভ ; সে উৎপাদন, বণ্টন এবং ব্যবহার সবটাই এখানে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতবর্ষে প্রসাধন ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছর যুক্ত যে-ব্যক্তি সেই রাম পঞ্চল (Ram Panchal)-এর বক্তব্য তুলে ধরছি, "প্রসাধন ব্যবসায় কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয় না, বিক্রয় করা হয় কিছু স্বপ্ন।" আর আমে-রিকার প্রসাধন ব্যবসার অন্যতম দিকপাল—যাদের ব্যবসা কয়েক-শ' কোটি টাকার ওপর তিনি বলছেন, "আসলে আমরা শিশি-বোতলে পুরে আশা বিক্রি করি"—যদিও ক্রেতারা ঐ স্বপ্নগুলিকেই সত্যি বা আশাগুলি ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে ধরে নেন। এই ধরুন না, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে একটা সিগারেট ধরাতে পারলে বেশ হতো, লেখাটা তরতর করে এগিয়ে নেওয়া যেত—ভাবতে ভাবতে হয়তো হাতটা এগিয়ে যাবে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে, তারপর ঐ কি যে বলে—'সুখটান'—একটা মনগড়া 'সুখের অনুভূতি'-র জন্ম হবে মাথায় ; এভাবেই ক্রমশ ঐ পণ্যটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হবে আমার মধ্যে, তারপর এর অভাবে উস্‌খুস করবে মন, একটা অস্বস্তি খোঁচা দিতে থাকবে মনের মধ্যে, এইভাবে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অভ্যেসের দরুন ক্রেতার শরীর মন এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে, তখন চরম সত্যটি তুলে ধরলেও ক্রেতার পক্ষে ঐ অভ্যেসটি ছাড়া দিন কাটানো মুশকিল হয়ে পড়বে। ঐ সিগারেটের মতোই বিভিন্ন ধরনের 'নেশা'তে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ক্রেতা। দাড়ি চেঁছে আফটার সেভ লাগাতে না পারলে ভীষণ অস্বস্তি লাগবে, ভয় হবে নিরাপত্তাহীনতার—ঐ বুঝি কিছু ঘটে যাবে গালে, যদিও আফটার সেভের নিরাপত্তার আশ্বাস—আশ্বাসেই,

বৈজ্ঞানিক সত্যতা তার ধারে-কাছেও পৌঁছায় না। মাথায় তেল না লাগিয়ে একদিনও কাটানোর কথা অনেকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। দুরন্ত প্রচারের জোরে মিথ্যেকে সত্যি বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আপনার মাথার মধ্যে, আর তাতেই কেল্লাফতে। তাই আটের দশকে প্রসাধনের বাজার হু হু করে বেড়ে গিয়েছে এদেশে এবং তা ১০০ কোটি টাকার অংক ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ভেষজের গল্পগুণে ভিকো ল্যাবরেটরি মাত্র সাত বছরে তাদের ব্যবসাকে ১০ লাখ টাকা থেকে ৭ কোটি টাকায় এনে ফেলেছে। এরপর 'হলুদ মার্কা ভ্যানিশিং ক্রিম' আপনার সাথী না হয়ে পারে কি? দাঁত নড়ে গেলে, মাড়িতে রোগ হলেও আপনার 'ভিকো বজ্রদন্তিতে' বিশ্বাস বাড়বে বই কমবে না। পনড্‌স বছরে ২০ কোটি টাকার ব্যবসা করে স্রেফ কিছু ভাঁওতাকে ক্রেতার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দৌলতে—আর এরজন্য প্রসাধন ব্যবসায়ীরা মোট খরচের একটা বড় অংশ ব্যয় করে প্রচারের জন্য, যা পণ্যটির বিক্রয়মূল্যের অর্ধেক বা তারও বেশি হতে পারে। এক প্রখ্যাত ম্যানেজারের (Marketing manager) কথায় প্রচারের উদ্দেশ্য হলো—মানুষের ব্যবহারকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যা বিক্রেতার স্বার্থকে আগলাবে, তাকে এক কথায় 'Indoctrinate' অর্থাৎ পণ্যটির মতবাদে নিষিক্ত করতে হবে।

অনেকেই হয়তো এবার ভ্রূ-কুঁচকে বলবেন, অনেক কিছুই তো বললেন, কিন্তু যে-দেশে ৬০% লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, আর বাকি নিম্নবিত্তের মানুষেরা কায়ক্লেশে দিন কাটায়, সেখানে এসবের গুরুত্ব কি খুব একটা আছে? কথাটা সত্যি নয় বরং উল্টো, নিম্নবিত্তদের ওপর এই তথাকথিত পণ্যগুলির প্রভাব অনেক বেশি—সেই হিসেবে উক্ত মন্তব্যটি বিপজ্জনকও বটে। যদি ধরে নেওয়া যায়, এদেশের মাত্র ৫% মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা রয়েছে তাহলেও এদেশের পণ্যের বাজার কানাডার থেকেও বড়। আর ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হলো বাজার সৃষ্টি করা, যেটুকু বাজার রয়েছে তাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা নয়। তাই এদেশের বৃহত্তম ক্রেতাগোষ্ঠী, নিম্ন-বিত্তদের দিকেই ব্যবসায়ীদের সজাগ দৃষ্টি। তারা খুব ভালোভাবেই জানে নিম্নবিত্তেরা মানসিকভাবে আরো বেশিরকম নির্ভরশীল এই অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ওপর, কারণ তাদের স্বপ্ন আর পাওয়ার জগতের ভেতরের ফাঁকটা আরো বেশি চওড়া। তাদের কাছে কোনো পণ্য তাই গুরুত্ব পায় 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হিসেবে—ওই পণ্যটি ব্যবহার করে তিনি তার নিজের অবস্থান বা

"স্ট্যাটাস'কে উন্নত দেখবার মরীচিকা গড়ে তোলেন। 'আধুনিকতা' বা
'প্রগতির' ছাপ্পা মারা কোনো পণ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ তাই সর্বাধিক।
দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো, সমাজের নিম্ন বা মধ্যবিত্তের, উচ্চবিত্তের চালচলন-
ভাবভঙ্গি-ব্যবহার-রুচি বা এককথায় life-style বা জীবনযাত্রাকে অনুকরণ
করবার আপ্রাণ চেষ্টা। এর মাধ্যমে তার নিজের স্বপ্নকে পরিতৃপ্ত করার এক
অসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যান অবিরত। এদেশে অনাহার, দারিদ্র আর অপুষ্টি
হলো অধিকাংশ মানুষের নিত্যসাথী, আবার এগুলিই হলো পণ্যের মালিক-
দের ব্যবসার মূল হাতিয়ার। শুনতে একটু খটকা লাগলেও যাচাই করে নিতে
পারেন—এদেশে খুব কম পণ্যের বিজ্ঞাপন পাবেন যাতে 'স্বাস্থ্য' বা 'পুষ্টি'র
কথা বলা হয় না। স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় (হরলিকস, কমপ্লান ইত্যাদি)
বলে বাজারে যা বিক্রি হয় তার কথা তো ছেড়েই দিলাম। জেলি,
তেঁতুলের চাটনী, সিনথেটিক সরবৎ বা মশলার গুঁড়ো থেকে শুরু করে মায়
সাবান-শ্যাম্পুতে গিয়ে তা ঠেকেছে। আর এই প্রচারের তোড়ে ভেসে গিয়ে
নিম্নবিত্তের মানুষরাই ছোটেন এগুলির পেছনে এবং তারাই এক অর্থে ক্ষতি-
গ্রস্ত হন সব থেকে বেশি ; জীবনধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি
না কিনে বা কমিয়ে তারা শারীরিক ও আর্থিক দুভাবেই নির্যাতিত হন—
এই 'বাজার-ভিত্তিক' সভ্যতার উৎপীড়নে। আফ্রিকায় কোলা পানীয়ের
ব্যবহার মধ্যবিত্তের ঘরে শুধু '৬০ থেকে '৭০ এই দশবছরে দ্বিগুণ বেড়ে
গেছে। নাইজিরিয়ায় ছ-মাসের বাচ্চার হাতে তুলে দেওয়া হয় ফ্যান্টা
অরেঞ্জ (কোলা পানীয়)। ভারতবর্ষে দরিদ্রতম গ্রামে সুষম খাদ্য দিতে
গেলে তারা চেয়ে বসে এমন কোনো 'পুষ্টিকর পানীয়'—এই ধরুন 'হরলি-
কস'; গ্রামের দরিদ্র চাষীর বৌ মাঠের শাকসবজি বিক্রি করে ঘরে
ফেরার পথে সর্বস্ব উজাড় করে কিনে নিয়ে যায় 'ভিটামিন টনিক'। শহর-
তলীর বা বস্তির দরিদ্র মেয়েটি অপুষ্টি আর রক্তাল্পতায় ফ্যাকাশে ঠোঁট
দুটো চুবিয়ে নেয় লিপস্টিকের বাহারে। বিদেশী সেন্টের জন্য উদগ্রীব হয়ে
ওঠে মধ্যবিত্ত বাড়ির গৃহিণী, চেয়ে বসে কোনো সুগন্ধি সাবান বা 'ডিম-
গোলা' শ্যাম্পু। জে.কে.রায় এ-রাজ্যে এক সমীক্ষায় দেখেছেন—গরীব ঘরের
মেয়েদেরও খুব চড়া দামে শিশুখাদ্য কিনতে ; বুকের দুধ তো দূরের কথা
এমনকি যারা একটু বড় বাচ্চাদের, যেখানে সস্তায় গরু বা মোষের দুধ বাজার
থেকে কিনে খাওয়াতে পারতো, তা না করে তারা পরম বিশ্বাসে কয়েকগুণ
দামে এক 'অতি-পুষ্টিকর' টিন-খাদ্য কিনে আনে। গরীবের ধারণা তার

মস্তিষ্কের অপুষ্টিই তার সামাজিক অবস্থানের কারণ, তাই তারকাছে সোনার হরিণ 'বোর্নভিটা'। কোম্পানি সেটাবুঝে প্রচারকরে 'মস্তিষ্কের খাদ্য হিসেবে', 'প্রাণময়ী, স্বাস্থ্যবান আর চট্পটে' করে তুলতে, রোগ আর অপুষ্টিতে জর্জর ছেলের মুখে ঠেলে দেওয়া হয় দু-চামচ ভিভা বা বোর্নভিটা। এর থেকে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে? '৭২-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এদেশে এই ধরনের 'হেলথ-ফুডে' আসক্ত পরিবারগুলির শতকরা ৮৫-র ক্ষেত্রে মাসিক আয় ২০০ টাকারও কম। অথচ ওই সময়ের বাজারদর অনুযায়ী প্রতি ব্যক্তিকে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি হরলিকস থেকে পেতে গেলে খরচ করতে হতো ২০ টাকা। ১৯৭৭ সালে আই সি এম আর (Indian Council of Medical Research) কলকাতায় এক সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে, তিন বছরের কম বাচ্চাদের হরলিকস বা বোর্নভিটা খাওয়াচ্ছে যে-সব বাবা-মায়েরা তাদের কাছে এটা মূলত 'প্রেস্টিজ ফুড'—যদিও এদের বাৎসরিক আয় (মাথাপিছু) মোটামুটি ২২৫ টাকা মাত্র। '৭২-এর আর এক সমীক্ষায়, এই কলকাতাতেই দেখা গেছে নিম্নবিত্ত (যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ২২০ টাকার নিচে)-দের মধ্যে হরলিকস খাওয়ানোর প্রবণতা উচ্চবিত্তদের থেকে বেশি। যদিও ওই একই সময় আর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এ শহরের প্রায় অর্ধেক শিশু দৈনিক প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যও পায় না। তাই হেলথ-ফুড বিক্রির জন্য কোম্পানিরা প্রচার বাবদ বছরে ১·৭৫ কোটি টাকা যে খরচ করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। বেবিফুড এর ক্ষেত্রেও চিত্রটা অন্যরকম নয়। '৭২-এর ঐ সমীক্ষায়, কলকাতাতেও দেখা গেছে—নিম্নবিত্তের প্রায় ৬২% মানুষ (উচ্চবিত্তের ক্ষেত্রে ৪১%) বেবিফুডকে শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই পুষ্টি ব্যবসা এদেশের অপুষ্টি ও শিশু-মৃত্যুকে যে বাড়িয়ে দিচ্ছে এ-বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই। অভিধানে চলে এসেছে এক নতুন শব্দ 'ব্যবসাভিত্তিক অপুষ্টি' (Commerciogenic malnutrition)। তাই নিম্নবিত্তের দিকে পণ্যের মালিকেরা যে তাক করে আছে এটা নতুন করে বলে বোঝাবার দরকার নেই। যে কুঁড়ে ঘরে বাস করে, তার কাছে রাজার জীবনতো স্বপ্ন হবেই—গোয়ালিয়র সুটিং-এ সে খুঁজে বেড়াবে রাজকীয় উচ্ছাস (Royal view); আর্থ-সামাজিক জীবনে চরম অসহায়ত্ব, কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার ব্যর্থতা সে ভুলতে

চাইবে একটি উইলস ফ্লেক ধরিয়ে, কারণ এটাতো 'যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাদের জন্য'।

এই ধরনের পণ্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রবক্তারা এই ব্যবস্থার মধ্যে ক্রেতার স্বাধীনতা অর্থাৎ ক্রেতা এখানে যে নিজের ইচ্ছামতো রুচিমাফিক নিজের পণ্যটি কিনতে পারে—সেই কথাটি জোরের সঙ্গে প্রচার করতে চায়। কিন্তু কার্যত দেখা যাবে এই স্বাধীনতার আশ্বাস একটি সুন্দর সাজানো মিথ্যে বই আর কিছু নয়। অর্থের জোরে এরা সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলিকে কব্জা করে রাখে—তারপর একমুখীন প্রচারের তোড়ে সত্যমিথ্যার সীমারেখা মুছে দেয় নিমেষে, অথচ তাদের দেওয়া তথ্যের ওপর দাঁড়িয়েই ক্রেতাকে পণ্য পছন্দ করতে হয়। এই প্রচারকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো জায়গাতেই ক্রেতা-সাধারণ নেই—সরকারি হাতও সে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক। এই রকম আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ক্রেতার স্বাধীনতাকে তাই বড়জোর ধর্ষিত হওয়ার স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। অবশ্য ইদানীং পৃথিবীর বহু দেশে ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন জোরদার হচ্ছে—যেখানে ক্রেতারা পণ্যের গুণাগুণ, প্রয়োজনীয়তা, অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন তুলছেন। যে-আন্দোলন শুধু পণ্যের দাম নয়, আরো গভীরে—সমাজ কাঠামোয় আজ নাড়া দিচ্ছে। দাবি উঠছে মানুষের প্রধান বা মূল প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়ে দেবার জন্য সুনির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ; পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না এমন ধরনের পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের দাবি উঠেছে য়ুরোপ-আমেরিকায় ; সমাজে অশক্ত শ্রেণীর জন্য যথাযথ ব্যবস্থার কথাও চলে এসেছে। এই সমস্ত ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনে, ক্রেতা নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পাচ্ছে, সারিবদ্ধ হচ্ছে সংঘবদ্ধ লড়াই-এর ময়দানে।

এক অদ্ভুত বিড়ম্বনাময় পণ্যের জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে সমস্ত মানবসমাজ তথাকথিত এই সভ্যতার নামে। মানুষ তার কর্মজীবনের হতাশা-যন্ত্রণা-ক্ষোভ-অক্ষমতার জ্বালা থেকে ভুলে থাকার চেষ্টা চালায় বহুবিধ পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, আপনার সারা দিনের $\frac{১}{৩}$ ভাগ যায় ঘুমিয়ে, বাকি $\frac{১}{৩}$ ভাগ কাটে কর্মক্ষেত্রে, আরো কিছুটা সময় যায় বিশ্রাম বা কিছু ব্যক্তিগত কাজে। এরপর যে সামান্য কয়েকঘণ্টা সময় পড়ে থাকে তাতে আপনি বিবিধ ভোগ্যপণ্যের মাধ্যমে সুখ খুঁজে বেড়ান। আপনার 'কাজ' কার্যত ওই ভোগ্যপণ্যগুলি ক্রয় করবার জন্য। আপনার কাজ আপনার জীবনের আত্মপ্রকাশ বা সৃজনশীলতাকে সাহায্য করার জন্য

নয়—আনন্দের জন্যও নয়, স্রেফ রোজগারের জন্য ; যেখানে আপনি নাম-গোত্রহীন একজন কর্মীমাত্র। সে-কাজের গতি বা ধারাকে পরিচালন বা নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো জায়গাতেই আপনি নেই, আপনি শুধুমাত্র একজন উৎপাদক। সমাজবিজ্ঞানী নাভারোর মতে, 'এই অসহায়ত্ব-অক্ষমতা-হতাশার থেকে বাঁচার রাস্তা হিসেবে মানুষ গড়ে তোলে আর এক মরীচিকার জগত।' অধুনিকতার নামে মডেলের পর মডেল পাল্টে যায় ঘড়ি, টিভি, ছাতা, নেলপালিশ আরো কত কিছুর। পণ্যের পাহাড়ে চাপা পড়ে যায় মানুষ, তবু সন্তুষ্টি মেলে না, তৈরি করে যায় আরো হাজারবিধ অপ্রয়োজনীয়-অযৌক্তিক-ক্ষতিকারক সব পণ্য। সুখ যতো হারায় ততোই পণ্যের সমুদ্রে ডুবে যেতে চায় মানুষ, তৈরি করে আরো নতুন কিছু পণ্য—চক্রাকারে চলতেই থাকে এ-প্রক্রিয়া।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এছাড়া অন্যকিছু যেন আমরা ভাবতেই পারি না ; ভাবতে পারি না এর বিপরীত কোনো জীবনযাত্রার কথা, কোনো বিকল্প-ব্যবস্থার কথা। আর ভাবতে না পারাটা বা ভাবতে না দেওয়াটাই এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। সমাজতত্ত্ববিদ মার্কুইসের মতে, বর্তমান অবস্থার বিকল্প কিছুর কথা চিন্তা না করতে দেওয়ার ভেতরই লুকিয়ে রয়েছে এই সমাজ কাঠামোর শক্তি, তার দুর্দমতা।

সূত্র :

1. Insult or Injury ; Charles Medawar ; Published by I.S.I., Lodhi Road, New Delhi
2. The Beauty Boom ; India Today, March 31, '82
3. The Celebrity Sell ; India Today, Sept. 15, '85
4. Medicine under Imperialism ; V. Navarro, Prodist, 156 Fifth Avenue, Nu York 10010

☐ অমরজিৎ জানা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে আমরা যে নতুন নতুন দ্রব্য-সামগ্রী কিনছি বা ব্যবহার করছি তা কি সচেতনভাবে প্রয়োজন বুঝে কিনছি নাকি বিজ্ঞাপনের নিপুণ ফাঁদে ধরা পড়ছে আমাদের বোধবুদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের মানসিক চাহিদাকে গ্রাস করছে, অন্ধভাবে তাড়িত হচ্ছি আমরা প্রচার কৌশলের মোহে! এটা কি সত্যি নয় যে আজ পত্র-পত্রিকায়, রাস্তা-ঘাটে, রেডিও-টিভিতে অহরহ কৌটোভর্তি 'শক্তি', শিশিভর্তি 'বুদ্ধি', আর প্যাকেটভর্তি 'গ্ল্যামার' আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধিগুলিকেই ঘেঁটে পাকিয়ে দিচ্ছে? জন্ম দিচ্ছে না কি এক বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব যান্ত্রিক সংস্কৃতির? এই মারাত্মক অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও 'লাইফস্টাইল'-এর মূল কোথায়, কতোটাই বা ব্যাপক এর বিস্তার? এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক আলোচনার সংকলন—

'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়'